১ম খণ্ড। ১

আনন্দ। ৮

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ।

১৩২১

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

সম্পাদিত।

পাথুরাই 'আনন্দ-কুটীর' হইতে

শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৭।১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ এক টাকা চারি আনা, প্রতি খণ্ড ৵০ আনা।]

সম্পাদকের নিবেদন।



প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক-সন্দর্ভ একখানি দুইখানি প্রকাশিত হইতেছে। ময়মনসিংহই এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ। শুভ নববর্ষে ঐ অভাব-পূরণার্থ আমরা 'আনন্দ' প্রচারে ব্রতী হইলাম। আশা করি ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমাদের সঙ্কল্প-সাধনের সহায় হইবেন। ধর্ম্মজগতের বহু কৃতী সাহিত্যিক 'আনন্দের' লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; এখন আনন্দের স্থায়িত্ব ও উন্নতি গ্রাহকবর্গের সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছে। অনেক পয়সা অনেক দিকে ব্যয়িত হয়, এরূপ সৎকথা সংগ্রহের জন্য বৎসর পাঁচ সিকার পয়সা খরচ কাহারই কষ্টকর নহে।

আমরা বিনা আদেশেই—"আনন্দ" ভক্ত সজ্জনব্যক্তিদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমাদিগকে যাঁহারা নিতান্ত ধৃষ্ট জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে নিষেধ লিখিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিব না। না লিখিলে বুঝিব তাঁহারা কৃপা করিলেন।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আনন্দ ॥

বন্দনা।

বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ।
জ্ঞান বেণু বঞ্চিত
যাহি ভকতি মকরন্দ,
দরশ দরশে চাঁদ
তরঙ্গিত সুধানন্দ
তপ তাপে অশিব
গুণত-অনুবন্ধ,
পাপ তাপ শীতল
যাক অমৃত সম্বন্ধ
বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ।

বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
প্রেম কুমুদ মুদ
উল্লসন চন্দ,
ভকত মনোমাদন
আনন্দ কন্দ

আনন্দ।

রসনা রস কন্দর
নামামৃত স্যন্দ,
গৌর প্রাণ ভরপুর
লাবণ মকরন্দ
বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ!

শ্রীকালীহরদাস বসু ভক্তিসাগর
(ভাগ্যকুল)।

নান্দী।

—০:(০):০—

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং
ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা
বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং,
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং
প্রতি পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং
বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং।

হোক্ জয় জয় হোক্ তব
হে নাম হে পতিত পাবন!
দাও আজ মার্জ্জন করিয়া
ম্লান মোর এ চিত্ত দর্পণ।

কি ভীষণ ভব দাবানল
দে'খে যাও জ্বলিছে সংসার
এস জ্বালা কর নির্ব্বাপণ
কোটী জীব লভুক উদ্ধার।

যোগ সাংখ্য বৈরাগ্য সাধনা
ক্লষ্ণ ভক্তি তাঁরা কত সতী,
হাসিবে না তুমি না আসিলে
তুমি যে গো বিদ্যা বধূপতি।

হে শুভদ, ঢাল তুমি সুধা
ঢাল তব কল্যাণ কৌমুদী
তুমি এ'লে উচ্ছ্বসিত হবে
মরু প্রাণে চারু প্রেমাম্বুধি।

এস তুমি প্রতি পদে তব
পূর্ণামৃত করি আস্বাদন
স্থাবর জঙ্গম সব প্রাণী
তুমি এ'লে পাবে সঞ্জীবন।

এস তুমি জয় হোক্ তব
হৃদি পদ্ম হোক্ বিকশিত
এ জগতে সর্ব্বোপরি আছ
থাক তুমি চির বিরাজিত।

আসুক তোমার সনে
সেখানের সে শুভ আহ্বান
এস নাম এস তুমি নামি
রসনায় কর অধিষ্ঠান।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
কাল্‌না, 'পল্লীবাসী' আফিস।

উদ্দেশ্য।

—০:():০—

বেদের "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" লইয়াই বেদান্ত শাস্ত্র প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে যাইয়া দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের সৃষ্টি পুষ্টি হইয়াছে। অদ্বৈত বাদীগণ ব্রহ্ম ভিন্ন সৎপদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন অবিদ্যা প্রভাবে এই ভ্রান্তি পূর্ণ জগতে অহং গর্ব্বী জীব জন্ম মৃত্যুরূপ ব্যাপারের অধীন হইতেছে। অহঙ্কারই জীবের বন্ধন ও দুঃখের হেতু। তত্ত্ব জ্ঞানানুশীলন দ্বারা অবিদ্যোৎপন্ন কারণ শরীর অর্থাৎ স্থূল দেহ অতিক্রম করিয়া মায়াশ্রিত আনন্দময় কোষের অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি স্থাপন করিতে পারিলেই অহং বুদ্ধির নাশ হইয়া "সোহং" বুদ্ধির অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তদনন্তর জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই অদ্বৈত বাদীগণ মুক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে ব্রহ্মই যখন সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ তখন আত্মাকে ব্রহ্মভূত করিতে না পারিলে সচ্চিদানন্দ লাভের আশা নাই।

বাস্তবিক অভেদ বাদ চিন্তা করিলে উহাতে যে সার সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের ন্যায় গৃহাশ্রমীর ধারণার অতীত বলিয়া মনে হয়। এই স্ত্রী পুত্রাদি বেষ্টিত সংসারে নানা বিপদাপদের মাঝখানে আপনাকে ব্রহ্ম সাযুজ্য সন্ধানে নিযুক্ত রাখার অবসরইত আমরা দেখি না। তারপর আশৈশব সংস্কার বশতঃ তুফান আসিলে "দোহাই শিবের—দোহাই শিবের" বলিতেই আমাদের প্রবৃত্তি হইবে। অদ্বৈত বাদীদের কথায় "শিবোহং" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে না। এবং জন্মাবধি আমরা যে সুখের জন্য লালায়িত সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা হইলেও উহা উপভোগের সময় আমাকেই আমি ভোক্তা মনে করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্বৈত-বাদীগণ বলেন আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগের সময় আমার আর আমিত্ব বোধ থাকিবে-না। ইহা কিরূপ? আমিত্ব বোধ ব্যতিরেকে উহার জন্য আমার স্পৃহাই বা জন্মিবে কেন? নিত্য সুখের সন্ধানে গিয়া আমার আমিত্বটুকুই হারাইয়া ফেলিলাম! মায়িক জীব হইয়া ঐরূপ সুখের মর্ম্ম গ্রহণ করাই আমাদের কঠিন। তবে কি অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তের কোন মূল নাই? আছে, বলিয়াছিত উহাতে যে সার সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের ন্যায় গৃহাশ্রমীর ধারণার অতীত বলিয়া মনে হয়। আমরাত্ত সাধক—একদিন এই আত্মবিসর্জ্জনের ধাঁধায় পড়িয়া মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ মাকে বলিয়াছিলেন "চিনি হ'তে ভালবাসি না মা, চিনি খেতে

ভালবাসি"। আমাদের বিশ্বাস অনেকেই এই কথায় সায় দিবে। তবে উপায় কি? উপায় আছে। জীবের প্রতি ভগবান তাদের কোন সন্দেহ নাই। [illegible] ইহার পরেই দেখিতে পাই দ্বৈত মত ধরিয়া অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া, ভগবান সেব্য সেবক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দ্বৈতবাদীগণ [illegible] বলিয়াছেন "জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই আনন্দের উপায় স্বরূপা"। সে ভক্তির লক্ষণ কি? যথা :-

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।

অর্থাৎ ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ, ভগবৎ বিগ্রহের অর্চনাদি দ্বারা জীবের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া থাকে। [illegible] কৃপায় [illegible] পারে না জীব তৎভাব ও তৎস্বভাব [illegible] হইতে [illegible] এক হইতে পারে না। "[illegible]" সম্ভবতঃ সাধনানুষ্ঠানের [illegible] স্বরূপ লাভ করিতে পারে না।

ভক্তগণ প্রচারক। দ্বৈতবাদীরাই প্রকৃত পক্ষে এই সংসারে জীবদিগকে আনন্দ ধামের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দয়ার পরিসীমা নাই। [illegible] [illegible] পর এস [illegible] সংসারে সাধনা [illegible] আনন্দের মধ্য দিয়াই কিছু কিছু করিব। সেই নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হইব। কি। তা কি? আমরা আনন্দময়ের [illegible]। [illegible] পৃথিবীকে তিনি কেমন আনন্দ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। [illegible] [illegible] সাগরে সরিতে কোথায় না আনন্দ [illegible] আমরা [illegible]। ভক্তির আশ্রয় থাকিয়া [illegible] আনন্দময়ের [illegible] দেখিতে চিদানন্দে ডুবিয়া যাই। ভক্তি জগতে এই আনন্দ [illegible] আনন্দ [illegible] "আনন্দের" আবির্ভাব। আনন্দ [illegible] ভগবান [illegible]।

আনন্দ কুটীরে-

গৌর আবাহন।

——•:(০):০——

এস—চিদানন্দ গৌর! সদানন্দ গৌর!
পূর্ণানন্দ গৌর এস হে।
আনন্দ উথলি' এস ঢলি' ঢলি'
আনন্দ কুটীরে এস হে।

প্রভু—আমিত জানি না তোমার আবাহন
আপনি আনন্দে কর আগমন
হে চির আনন্দ! কর সব আনন্দ
তুমি আনন্দের হাসি হাস হে।
আনন্দ উথলি' এস ঢলি' ঢলি'
আনন্দ কুটীরে এস হে।

আজ—"আনন্দ কুটীরে" "আনন্দ" উদয়
চারিদিক ভরি' উঠে জয় জয়
বিমল আনন্দে করি আলোময়
চির অন্ধকার নাশ হে।
আছি—বড় অন্ধকারে, গৌর! আমার এ
চির অন্ধকার নাশ হে।

গৌর নিতাই আমার আনন্দ স্বরূপ
দোঁহে সদানন্দ অনুপম রূপ
নদীয়ার ভূপ! এস রস কূপ!
আনন্দ সাগরে ভাস হে।
হরি নামানন্দে ভুবন ভাসাও
তুমি আপনি আনন্দে ভাস হে
এস এস এস প্রাণের নিমাই
আসিলেই তুমি আসিবে নিতাই

এস প্রেমানন্দে তোমরা দু'টী ভাই
নাশ অখিলের ত্রাস হে।
অমিয় মোহন আন্দোলিত শিরে
এস হে কদম্ব পুলক শরীরে
আনন্দ কুটীরে কৃষ্ণদাসীরে
পদামৃত দানে তোষ হে;
আনন্দ উথলি' এস ঢলি' ঢলি'
আনন্দ কুটীরে এস হে।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী
শ্রীবৃন্দাবন, কেশীঘাট।

কাঙ্গালের প্রার্থনা।

—০ঃ(*)ঃ০—

এতদিন "আনন্দ কুটিরে" লুকাইয়া লুকাইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, আজ ভক্তি জগতের বরেণ্য শরণ্য মহানুভব ব্যক্তিদিগের নিকট সেই আনন্দ লইয়া উপস্থিত হইলাম। ভাবিলাম আনন্দেরত অধিকারী সকলেই, তবে আর লুকোলুকির প্রয়োজন কি? বাকী ক'টা দিন দশজনকে লইয়াই একটু নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিয়া যাই। দিন আর নাই, দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। কবে এই স্নেহ মমতার ক্রীড়াগারে পদার্পণ করিয়াছিলাম তা মনে নাই। বাল্য কৈশোর যৌবনের মধ্য দিয়া যে দিন প্রৌঢ়াবস্থাকে প্রথম আলিঙ্গন করি—সেই দিন প্রাণে একটু ধাক্কা লাগিয়াছিল। তাই মুক্ত জগতের বক্ষে উদাস দৃষ্টি স্থাপন করিয়া লিখিয়াছিলাম ঃ—

গিয়াছে প্রভাত গিয়াছে মধ্যাহ্ন
সন্ধ্যাও নিকটে খাঁড়া
ভাবি তাই মনে সাঁজ ব'য়ে গেলে
কোথা রবে পুত্র দারা!
বেলা নাই ভে'বে সুদূর হইতে
দৌড়িয়া আলয়ে আসি

জীবনের বেলা অবসান হলে
কোথা রবে পুরবাসী।
আমার আমার ধূলিকণা হ'তে
স্বর্ণ কণারে কই
একবার মনে ভাবিয়া দেখি না
আমার আমিও নই!
অতিথি সকলে জীব দলে দলে
সংসারে আসিয়া হয়
গিয়াছে 'যোগেশ' গিয়াছে 'রমেশ'
'মহেশ' অমর নয়।
কেহ যায় আগে কেহ যায় সাথে
কেহ পাছে পাছে ছুটে
সে আনন্দ ধামে যাবার বেলায়
'না' বুলি মুখে না ফুটে।
যাওয়া ও আসার শুধু অধিকার
সংসারে জীবের আছে
অতিথিশালার আস্‌বাব হেরে
কেবল আনন্দে নাচে?
হায় ভগবান, এমন অজ্ঞান
জীবেরে করিও দয়া
জীবনের ব্রত হ'লে উদ্‌যাপিত
দিও হে চরণ ছায়া।

ভগবান প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। সংসারের কৃমি কীট হইয়া এখনও আমি বাঁচিয়া আছি। ইহার পরও কর্ম্মভোগের বিরাম নাই। পুত্রের শ্মশান জ্বলিয়াছে, পত্নীর শ্মশান জ্বলিয়াছে, এখন আমার শ্মশান জ্বলিলেই এ যাত্রার মত শ্মশান চিন্তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। সেই প্রজ্জ্বলিত মহাশ্মশানের দিকেই চাহিয়া আছি। কৃপাময় পাঠক! ইহা দুঃখের কথা নয় আনন্দেরই কথা। শ্মশান আমাকে মহাশিক্ষা দিয়াছে। কর্ম্ম বিগুণে পিতামাতা বা ভাই ভগিনীর নিকট কিছু শিখিতে পারি নাই। পরে কেন পরের ছেলেকে শিক্ষা দিবে? ফলে এই শিক্ষা বিমুখ কাঙ্গালকে শ্মশানই এক অভ্রান্ত শিক্ষা দিয়াছে। আহা, শ্মশানের মত

বন্ধু আর কৈ পাইব ?

শুনিয়াছি শ্মশানে নাকি এক সদানন্দ মূর্ত্তি বিরাজ করেন। সংসারের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকেই তিনি আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছেন! তুচ্ছ জীব হইয়া সেই শৈব-শক্তির স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। তবে সদানন্দের নিবাস ভূমি বলিয়াই হউক কি সংসার সাধনার পরিণাম বলিয়াই হউক শ্মশানের সেই অনন্ত সুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আমি যে তার অতুল আনন্দ সম্পদের কণিকা মাত্র লাভ করিতে পারিয়াছি আজ তাই লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। কারণ এ আনন্দ প্রাণে পুরিয়া রাখা যায় না। আসুন আমরা সকলেই এই আনন্দে বিভোর হইয়া হরিবোল হরিবোল বলি!

পথের সম্বল।

—০:০:০—

ভগবান আনন্দময়। জীব আনন্দময় ভগবানের অংশ। সুতরাং জীবও আনন্দময়। জীব আনন্দই চায় সুখই চায় দুঃখ চায় না। আনন্দই জীবের স্বরূপ, দুঃখ আগন্তুক বিষয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই জীব কেবল দুঃখই পায় আনন্দ পায় না। ইহার কারণ জীবের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংস্কার। আনন্দময় জীবদেহে প্রাক্তন কর্ম্মের প্রলেপ থাকায় জীব দুঃখ যন্ত্রণার অধীন হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা বা ভক্ত কৃপায় যখন এই কর্ম্ম সংস্কারের প্রলেপ বিধৌত হইয়া যায় তখন জীব আপন আনন্দময় স্বভাব পরিগ্রহ করিতে পারে। চুম্বক স্বভাবতই লৌহপিণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু সেই লৌহপিণ্ডটাকে যদি কর্দ্দম দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা যায়, তবে চুম্বক আর তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তদ্রূপ ভগবান তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন কিন্তু আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের প্রলেপ দ্বারা আবরিত থাকায় তাঁহার আকর্ষণ একটুকুও আমাদের মঙ্গল বিধান করিতে পারিতেছে না। চুম্বক আর লৌহে যে সম্বন্ধ জীব আর ভগবানে তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। একটী শ্লোক দ্বারা আরও বিশদ করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সত্যং শ্রীরঘুনন্দনেন কপিনা কেনাপি সম্পাদিতং
সেতুঃ কেন মহদধৌ বিরচিতঃ কেনাপ্যসৌ লঙ্ঘিতঃ ?

তত্তদ্বংশ সমুদ্ভব কপিরহো গুণ্ঠস্য ভিক্ষার্থিনঃ
ভৈক্ষে নৃত্যতি রজ্জুভি র্নিয়মিত স্তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে!

অর্থাৎ একটী বানর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে " অযোধ্যাধিপতি ভগবান রামচন্দ্রের সহিত কোন্ কপি মিত্রতাকরণে সমর্থ হইয়াছিল? সমুদ্রে সেতুইবা কে বন্ধন করিয়াছিল? কেই বা সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল? যে বানর ঐ সকল অলোক সামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল আমি সেই সেই বানর বংশ সম্ভূত, কিন্তু আমার প্রাক্তন কর্ম্মের এমনি ফের্, যে, ভিক্ষার্থী যাদুকর (বেদে) তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আমার গলায় দড়ি দিয়া, আমাকে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। অহো, এমন কর্ম্মকে নমস্কার করিতেছি। এই কর্ম্ম সংস্কার বশতঃ আমরা ব্রজেশ্বর হরিকে ভুলিয়া কামিনী কাঞ্চনের দাস হইয়াছি।

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ
মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ,
এক প্রমাদীস কথং ন হন্যতে
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ!

অর্থাৎ আমরা দেখিতে পাই 'হরিণ' গানেতে মোহিত হইয়া, হস্তী স্পর্শ সুখ আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, 'পতঙ্গ' নয়নেন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিভ্রান্ত হইয়া, ভৃঙ্গ 'সুগন্ধ' গ্রহণের বাসনায় উন্মত্ত হইয়া এবং 'মৎস্য' রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি কামনায় ব্যাকুল হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহাদের একটী মাত্র ইন্দ্রিয় প্রবল তাহাতেই ইহাদের এই দশা। আর আমরা? যাহাদিগকে পাঁচটী ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা একযোগে পীড়ন করিতেছে তাহারা যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে, তাহারা যে ভগবানের চরণারবিন্দ লাভে বঞ্চিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আমরা সংসারে দেখিতে পাই—

ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিধিবশাৎ ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি
স্বস্বাহার বিহার সাধন বিধৌ সর্ব্বে জনা ব্যাকুলাঃ
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি নো দৃশ্যতে।

অর্থাৎ ব্যাঙ যাইতেছে তাহার পশ্চাতে সর্প, তাহার পশ্চাতে ময়ূর, তাহার পশ্চাতে ব্যাধ, তাহার পশ্চাতে ব্যাঘ্র ধাবিত হইতেছে। সকলেই নিজ নিজ আহার বিহার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ দিকে যে কাল পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চুলের মুঠি ধারণ করিয়া আছে কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে না।

অহো, দুর্ল্লভ-মানব জীবন বৃথা কাজে নষ্ট করিলাম। ভাবিলাম না যে—

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতামাতাং চ তিষ্ঠতি
ন পুত্রং ন দারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং।

অর্থাৎ পরকালে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র বা জ্ঞাতি কেহই সাহায্য করিবে না। ধর্ম্মই আমাদের উপকারে আসিবে। ভগবানের আরাধনা না করিলে ধর্ম্ম লাভের উপায় নাই।

সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কত উপদেশ দিলেন 'হরিনাম কর'। আমরা সে কথায় কর্ণপাতও করিলাম না! গাধা যেমন সকল কার্য্যই করিতে পারে—ভাতের 'কাঠি'টী বহন করিতে পারে না, আমাদেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত কার্য্য করিবার অবসর পাই, যত অনবসর নিদ্রাকর্ষণ ঐ হরিনাম জপের বেলা। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে?

হরি হরি হরি! মন যাহা হইবার হইয়াছে. আর কেন বৃথা সময় নষ্ট কর, দিন যে যায় দেখ না? মন, শুন নাই কি প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ শুভক্ষণে এ ভুবনে অবতীর্থ হইয়া ভুবন মঙ্গল হরিনাম দ্বারে দ্বারে যারে তারে বিলাইয়া গিয়াছেন। মন, আজ হইতে বিচার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অকৈতব ভক্তি বিশ্বাসের সহিত সুধা মধুর হরিনাম লইতে চেষ্টা কর। এই নাম জপ করিতে পারিলে যম যন্ত্রণার অধীন হইতে হয় না। যমকে ফাকি দিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারিবে।

না মন, তুমি আমার কথা শুনিবে না তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এক ব্যাঙ যেমন সাপকে বলিয়াছিল "সাপ, তোমার চেহারাখানা সুন্দর চাকচিক্যময়, কিন্তু তোমার হাটাটা বাঁকা না হইয়া যদি সোজা হইত তবে বেশ মানাইত। ব্যাঙের উপদেশ সাপের কাণে পৌছিবে কেন, সে আত্মগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাঙ তিন লম্ফেই গর্ত্ত পার। কতক্ষণ পরে কয়েকটী বালক জুটিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিল। এবং একটা কাঠির উপর ঝুলাইয়া সকলে মিলিয়া আমোদ করিতে করিতে সাপটাকে দূরবর্ত্তী স্থানে ফেলাইয়া দিতে লইয়া গেল। দৈবাৎ ব্যাঙ ইহা দেখিয়া বলিল "সাপ, সেই সোজা হইলে, কিন্তু বেঁচে থাকতে সোজা হইলে না।" মন, তুমিও সেই সাপের ন্যায় বিপরীত বুদ্ধি পোষণ করিতেছ। কাজেই হিতবাক্য শ্রবণ করিতেছ না। কিন্তু তোমার এই অবাধ্যতাচরণের ফল আমার ভাগ্যে কি দাঁড়াইবে ভাব কি?

নীত্বা বহির্ভবনোহথ বপুংসি হুত্বা
দত্তাঞ্জলিং সপদি বন্ধুজনো নিবৃত্তঃ

একাকিন স্তপন নন্দন মন্দিরেষু
গোবিন্দ বন্ধু রথিলেষু বিনিশ্চিতোমে।

অর্থাৎ স্নেহাস্পদ পুত্র যাহার জন্য কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছি। প্রাণাধিকা পত্নী যাহার বঙ্কিম কটাক্ষে অভিভূত হইয়া পাশ বদ্ধ মর্কটের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছি, একদিন তাহারাই অন্যান্য বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার সাধের দ্বিতল অট্টালিকা হইতে আমাকে বাহির করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাইবে। সেখানে লইয়া গিয়া আমার 'আলবার্ট' কাটা মস্তক, আতর মাখা শরীর প্রজ্জলিত মহাশ্মশানের অগ্নিতে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে। তারপর এক এক অঞ্জলি জল দিয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। আমার প্রতি স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুগণের কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ! তখন আমার অবস্থা? আমি তখন একাকী যমের দ্বারে দণ্ডায়মান। স্ত্রী পুত্র আমার কোন উপকার সাধন করিতে পারিতেছে না। অহো, তখন প্রাণগোবিন্দ ছাড়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বন্ধু আমার কেহই নাই। তাই বলি মন, সময় থাকিতে নাম ব্রহ্মের আশ্রয় লও। এই অসার সংসারে সার কেবল হরিনাম। পথের সম্বল কেবল হরিনাম। তাই বল মন, হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এল
(রাজসাহী)।

চৈতন্য চন্দ্রালোক!

(শুভ অবতার)

—— ০:(০):০ ——

ভগবানের অবতারত্বে বিশ্বাসবান ভক্তদিগেমধ্যে কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহাদের প্রথম আপত্তি হইতেছে, এই পাপ প্রধান যুগে এত শান্ত মধুর বেশে তিনি কখনও আসিতে পারেন না। এত বিনয় নম্র বচন তাঁহার মুখে শোভা পায় না। কুকার্য্য নিরত কলির জীবের প্রতি তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তৎ পরিবর্ত্তে রুদ্র মূর্ত্তি প্রলয় গর্জ্জন ঘোর নৃশংসতাই তাহাতে সঙ্গত ও শোভনীয় হইতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি ভগবানের অবতার পরিগ্রহে অলৌকিকত্ব থাকা চাই। দেবতাদিগের স্বর্গচ্যুতিতে বামন, যজ্ঞীয় চরু ভক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র, কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একটা বিশেষত্বের দিক দিয়া তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্যের মত তিনি যে কোন সময় সূতিকা গৃহে ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন না।

তৃতীয় আপত্তি যে যে যুগে যে যে অবতার আবির্ভূত হইবেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহা পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলিতে 'কল্কি' ভিন্ন অন্য কোন অবতারের ইঙ্গিত নাই। আমরা একে একে ঐ তিনটী আপত্তিই খণ্ডনের চেষ্টা করিব। ফলাফল ভগবদ্বিশ্বাসীর হৃদয়ে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের শাস্য শাসক বা পিতা পুত্র এই দুইটী বিশিষ্ট ভাবের মধ্যে কোন্‌টীর সহিত তাহার তুল্যতা স্থাপন হইতে পারে। শাস্য শাসক বা রাজা প্রজা ভাবে সম্পর্কিত হইলে তিনি আমাদের নিকট হইতে কিছু ব্যবধান হইয়া পড়েন সত্য, কিন্তু নিতান্ত পরদেশী দস্যু 'নাদের সাহার' ন্যায় অত্যাচারী নিষ্ঠুর হইয়া যান না। বাস্তবিক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই জগৎ ব্যাপারে কাহারও প্রত্যক্ষ হস্ত দৃষ্ট হয় না। তিনি এমনই একটী বিচিত্র নিয়মে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবীকে পরিচালন করিতেছেন যে সকল কার্য্যই সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তাকে কেহ খুঁজিয়া পাইতেছে না। আর যদি পিতা পুত্র ভাবে তাঁহাকে আরও আপনার দিকে টানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে একটী সুস্নিগ্ধ প্রীতি-সৌরভের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ জীবের সে সুযোগও বর্ত্তমান, জীব ভাবিলেই পারে যে তিনি পিতা আমরা তাঁহার পুত্র, এ বিশ্বাস তাহার ভিত্তিহীন হইবে না। "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" এই অভয় বাক্যই তাহাকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করিবে।

এখন দেখা যাউক উপর্য্যুক্ত সম্বন্ধ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টীর সহিত তুলিত করিলে ভগবান গৌরাঙ্গদেবের অবতারত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা দেখি কোন্‌টীও সন্দেহের অনুকূল নহে। কারণ এই কলিযুগ ভগবৎ প্রবর্ত্তিত যুগ। পাপ পুণ্যের পাদ বিভাগও সেই ইচ্ছাশক্তি প্রসূত। জীব সব কর্ম্মাকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। এ অবস্থায় শাস্য শাসক ভাবেই তাঁহার করাল মূর্ত্তিতে আগমন কল্পনা কি জন্য করিতে হইবে? সৃষ্টির প্রারম্ভে রজোবিকারোৎপন্ন অমিত বলশালী অসুরগণ সৃষ্টি কার্য্যে যখন ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিল তখনকার ভীমা ভয়ঙ্করী বেশ কি তাহার সর্ব্বদা শোভা পায়; বিশেষতঃ পুরুষ বেশে

তিনি যতবার আগমন করিয়াছেন ততবারই তাঁহাতে জীবে দয়া প্রীতি বাৎসল্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। সেই বামন অবতারেই কি, আর সেই রামকৃষ্ণ অবতারেই কি, কোন সময়েই তিনি প্রেমশূন্য কঠিন পাষাণে পরিণত হয়েন নাই। আরও একটু প্রণিধানের কথা আছে, এই স্বল্পায়ু রোগ তাপগ্রস্থ অজ্ঞান জীবদিগের প্রতিকূলে তিনি ভীষণ অস্ত্রায়ুধে সজ্জিত হইয়া আসিতে পারেন কি না? প্রকৃতিস্থ সকলেই একবাক্যে বলিবে "না"। কারণ এই মর্ত্ত্যভূমেও শাস্ত্র শাসকের ভিতর ঐরূপ বীভৎস ভাব দৃষ্ট হয় না। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার এই প্রাণী-জগতেও বিরল। সুতরাং ঈশ্বর স্বয়ং সে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে পারেন না। আর পিতা পুত্র ভাবের আরূপ করিলেত এ সংশয় জাগিতেই পারে না। বোধ হয় এই পর্য্যন্ত ভাবিলেই প্রথম আপত্তি ভঞ্জন হইতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি অকিঞ্চিৎকর, বামনাবতারের সঙ্গে ভগবান গৌরহরির জন্মগত বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কশ্যপ অদিতিও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিলেন। বামনদেবের জন্ম বৃত্তান্তেও কোন বৈচিত্র নাই। মহাপ্রভুর ন্যায় তিনিও যথাকালে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এখন তৃতীয় আপত্তি খণ্ডন আবশ্যক। সংশয়ীরা বলেন পুরাণাদি শাস্ত্রে মহাপ্রভুর অবতরণের কথা নাই। পুরাণত এক দুইখানি নহে এবং সংশয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত পুরাণই তাহাদের অধিগম্য হইয়াছে এমনও নহে। তবু অসিদ্ধাবস্থাতেই তাহারা বলেন যে ভগবানের গৌরমূর্ত্তিতে প্রকাশ পুরাণসিদ্ধ নহে। ওদিকে কিন্তু পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী ভাগবতাদি শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া তৎকৃত চরিতামৃত গ্রন্থে যে মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা এ কাল পর্য্যন্ত কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। সেই প্রমাণের পর আমাদের কোন কথা কহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। সুতরাং সংশয়ীদের নিকট এই মাত্র বক্তব্য যে সেই—

আসন্ বর্ণস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনুঃ
শুক্ল রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

প্রভৃতি শ্লোকে মহাপ্রভুকে সূচিত করে নাকি? বিশ্বাসীর নিকট এতদতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যক হয় না। তবে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া যে অবতার বাদ ঘোষিত হইয়াছিল তাহার সার্থকতা নিরূপণ করিতে হইলে এ স্থলে আরও কিছু আলোচনা আবশ্যক। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপন ইহা হইল তাঁহার কার্য্য সূচী, ভারতে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিপ্লবই তাঁহার অবতার

পরিগ্রহের মূল কারণ। মহাপ্রভুর শুভাগমনের পূর্ব্বে দেশের কি শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহার উজ্জ্বল চিত্র ব্যাসাবতার বৃন্দাবন তদীয় চৈতন্য ভাগবতে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থে কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

* * * * * *

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহার জিহ্বায়॥

* * * * * *

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণু ভক্তি কার নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

ইহাতে নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। নবদ্বীপ তখন জ্ঞান গরীমায় ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল যথা ঃ—

নবদ্বীপ সম্পত্তিকে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টি পাতে সবে মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব্ব করে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহিক সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥

এ হেন নবদ্বীপই যখন প্রেম ভক্তি শূন্য কিম্ভুত কিমাকারে পরিণত হইয়াছিল তখন ভারতের অন্যান্য অংশে পাপের কি জ্বলন্ত শিখা "দাউ দাউ" জ্বলিতেছিল তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা এ স্থলে ভগবদবতরণের মূল সূত্রটী নির্ব্বাচন করিলাম, এখন কার্য্যসূচীর অনুশীলন কর্ত্তব্য। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতীদিগের বিনাশ এক এক যুগে এক এক ভাবেই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সেই বলিদলন রঘুকুল নির্ম্মূল, কংশ ধ্বংস এক উপায়ে সম্পন্ন হয় নাই। পৃথক পৃথক উপায়ই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এ যুগের পাষণ্ড দলনেও তিনি স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক অবতার বাদের দিক দিয়াও মহাপ্রভুকে গোলোকের বস্তু বলিয়া চেনা যায়।

এখন তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় দীনহীনের মনে যে একটী অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতেছে উপসংহারে অতি কাতরভাবে তাহা নিবেদন করিতে উদ্যত হইলাম। সাধু গুরু বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের চরণে প্রার্থনা তাঁহারা যেন আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন। আমাদের বিশ্বাস স্থূল বুদ্ধির জীব জগৎ লইয়া যেমন গুরু গোঁসাইগণ ঠেকিয়াছেন সেইরূপ স্বয়ং জগদীশ্বরকেও সময় সময় ঠেকিতে হয়। তাহা না হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার গৌররূপ ধারণা করিতে হইত না। আমাদের মনে হইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণাবতারে সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতীদিগের বিনাশ সাধন হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি যেন দৃঢ় হইল না। কারণ তিনি প্রকৃতিগণে পরিবৃত হইয়া দ্বাপরের সেই ধর্ম্মযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন।

লীলাস্মৃতি।

——:**:——

নমঃ সর্ব্বভূতস্বামী, নমো বিশ্বপতি!
জয় যুক্ত হউক্ এই অখিলের প্রীতি—
সম্প্রতি ইচ্ছায় তব ; হে ভববান্ধব!
অভিনব, অভিনব লীলার বিকাশ
হেরে বিশ্ব তোমাহ'তে, রহস্য জটিল—
কে পারে করিতে স্থির কল্প কল্পান্তরে?
ভিতরে মুদ্রিত সেই নীতি সূত্র মালা,
বাহিরের খেলা শুধু দেখাও মানবে!
• • মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন,
একে একে সমাধিয়া, পূর্ণ অবতার—
হ'লে রামচন্দ্র রূপে ত্রেতার মাঝারে,
মানবের শিক্ষা হেতু, প্রীতি ভক্তি মাখা!
শিখিলা সে হ'তে জীব, পিতৃ ভক্তি কিবা,—
কিবা সে সৌভ্রাত্র, কিবা দাম্পত্য প্রণয়!
লক্ষ্মী মূর্ত্তি সীতাদেবী, অনুজ লক্ষণ,
আদর্শ মূরতিত্রয় লভিল ভারত
মহাভাগ্য ফলে যেন, রচি রামায়ণ
বাল্মীকি-সঞ্চিলা পুনঃ অক্ষয় সুযশ!
ভাবী বংশধর তরে মনুজ মণ্ডলী,
লভিলে যে রত্নাকর, রত্নাকর কৃত,
অজ্ঞান তিমির তায় হ'ল তিরোহিত!
ধন্য হরি দয়াময় মানব বৎসল,
উন্নতির উচ্চ চূড়ে তুলিলে কৃপায়
জড়-প্রকৃতিরে তুমি! সে রাম চরিত,—
আজো—কথকের মুখে হতেছে কীর্ত্তিত,
ভারতের দিকে দিকে ; শিখে সর্ব্বলোক—

সুপুত্রের কর্ত্তব্যতা, ভ্রাতৃ আচরণ,
রমণীয়া পতিভক্তি, রমণী সকলে,
ভক্তি কুতূহল চিতে !
দ্বাপরে আবার,—
অতি সূক্ষ্ম কর্ম্মসূত্রে গাথি আপনায়
অবতীর্ণ হ'লে কৃষ্ণ কংশ কারাগারে,
যোগমায়া ল'য়ে সাথে ; ধ্যানে যোগীগণ,—
জানিলা আগত হরি ভূভার হরণে;
উদ্দেশে সহর্ষ চিতে করিলা প্রণাম—
প্রেমাশ্রু পূরিত নেত্রে জয় জয় রবে !
মায়ামুগ্ধ-বসুদেব দুষ্ট-দৈত্য ভয়ে
গোকুলে নন্দের গৃহে রাখিলা যতনে,
পুত্রহীনা যশোমতী অতি-তপস্যায়
পাইলা পরের দত্ত-গোলকপতিরে
আপনার পুত্ররূপে ; পাপীষ্ঠা পূতনা
অনুত্তীর্ণ ষষ্ঠ মাসে চারু ওষ্ঠাধরে—
অর্পিলা কপট স্নেহে বিষপূর্ণ স্তন,
হ'ল আরম্ভন দুষ্টের নিধন ক্রিয়া !
তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, বকাসুর,—আদি
একে একে বিনাশিয়া, অবাধে করিলে—
দাবাগ্নি ভক্ষণ,—আর কালিয় দমন !
যৌবনের প্রাক্কালে আগে ইন্দ্র পূজা—
রোধিয়ে ধরিলে হস্তে গিরি গোবর্দ্ধন,
দুর্জ্জয় পুরুষকার হেরিয়ে গোকুল,
আকৃষ্ট তোমাব প্রতি হ'ল সেই হতে।
ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম, জপ, তপস্যা, আহুতি,—
প্রতিকার্য্যে করে লোক শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
ক্রমে বৃন্দাবন লীলা হ'ল অনুষ্ঠিত,
অষ্টসখী সহ রাই বিকাইলা পদে—
কাত্যায়নী ব্রত শেষে, ভাসি প্রেম রসে ;

কালরূপে মজে মন ব্রজ গোপিকার
আকুলী ব্যাকুলী ধায় বেণুর স্বরবে,
পতি পুত্র স্নেহে সবে দিয়ে জলাঞ্জলি।
ঘুচাইলে শ্রীরাধার-কলঙ্কিনী নাম,
আয়ানে করিলে ধন্য কৃষ্ণ কালীবেশে
অবশেষে কাঁদাইয়া ব্রজ গোপিকায়
মথুরায় গেলে হরি কংশ ধ্বংসতরে ;
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হবে !
তারপর মধ্যলীলা কুরুক্ষেত্র রণ—
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
তারপর অন্ত্যলীলা দ্বারকা গমন
পরে প্রভাসের তীরে সব সমাপন !
হে কৃষ্ণ যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ক্ষিতি,
তাবৎ হবে না ম্লান এই পুণ্যস্মৃতি !

চিত্ত শুদ্ধি-পূর্ব্বক উপাসনা।

বেদ পুরণাদিতে যে চতুর্ব্বিধ-প্রলয়ের কথা উল্লেখ আছে,—তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি, এবং এই প্রলয় যথার্থ ই হয় কি না—ইহা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে শাস্ত্রে—চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের কথা বর্ণিত আছে যথা, নিত্য-প্রলয়, নৈমিত্তিক-প্রলয়, প্রাকৃতিক-প্রলয় এবং আত্যন্তিক-প্রলয়।

অহরহ জীবের মৃত্যুকে নিত্য-প্রলয় বলে। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক-প্রলয় বলে। ইহাকে দৈনন্দিন প্রলয়ও বলিয়া থাকে। আর ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় পায়, তাহার নাম প্রাকৃতিক-প্রলয়। আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড-বস্তুর সহিত যখন প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হয়, তখন যে প্রলয় হয়, তার নাম মহাপ্রলয়। এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের মধ্যে কেহ, কোন প্রলয়কে মান্য করেন, কেহ বা কোন প্রলয়কে মান্য করেন না। কোন কোন দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক-প্রলয়কে স্বীকার করিয়া, মহাপ্রলয় হওয়ার প্রতি সংশয় করিয়া থাকেন। আবার যোগী-

গণেরা প্রলয়াদি চতুষ্টয়ের মধ্যে, নিত্য-প্রলয়কে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত ঐক্যতা বিধায় অস্বীকার করিয়া, অপর তিন প্রলয়কে কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্বে আনিয়া বহির্বিষয়ে ব্রত করেন নাই। তাঁহারা সমস্ত বহিস্থ পদার্থকে স্বশরীরে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যেই অবস্থা ভেদে প্রলয় সংস্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল বস্তু বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে দেখিতেছ, সেই সমস্ত বস্তুই জীবের শরীরে অবস্থিত আছে। সুতরাং যোগী জনেরা স্ব কলেবরেই সকল প্রলয়ের স্বীকার করেন। যেমন বাহিরে দেবগণ,—ও চন্দ্র—ও বাণী ও অনিরুদ্ধ—বিষ্ণু,—শিব, প্রকৃতি ও পরমাত্মা,—যোগীরা এই সকল পিণ্ড মধ্যে দর্শন করিয়া বাহ্য হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া স্ব শরীরকেই নিয়ত অবলোকন করিয়া থাকেন। বাহিরে যেমন দেব শ্রেষ্ঠ শরীরে তেমনই ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। বাহিরে দেবক্ষমতা, শরীরাভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় বৃত্তি। দেবক্ষমতা মধ্যে যেমন চন্দ্র শ্রেষ্ঠ—তেমনই শরীর মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। চন্দ্র অপেক্ষা সরস্বতী শ্রেষ্ঠ—পিণ্ড মধ্যে মন হইতে—বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বহিস্থ অহঙ্কার যেমন শ্রেষ্ঠ, শরীরাভ্যন্তরে সেইরূপ অনিরুদ্ধ জীব শ্রেষ্ঠ হয়েন। বহিস্থ যেমন ব্রহ্মা,—বিষ্ণু—শিব—সজ্ঞক দেবত্রয় শ্রেষ্ঠ—পিণ্ড পিণ্ড মধ্যে সত্ত্ব—রজ তমো গুণ শ্রেষ্ঠ হয়। যেমন সকল বস্তু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, শরীরাভ্যন্তরেও তেমনই অব্যক্ত সংজ্ঞার সেইরূপ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি হইতে বহির্বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষাপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে—এই জন্য সেই পরমাত্মাই সকলের পতি।

প্রাণীদিগের এই স্থূলদেহই ব্রহ্মাণ্ড, ইহার পভু জীবাখ্য—প্রজাপতি ব্রহ্মা। এই জীবের নিদ্রাবস্থাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা যায়। প্রাণীবর্গের পরমায়ু শেষে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক লয়। যোগীদের যোগ প্রভাবে যে জ্ঞানোদয় হয় সেই জ্ঞান দশায় মৃত্যু হইলে আর পুনর্ব্বারও থাকে না। সুতরাং সেই অবস্থাকেই তাহারা আত্যন্তিক প্রলয় বলেন। ঐ আত্যন্তিকপ্রলয়ের নামই মহাপ্রলয়। যে হেতু তাহাতে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। অপামর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় বলে। প্রলয় ব্যাপার অনুধাবন করিলে স্বভাবতই জীবের পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে প্রবৃত্তি জন্মে। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি প্রকার কর্ম্মের সহিত প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই দুইটীকেও কর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিয়া—ষটকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই কর্ম্ম মুমুক্ষু জনের সম্বন্ধে অবশ্য বর্জ্জনীয়। কেন না কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুইটী কর্ম্মই শুভাশুভ রূপে বন্ধনের হেতু। কাম্যকর্ম্মাচরণে—স্বর্গ-

সুখ ভোগ হয় আর নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে, পাপফলে দুঃখকর নরক ভোগ হয়। নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের পক্ষেই পরিত্যজ্য। যে হেতু নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে পাপ জন্মে, সেইরূপ কর্ত্তাকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা জালে আবদ্ধ করে। তজ্জন্য নিষিদ্ধকর্ম্ম করণে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। উপাসনা কর্ম্ম সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য।

নিত্যকর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায় হয়, যথা সন্ধ্যা-বন্দনাদি অকরণে প্রত্যবায় হয়। পুত্র জন্মাদি নিমিত্ত জাতেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ নৈমিত্তিক কার্য্য মধ্যে গণ্য। ইহার অকরণে প্রত্যবায়, করণে পুণ্য হয়। পাপক্ষয় মাত্রের কার্য্য চান্দ্রায়নাদি ব্রত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সাধ্যাতীত জন্য,—সগুণ উপাসনা অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা ও সাকার পরব্রহ্মের পরিচর্য্যা করণই উপাসনা। নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। যথা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণাদি চৌর্য্য, গুর্ব্বিণী গমন, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, অগম্যা-গমন, অবৈধ মাংসাদি ভোজন, পরধন হরণ প্রভৃতি কর্ম্মে নরক ভোগ হয়। সুতরাং এতৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি-কামীগণ, শুদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাণু-ষ্ঠানে রত থাকিয়া ভগবদুপাসনা করিবে।

শুদ্ধচিত্ত না হইলে অর্থাৎ মনের মলা না গেলে আদৌ উপাসনার—প্রবৃত্তিই হইবে না। বিষয়ে আসক্তি, -অর্থাৎ বিষয়বাসনাকে মনের মলা বলিয়া, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই অভিলাষকে ত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আদৌ মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীরের ও মনের অপকর্ষ করতঃ--ভাবনা দ্বারা মানসমলের অপকর্ষণ করিবে। এবং বিষয়বাসনাকে ত্যাগ করিতে হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষাদিকে জয় করিতে হইবে। কেন না—এ সকলকে ও মনের মলা বলা যায়। কারণ ইহারা ঐহিক ও পারত্রিক এবং শারীরিক সমস্ত বিষয়ের হানিকর। এ জন্য ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রেই রিপু বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক অহঙ্কার, মমকার, নিন্দা, অভাবনা, দ্বেষ, পৈশুন্য, ঈর্ষা, অসূয়া, কপটতা, অনৃত, সংশয়, হিংসা, জিঘাংশা, প্রতি-হিংসা, অকরুণা, অদয়া,—ইত্যাদিকেও মনের মলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে হেতু ইহারা সকলেই জীবের পক্ষে সাধনার বিষয়ে প্রতিকুলতাচরণ করে। একারণ এই-সকল মনোবৃত্তি নীতিশাস্ত্রেও দুষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল অসৎবৃত্তি পাপ উৎপাদক। অতএব প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম মধ্যে, তপস্যাকে যে এক কর্ম্ম বলিয়াছেন, সেই তপস্যা দ্বারা এই সকল পাপের ক্ষয় করিয়া, অসৎ মনোবৃত্তি, যাহাকে মনের মলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মানসমলের পরিক্ষয় হইলেই মন নির্ম্মল হয়।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও উপাসনা কার্য্য ঈশ্বরোদ্দেশে করিতে হয়। শুদ্ধ ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বরের তুষ্টি জন্মে। তিনি সকলের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে-হৃষিকেশ বলিয়া উক্ত করেন। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের সম্ভজনীয় ও প্রযুক্ত, তিনি অন্তরের ভাব মাত্রই গ্রহণ করেন। তিনি সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে জীবের মনেরও প্রসন্নতা জন্মে। এবং এই প্রসন্নতাতে মানস মলাপকর্ষণ হয়। মানসমলের অপকর্ষণে চিত্তের স্বচ্ছতা হয়। চিত্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলে সেই চিত্তে-ভগবৎরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন মুকুরাদি স্বচ্ছ পদার্থের, সামান্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অতএব সকল সাধনার মূল, চিত্ত পরিষ্কার করণ। মলিনচিত্তে কখনই তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ প্রেম ভক্তির উদয় হইতে, পারে না। জীবের চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে ততই ভগবানে ভক্তিব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে তাহাব আর সংশয় নাই। যে কর্ম্মে শুভ ফলের প্রাপ্তি হয় সেই কর্ম্মেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে। যাবৎ অশুদ্ধ কর্ম্মকে শুভ ফল প্রদ বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাবৎ জীবের পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য ভোগেচ্ছু ব্যক্তিকে মোক্ষার্থ কর্ম্মের উপদেশ কবিলে সে অমার্জ্জিত বুদ্ধি বশতঃ কখনও সে উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ভোগাকৃষ্ট চিত্ত প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ ভোগার্থ কর্ম্মেই চিত্ত ধাবিত হয়। এবং তাহাতে বহুতর ক্লেশরাশি বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তথাপি তাহাতে বিরতি জন্মে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পাবে যে অসৎ প্রবৃত্তিদ্বারা চৌর্য্যবৃত্তি উপজীবিব্যক্তিরা কারাবরুদ্ধ হইয়া রাজদণ্ড ভোগ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। কারা মুক্ত হইলেই, পুনর্ব্বার সেই সকল অসৎ কর্ম্মকে ইষ্টজ্ঞানে পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। পরমেশ্বরে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি যাবৎ না জন্মে তাবৎ অসৎপ্রবৃত্তিব নিরাস হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরে নৈষ্টিকী ভক্তির উদয় হইলে রজ এবং তমোগুণের কার্য্য সকল তিরোহিত হইয়া যায়। এবং ভগবৎ প্রসাদে সত্ত্বগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সত্ত্ব প্রভাবে কখনও অসৎবৃত্তিসকলের উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত, যাহাতে চিত্ত প্রসাদ লাভ হয়।

ভগবানের তুষ্টি সাধন জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং উপাসনা করা আবশ্যক। আর যজ্ঞাদি নানা কার্য্যে সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও উপাসনা করিলে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই তুষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রাদিদেবতার উপাসনায় পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা হয়; কেন না তিনি সর্ব্বব্যাপক তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, তিনি সর্ব্বরূপ, সর্ব্বনাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজর, অমর, অব্যয়;

অতএব ইন্দ্রাদি দেবতারাও তাঁহারই রূপ। এজন্য তাঁহাদের পূজা করিলে পর ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। গীতাতেও বিভূতিযোগ কথনকালে ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যথা ঃ—"দেবানামস্মি বাসব" ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি হস্তীর মধ্যে ঐরাবত—ঘোটকের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, জলাশয়ের মধ্যে সাগর, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বেদের মধ্যে সামবেদ, মনুষ্যের মধ্যে রাজা, নাগের মধ্যে অনন্ত, যক্ষের মধ্যে কুবের এবং দেবগণ মধ্যে আমি ইন্দ্র।" অতএব দেবতাদিগের অর্চ্চনাতে সেই পরমেশ্বরের অর্চ্চনা ব্যতীত আর কার অর্চ্চনা হইতে পারে ?

মনের মলা সম্বন্ধে সাধক গাইয়াছেন ঃ—

না গেল ভাই মনের মলা
চোক বুজ্‌লে হয় চোখে জ্বালা।
যজ্ঞ, মন্ত্র, বেদ, অধ্যয়ন, মনের মলা নাশের কারণ
তা যদি না হ'ল কখন, মিছে তীর্থবাসে গেল বেলা।
(ভূতের ব্যাগার খে'টে গেল বেলা)
(ভূতের ব্যাগার খে'টে যাবে বেলা)
জলের মলা নাহি গেলে, না পড়ে কায়ার ছায়া জলে
মন ডুবিয়ে থাক্‌লে মলে, ভাব বিনা হয় হরি বলা,
(ও তার মিছে হয় জপের মালা)
কাঙ্গাল বলে শোনরে ভাই,—যদি চাও জগতের গোঁসাই—
কাম, ক্রোধ কররে ছাই—তখন দ্বার যাবে চ'ক্ষের খোলা।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি এ
(কৃষ্ণনগর)

শচীমুখে নিমাঞি চরিত।

(প্রতিবেশিনীর প্রতি)

কি কহিব মাই ! সরে না মুখে।
দহিছে পরাণ দারুণ দুঃখে ॥
কেনগো নিমাঞি এমন করে।
পাগলের মত কেবল ঘুরে ॥
জেঠ বা কনিঠ কিছু না মানে।
পর ও আপন তাও না জানে ॥
ভাবিয়াছিলাম পড়ে ও শুনে।
বাছা থির হবে বুঝি এখনে ॥
মানিবে গণিবে সকলে এবে।
প্রণাম করিবে গৃহের দেবে ॥
ওমা, আমি বল কোথায় যাব।
বুঝিতে পারি না বাছার ভাব ॥
কি কব রে মাই ! তোমার স্থানে।
দেব, দ্বিজ, গুরু কিছু না মানে ॥
আঁচল ধরিয়া মাখন মাগে।
না দিলে লুটায় মনের রাগে ॥
আখুট করিয়া মুরলী চায়।
এত কি সহিতে পারে গো মায় ?
মৌন হইয়া যখন থাকে।
ডাকি, সাড়া নাই শতেক ডাকে ॥
সিনান সময় চাঞ্চল্য করে।
কত ওলাহন দেয়লো পরে ॥
বালক বালিকা আসিয়া কয়।
তোমার নিমাঞি মানুষ নয় ॥
যাহা মুখে আসে তাহাই কহে।
সাধে কিগো আই ! পরাণ দহে ॥

ছোট শিশু এ'লে গঙ্গার ধারে।
কাণে জল দিয়া কাঁদায় তারে॥
বসনে বসনে বদল করে।
জলে ডুব দিয়া চরণ ধরে॥"
এইরূপ কত কথা যে শুনি।
শুনিয়া পরাণে প্রমাদ গণি!
কেন গো এমন নিমাঞি মোর?
বিজয় শুনিয়া উল্লাসে ভোর!!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

বাঙ্গালা, সহিলপুর, (ময়মনসিংহ)

কুটীরে দীপ শিখা।

এ ভারতই সতীত্বের আকর। সতীধর্ম্মের দীপশিখা প্রথম এই ভারত বর্ষেই প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। বেদ উপনিষৎ স্মৃতি পুরাণ কোথায় না সতীত্বের বিজয়দুন্দুভি শ্রুত হওয়া যাইতেছে? যুগধর্ম্মপ্রভাবে যদিও প্রাচীন বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তবু সতী রমণীর সম্মান এখনও সকলেই করে, সতী কাহিনী, এখনও ঘরে ঘরে ভক্তিপূর্ব্বক কথিত হইয়া থাকে। সীতা সাবিত্রীর পুণ্য চরিতাখ্যানে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিকই উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের পল্লী কুটীরে মধ্যে মধ্যে দুই একটী সতী রমণীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা নীরবে জ্বলিয়া নীরবেই নির্ব্বাণ লাভ করিতেছে। সে খবর বড় অধিক লোকের কাণে পৌছিতেছে না। এখন হইতে 'আনন্দে' তাহা আলোচিত হইবে বলিয়াই, 'কুটীরে দীপ শিখা'র সূত্রপাত হইল।

সে অনেক দিনের কথা, আমাদের তখন পাঠ্যাবস্থা। 'নেত্রকোণা' সব-ডিবিসনের অধীন 'সুখহারী' গ্রামে স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। একদিন প্রাতঃকালে সহপাঠীদের মুখে শুনিলাম দুই তিন বাড়ী অন্তরেই একটী বর্ষিয়সী মহিলার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে।

সে চোখ বুঁজিবার পূর্ব্বেই তাহার সুদীর্ঘ জীবনের পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তনে লোক শত-জিহ্ব হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ হইল।

সে জাতিতে শূদ্রাণী ছিল। অল্প বয়সেই জটিল রোগে একটা পার্শ্ব-কুব্জ হইয়া যায়। দেখিতে সুন্দরী ছিল, সেইজন্য বিবাহ আটকাইল না, স্বগ্রামবাসী এক যুবকের সঙ্গে যথাকালেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু যুবক তাহাকে সুদৃষ্টিতে দেখিল না। যুবকের একটু অহঙ্কারের কারণ এই ছিল যে, সে 'নেত্রকোণা' মুন্সেফী আদালতের একজন নামজাদা পিয়ন। তখনকার দিনে ঐরূপ চাকুরেরও সমাজে একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং সে ভাবিত ঐরূপ একটা কুব্জা রমণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, সে তাহার জ্যোৎস্না-ধবল পুরুষকারের উপর স্বেচ্ছায় কতকটা কালী ঢালিয়া দিয়াছে! কিন্তু দৈবের উপর ত মানুষের কোন হাত নাই, এইজন্য সে তাহার অন্তঃকরণের যত কোপ, নিরপরাধিনী স্ত্রীর উপর প্রকাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটীর নাম সতী ছিল। সে শত নির্য্যাতনের মধ্য দিয়াও, আপন পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিল। যথাকালে দুইটী পুত্র-রত্নের অধিকারিণী হইয়া, সে তাহার গাহস্থ্য-জীবনের সাধ পূর্ণ করিয়া লইল। শেষে বয়স্থা পুত্রবধূর হাতে সংসার তুলিয়া দিয়া, সে কেবল পৌত্র-পৌত্রীর বোঝা বহিতে লাগিল। পাড়ার লোকে বলে, তখনও সে স্বামীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই। যৌবনকালের 'বকা ঝকা' সে পূর্ব্ব নিয়মেই ভোগ করিতেছিল। কিন্তু সতী তাহার স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতাকে একদিনের জন্য পরিত্যাগ করে নাই। সে মনে করিত স্বামী-সোহাগিনী হইবার অদৃষ্ট সে লইয়া আসে নাই, সুতরাং 'খামাকা' নিজের ধৈর্য্য নষ্ট করিয়া পাড়াপরশীর কৌতুকদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ফল কি? বাস্তবিক সতীর সহিষ্ণুতা দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই সতীকে ধন্য ধন্য করিত। আজ সতী সংসার হইতে যাত্রা করে শুনিয়া, দলে দলে লোক তাহাকে দেখিতে ছুটিল। আমাদেরও এদৃশ্য দেখিবার কৌতূহল জন্মিল। আমরাও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখি, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয়ও সতীর শিয়রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই শেষাঙ্কেও সতীর মহিমা মলিন হইল না, বরং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। হতভাগ্য স্বামী আজ কিন্তু সতীর গুণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সে মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতেছে যে, কুব্জা তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম শেষ করিয়াই, আজ শেষের শয্যা বিছাইয়া লইয়াছে। কিন্তু একটা মিথ্যা অভিমানের বশ হইয়া, সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সতীকে সুনজরে দেখিল

না, একদিন ভালমুখে একটু কথা বলিল না। অনুতাপের আগুন ত এইখানেই জ্বলে, ফলে আজ তাহার ত্রুটিবিচ্যুতির কথা মনে হইয়া মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইতে বসিয়াছে। সতীর অন্তিমশ্বাস যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন দেখিলাম সেই পাষাণ দিয়া জলধারা নির্গত হইতেছে। পাষণ্ড কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—"ওগো আমাকে কোথায় রাখিয়া যাও?" তখনও সতীর চমৎকার জ্ঞান, সে তার স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখেই বলিতেছে—"পুত্র রহিল, পুত্রবধূ রহিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে এখন রাখিবে না ও।"

হরি হরি হরি। এই কথাই সতীর শেষ কথা। আর বুঝি জড়জগতের ব্যথা সহিতে সে আসিবে না। সতী, সতী-লোকেই অনন্তজীবন প্রাপ্ত হইয়া, অনন্ত-সুখে কালযাপন করিবে।

যাও সতি, সেই পুণ্য লোকে। তথা হইতেই আশীর্ব্বাদ করিও যে, আমাদের পল্লীকুটীরে ঐরূপ দীপশিখার কখনও যেন অভাব না ঘটে।

নববর্ষে।

নববর্ষে, হৃদে কেন ছাইল পরাণ
পুনঃ কি উদিলা গোরা চাঁদ?
নববর্ষে বর্ষে কেন প্রেমাশ্রু নয়নে
প্রভু কি আসিলা এ ভুবনে?
নববর্ষে স্পর্শে কার হইয়াছি সোনা
ইহা কিগো তাঁহারি করুণা?
নববর্ষে দশে যবে এত সুমঙ্গল
বল্ হরি বল্ হরিবোল!

ভক্ত-মহিমা।

শুন ওরে মন, করি নিবেদন
ভজহ ভকত রঙ্গে,
সেবাব্রত লও, ভক্তসঙ্গে রও,
মাখ পদরজ অঙ্গে।
কর অনুক্ষণ চরণ-সেবন
ভকত প্রসাদ খাও,
ভক্ত-পদ-জল কররে সম্বল
(যদি) পরাণ জুড়াতে চাও।
কহে সে পুরাণে ভক্ত-ভগবানে
অভেদ তত্ত্ব যে মন
ভকত ভজিলে চতুর্ব্বর্গ মিলে
আর মিলে প্রেম-ধন।
ভকত কৃপায় নামে রতি পায়
ত্রিলোকে ভকত সার
ভক্ত কৃপা বিনে শেষের সে দিনে
হবেনা করুণা তাঁর।
তাই বলি মন ভকত চরণ
সেবিলে ভকতি পাবে,
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব গৌরাঙ্গ মহত্ত্ব
পরাণে স্ফুরিত হবে।
হবে সাবধান ভকতের স্থান,
ভকত সামান্য নয়,
হ'লে অপরাধ যাবে অধঃপাত
আগমে পুরাণে কয়।
শুন ভাল মতে কহে ভাগবতে
ভক্ত সম কেহ নয়,
গোলোক বিহারী- প্রভু-গৌর-হরি
আপনি ভকত হয়।

ভকত-মহিমা দিতে নারে সীমা
ব্রহ্মাদি অনন্ত দেবে,
ভকত-চরণ লওরে শরণ
হেলায় শ্রীকৃষ্ণ পাবে।
তাই বলি মন হও সচেতন
সময় বহিয়া যায়,
এমন জনম আর কি কখন
আসিবেবে পুনরায় ?
বহু পুণ্যফলে নরদেহ মিলে
দুর্ল্লভ জনম মানি,
সেবাব্রত ধর ভক্তে তুষ্ট কর
হবে প্রেমধনে ধনী।

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।
(মাহিগঞ্জ)

নদীয়া নাগরীর খেদ।

সখিরে সরমেব খাইয়াছি মাথা,
এ'স এ'স প্রাণ সই, বিরলে বসিয়ে কই,
অপরূপ গৌর গুণ গাথা !
সখিরে সবের সমান নয় মন,
তাই সে নিগূঢ় কথা, যারে তারে যথা তথা,
কহিতে না হয় আকিঞ্চন !
সখিরে তুই মোর মরমের সখী,
তোর সনে দেখা হ'লে দু'দণ্ড আলাপ চলে,
আন জনে মারে ঝাটা লাথি।
সখিরে একদিন দেখিনু স্বপনে,
সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন কুটীর পাশে,
কে আসি দাঁড়াল সংগোপনে।

সখিরে চমকিয়া উঠিল পরাণ,
জানত নদীয়া যু'ড়ে সকলেই ভয়ে মরে,
নাটুয়া কখন নাশে মান !
সখিরে দুয়ারে দিলাম ক'ষে খিল,
শাশুরী ননদী যারা, তারা মোর সঙ্গ ছাড়া,
তাতেই ঘটিল এ মুস্কিক !
সখিরে একটু করিনু পাছে ভুল,
মনেতে ভাবিনু কি, চুপি দিয়া দে'খে নি,
তাতে কি হইবে গণ্ডগোল ?
সখিরে এ বাসনা কেনই না হয়
এর ঠাঁই ওর ঠাঁই, কত শুনি অন্ত নাই,
কুতূহল হ'বারি বিষয় !
সখিরে জানি কি খাবে যে মোরে কালে ?
কুলের বহুরী আমি, আমার সর্ব্বস্ব স্বামী,
জানি মাত্র ইহ পর কালে।
সখিরে সাধ ক'রে পা'তিলাম আড়ি,
দেখিতে কি না দেখিতে লুকাইল সে চকিতে
আমার মাথায় দিয়ে বাড়ি !
সখিরে নিমিষে ঘটিল অঘটন,
জাগিয়া দেখি কি পরে, তারে সই মনে পড়ে,
আর করে প্রাণ উচাটন !
সখিরে বাউরী সাজিনু সেই হ'তে,
এ রোগ এমন রোগ, গৃহ কাযে মনোযোগ,
রাখিতে পারি না কোন মতে !
সখিরে রূপের তেজে কি অঙ্গ পোড়ে ?
এ দাহ কিসের দাহ, ভুঞ্জিতেছি অহরহ,
বুঝি না বুঝা'য়ে দাও মোরে !
সখিরে ঐ যে কি ভঙ্গী ক'রে চায়,
ঐ যে ঝামর চুলে, কি এক মাধুরী খোলে,
কুলে সই কুড়াল লাগায় !

সখিরে স্বপনেই গোরা বিষে ধরে,
জাগ্রতে দেখিলে তায়, পরাণে বাচন দায়,
কালকূট উঠাব ভিতরে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

যাও যাও সহচরি, সকলে বিনয় করি,
বলিয়া আইস শীঘ্রগতি।
আমার প্রার্থনা গিয়া, প্রভু পদে বিবরিয়া,
কহে যেন করিয়া মিনতি।
সবে রথযাত্রা ছলে, যাইবেন নীলাচলে,
দর্শন করিতে মোর প্রভু।
শুনেছি প্রভুর বাণী, তাই ওগো সহচরী,
মোরে দেখা না দিবেন কভু॥
কহিও মিনতি মোর, এ সব দুঃখের ওর,
এ জীবনে নাহি হবে জানি।
পুনঃ জন্মান্তরে যেন, সেবিবারে শ্রীচরণ,
পাই হে চির কাঙ্গালিনী॥
প্রভু পদে শত শত, অপরাধ আছে যত,
নিজ গুণে করুণা করিয়া।
নিজ দাসী বলে আমা, যেন গো করেন ক্ষমা,
বল সখি মিনতি করিয়া।
আমার যুগল আঁখি, নিরত ঝরিছে সখি,
না পেয়ে প্রভুর দরশন।
অন্তিম কালেতে যেন, আসি দেন দরশন,
বলে এই শেষ নিবেদন।
হা নাথ বলিয়া প্রাণ, কবে হবে অবসান,
আর প্রাণে কত সবে দুঃখ।
অন্তিম কালেতে সখি, যেন প্রাণভরে দেখি,
প্রভুর সে পূর্ণচন্দ্র মুখ॥

দেখি নাই যতি বেশ, দেখিলে পাইব ক্লেশ,
সে বেশ ত্যজিয়া প্রাণসখা।
মনোহর বেশ ধরি, আধীনিরে দয়া করি,
অন্তিমেতে যেন দেন দেখা ॥
যেরূপ সুন্দর সাজে, এই নদীয়ার মাঝে,
ভ্রমিতেন ভক্তগণ সাথে।
গলে বনফুল মালা, রূপে পথ হতো আলো,
দাঁড়ায়ে দেখিত সবে পথে ॥
জিনি মদমত্ত হাতি, প্রভুর সুন্দর গতি,
গমন করিত কত রঙ্গে।
সুন্দর বসন গায, মরি কি শোভিত হায,
লাবণ্য ঝরিত প্রতি অঙ্গে ॥
সেই বেশে প্রাণসখা, আসি যেন দেন দেখা,
বল সখি করিয়া বিনয়।
অবশ্য এ সব বাণী, শুনিবেন গুণমণি,
প্রভু মোর বড় দয়াময় ॥
দাসী কহে শুন সখি, কি লাগি কর মিনতি,
হন নাই পর তব কান্ত।
তোমার প্রেমেতে বাঁধা, গৌরাঙ্গ আছেন সদা,
হৃদয় করহ দেবি শান্ত ॥

শ্রীঅম্বালিকা দাসী।
সাহেবগঞ্জ, নদীয়া।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

আনন্দ।

শ্রীগৌর পদ কমল।

গলিত কাঞ্চনে নবনীত ছানি
কমলে প্রলেপ করি
তড়িত ধরিয়া তাহাতে জড়িয়া
বিধি সে রাখিল গড়ি !

কিবা-চরণ যুগল ফুল্ল শত দল
অমল কোমল বর
অরুণ শীতলে আছে তলে তলে
দলে দলে সুধাকর !

সেই-চাঁদে চাঁদে ঝরে সুধা মন্দাকিনী
চকোরিণী ঝাঁকে উড়ে
কমল কোটরে মকরন্দ সিন্ধু
বিন্দু লাগি অলিবেড়ে।

সে মধু সিন্ধুতে সুমৃদু তরঙ্গ
মরকত জ্যোত মাখা
মধু সিন্ধু রত্ন প্রেমানন্দ ছটা
কোটি কোটি চাঁদ রাকা !

ভানু দ্বিজরাজ কমল কুমুদ
একত্রে বসতি করে
কি সম্পদ ওতে গোপত-নিহিত
রক্ষে, নাগনূপুর বেড়ে।

গোরা পদ দ্যুতি কত সুশীতল
কিবা সে পরশ ওর
পরশ পরশ দাস কালীহর
মাগে নেত্রে জল ভোর।

শ্রীকালিহর ভক্তি সাগর,
ঢাকা।

উদ্বোধন।

বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভ হে! তোমার সেই আনন্দ ঘন শ্রীমূর্ত্তি মনে হইলে আমি আত্মহারা হইয়া কি করি, কি বলি, বা কি লিখি কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার সেই জগদানন্দময় কারুণ্যরস বিভাসিত ঢলঢল সুন্দর প্রীতি প্রফুল্ল বদন ছবিখানি যখন হৃদি কন্দরের নিভৃত স্থানে অতি সন্তর্পণে প্রেমের তুলিকা দিয়া প্রীতির রঙ ফলাইয়া অঙ্কিত করি, তখন আমাতে আর আমি থাকি না। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল জ্ঞান থাকে না, ইহলোক পরলোক জ্ঞান থাকে না। ইহকাল পরকাল জ্ঞান থাকে না। অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে তোমার আনন্দ ঘনরূপ, তোমার চির সুন্দর অপরূপ রাশি, প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণের ন্যায় বিভাসিত হয়! নদীয়া মাধুরী মাখা তোমার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে! সেই সময় মনে হয় তুমি আসিয়াছ! প্রাণ গৌরাঙ্গ হে! তুমি ত সর্ব্ব বস্তুতে সর্ব্বস্থানেই আছ। জগতে যাহা কিছু ভালমন্দ, যাহা কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলইত তোমার অনন্ত লীলা সমুদ্রের উৎস মাত্র। তবে কেন তোমার সেই লীলা সমুদ্রের আনন্দ বেশ টুকু জীবের ভাল লাগে, তাহাদের প্রাণে আনন্দের উৎস বহাইয়া দেয়? ইহার উত্তর তোমার অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দ দিয়া গিয়াছেন। তুমিও স্বয়ং বলিয়া গিয়াছ। তবুও

আবার তাহা শুনিতে ইচ্ছা করে। তোমার কনক কেতকী সদৃশ কমল লোচন দ্বয়ে বারি বিন্দু দেখিলে, তোমার সেই কাণ্ড কারখানার কথা মনে হইলে, (তাহার আর নাম করিতে চাহি না) আনন্দ-দুঃখে পরিণত হয়, প্রেমাশ্রু শোকাশ্রুতে মিলিত হয়, মনের সকল শান্তি অন্তর্হিত হয়। প্রাণ-গৌরহে! তুমি ত সকলের মূলাধার। তোমার আবার সুখ দুঃখ কি? তুমি ত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষ, তুমিইত স্বয়ং পরানন্দ। তুমি কাঁদ কেন? তোমার নয়নে জল কেন? তোমার প্রাণে ব্যথা কেন? তুমি যদি কাঁদিয়া জগৎ ভাসাইবে, তবে জগৎ রাখিবে কে? দুঃখী, তাপী কলির জীবকে সান্ত্বনা দিবে কে? তোমার নয়নে নীরধারা দেখিলে প্রাণে মরিয়া যাই। তোমার দুঃখের কারণ ত অনুসন্ধান করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম-না! তবে তোমারই কৃপায় কিছু কিছু অনুভব করিতেছি। তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। তুমি জীবের প্রাণে শান্তিদাতা, তুমি তাহাদের পবিত্রাতা, তুমি তাহাদের সকল বিষয়ের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা। তোমার মনেই যখন দারুণ দুঃখ, তুমিই যখন কাঁদিয়া আকুল, তুমিই যখন ভিখারীর বেশে নয়ন জলে পৃথিবী ভাসাইলে; তখন তোমার সৃষ্ট জীব তোমারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিবেনা ত কি করিবে? তুমি সংসার সুখ অবলীলা ক্রমে তুচ্ছ করিলে, নদীয়ার সুখ ঐশ্বর্য্য পদে দলিলে, অনুগত নিজ জনকে প্রাণে মারিলে, ভক্ত জনকে কাঁদাইলে, বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ভার্য্যার বুকে শেল মারিলে! তোমার অনুগত ও আশ্রিত জন ইহা কি করিয়া চক্ষে দেখিতে পারে? ইহাতে কি করিয়া তাহাদের মনে শান্তি থাকে, আনন্দ থাকে? মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন তোমার দুঃখের প্রধান কারণ জীবে হরিনাম লইল না বলিয়া। হরিনাম লইবে কি করিয়া? কাঁদিতে কাঁদিতেই যে তাহাদের জীবন গেল! হরিনাম লইবার সময় কৈ? প্রাণ গৌরাঙ্গ হে! তোমার সৃষ্ট জীবের ক্রন্দন নিবারণ কর, হাহাকার দূর করিয়া হৃদয়ে আনন্দ দান কর। নদীয়ার চাঁদ! তুমি নদীয়ায় এ'স! যুগলে বস! আনন্দ-ধাম নদীয়ায় আনন্দের উৎস ছুটুক, আনন্দের কাননে আবার পারিজাত পুষ্প ফুটুক, নব বৃন্দাবন নদীয়ার কুঞ্জে কুঞ্জে আবার আনন্দোল্লাসের সুমধুর ধ্বনি উঠুক। তখন দেখিবে সকলেই মধুময় হরিনাম লইবে। তখন দুর্ভাগ্য জীব তোমাকে চিনিতে পারে নাই, এখন তাহাদের প্রাণের দেবতাকে তাহারা চিনিতে পারিয়াছে। তাহাদের ভ্রম তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

এ বুদ্ধিযোগ তুমিই তাদের দিয়াছ। তোমার কৃপার সীমা নাই, তোমার দয়ার অন্ত নাই! তুমি আবার নদীয়া মাধুরী লইয়া নদীয়ায় এ'স! এসহে আমার প্রাণ গৌরাঙ্গ এ'স! এ'সহে আমার প্রাণ বল্লভ এস! এ'সহে বিষ্ণু প্রিয়া নাথ এ'স! আর বিলম্বে কাজ নাই। সেই শুভ দিনের উদ্বোধন করিতে আজ "আনন্দ কুটীরে" "আনন্দের" উদয় হইল। জগৎ আনন্দময় হউক। ভুবন মঙ্গল শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুময় নামের জয় জয় কার হউক। গৌর হে! তুমি আনন্দময়। আনন্দময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত শুভাগমন করিয়া কলিহত জীবের আনন্দ বর্দ্ধন কর! ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের সকল দুঃখ দূর করিয়া তাহাদের শুষ্ক প্রাণে বিমলানন্দ সঞ্চার কর। নদীয়ার চাঁদ হে! তুমি ভিন্ন তাহাদের আর যে গতি নাই। একথা এতদিনে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছে। তুমিই তাহাদিগকে সুবুদ্ধি দিয়াছ। অতএব তোমার শ্রীচরণ সরোজে কোটি কোটি প্রণিপাত। জয় গৌর, জয় গৌর বিষ্ণু প্রিয়া! হরিবোল হরিবোল হরিবোল!!

শ্রীহরিদাস গোস্বামী,
ভুপাল, মধ্যভারত।

——(০)——

অভিনন্দন।

এস আনন্দ এস! এস নিখিল জনানন্দ আনন্দ এস! এস ভাবুক ভক্তের হৃদয়ানন্দ! তদ্গত চিত্তের ভজনা নন্দ! সৌন্দর্য্য পিপাসুর নয়নানন্দ! সকল আনন্দের কেন্দ্রানন্দ! আনন্দ! তুমি এস! এই নিরানন্দ ভরা তমসান্ধ প্রাণে তোমার আনন্দ ময় আসন খানি বিছাইয়া বসিবে, এস আনন্দ এস! এই ভাঙ্গা চুরা হৃদয় সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি, আমরা তোমার আবাহন জানিনা, তুমি নিজগুণে সে আসন অধিকার করিয়া বসিবে, এস আনন্দ এস!

আমরা তোমায় অনেক দিন হারাইয়া ছিলাম। কত যুগ যুগান্তরের অপরাধে জানিনা তুমি যে আমাদের অস্থি মজ্জায় শোণিতে শিরায় ওতপ্রোত ভাবে সংজড়িত আছ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হতাশ প্রাণ তাইতো

তোমায় কত খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিল। তোমাকে না পাইলে জীবন তো বৃথা, সাধনা তো ব্যর্থ হইয়া যায়। আমাদের জীবন ভার তাই দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছিল। এ দুর্দ্দিনে তুমি না আসিলে কে আর জীবের দীর্ণ দশা ঘুচাইবে? মলিন মুখ মুছাইবে? তাই বলি আনন্দ তুমি এস! সচ্চিদানন্দময়ের আনন্দ ঘন শক্তি আনন্দ তুমি এস!

হে আনন্দ! তোমাকে আবাহন করিবার মত আমাদের ঘরে আজ কিছু নাই, তোমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কোন উপচারইতো আজ আয়োজিত হইয়া নাই, তথাপি তোমায় ডাকিতেছি, বড় ভাল বাসি বলিয়া তোমায় ডাকিতেছি, বড় ব্যথা বেদনায় বিড়ম্বিত বলিয়া তোমায় ডাকিতেছি, আনন্দ তুমি এস! তুমি না আসিলে সংসার যে মরুভূমি হইয়া যায়, নন্দনের সুগন্ধী মন্দার যে নরকের তমোময়ী বিভীষিকার উপাদান হইয়া পড়ে, তাই বলি তুমি এস! জগতের কল্যাণ বিধান করিতে, দিগন্তে নিজ প্রতিভা বিতত করিতে, নিখিল মানবমণ্ডলীকে প্রসন্ন করিতে, এস আনন্দ তুমি এস!

সত্য সত্যই আনন্দ! আমাদের কিছু নাই। আমাদের উদরে অন্ন নাই, মাঠে ধান্য নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, গৃহে উৎসব নাই। তবে কেমন করিয়া কি দিয়া তোমায় ধরিয়া রাখিব? আমাদের গাছে গাছে আরত তেমন দেব ভোগ্য ফল আপনি ফলিয়া পথিকের ক্ষুন্নিবারণ করে না। আমাদের নদ নদী সরোবর আর ত তেমন অগাধ শীতল স্বচ্ছ সলিল সঞ্চিত রাখিয়া পিপাসুর পিপাসা মোচন করিতে পারে না! আমাদের কাননে কাননে বাস ভরা সরস কুসুম, সুরভি সুষমায় দিগন্ত আমোদিত করিয়া প্রভাতের প্রথম পূজারী দেবী প্রতিমা কুমারীকুলের, কর সঙ্গ আশায়, আর ত তেমন গর্ব্বভরে ফুটিয়া উঠে না! নগর পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, নিতি নিতি আনন্দ সন্ধ্যায়, দেবমন্দিরে-মঙ্গল আরতির মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ দুন্দুভি আর ত তেমন সুমধুর নাদে বাজিয়া উঠে না! আমাদের সেই সুখের দিন হায়, কবে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কোন্ মায়াবিনীর ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুলি সঙ্কেতে, কুটিল ইঙ্গিতে, অপাঙ্গ ভঙ্গীতে হে আনন্দ! তোমাকে ছাড়িয়া যাহাতে আনন্দ নাই, অমৃত নাই, সুখ নাই তাহাকে লইয়াই মজিয়া ছিলাম! আনন্দহারা হইয়া সোণার নন্দন বন শ্মসান সাজাইয়া, শেষে চিতা ভস্মের উপর বসিয়া অশ্রুর নয়নে ক্রন্দন করিতে ছিলাম। তুমি কি সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পার? নিরা-

নন্দের ধূলী মলা, আনন্দ ময় অঞ্চল খানি দোলাইয়া বিদূরিত করিতে তাইত তোমার এই শুভদ আবির্ভাব! এই পুণ্য দিনের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই মঙ্গল বাসরের মঙ্গল অবসরে হে আনন্দ! আমরা আজ তাই প্রাণ ভরিয়া তোমার আবাহন করিতেছি, তুমি এস! এস প্রাণবন্ধু আনন্দ এস! এস আত্মার পরমাত্মীয় আনন্দ তুমি এস! দেখ দেখ সখা! তোমার আগমনের অরুণ কিরণ ছটায় প্রকৃতির কিবা লাস্যময়ী শোভন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঐ ঐ দেখিতেছ না নিধু বনের তোরণ দ্বারে ময়ূরী তাহার মুনি মনোহর অপূর্ব্ব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে! ঐ ঐ শুনিতেছ না তমাল তাল তরুর শাখায় কোকিলা বধূ তোমার আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে! ঐ ঐ বুঝিতেছ না ভ্রমর ভ্রমরীর অস্ফুট গুঞ্জনে, কানন কুঞ্জের কুসুম সুষমায়, মলয় পবনের মন্দ সঞ্চালনে তোমারই মঙ্গল ঈক্ষণের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিতেছে! তাই অবসর বুঝিয়া চাঁদ ও বুঝি আজ বেশী হাসিতেছে, সুধা ধবল কিরণ ছটা সযত্নে বিতরণ করিতেছে! নববসন্তের মেঘ মুক্ত নীল-আকাশের রজত শুভ্র কৌমুদী ধারায় দেখ দেখ আনন্দ! তোমার আগমন পথে কত আলোক সজ্জা! তোমার আগমনের প্রতিপল অনুপল চন্দন চুয়ায় চর্চ্চিত করিয়া দিতে, দেখ দেখ আনন্দ দিগঙ্গনাগণ অপগত লজ্জা! ধবল চাঁদের শোভার ছটায়, শ্যামল মাঠের রূপের ঘটায়, রূপ শোভার ছটায় ঘটায় তোমারই অনিন্দ্য শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঐ যে পল্লী বালদল কর তালী তালে আনন্দের নাচনা জুড়িয়াছে! ঐ যে ঐ তোমাময় প্রাণ প্রেমিক ভক্ত আনন্দের গাহনা গাইতেছে!

সে প্রেমানন্দের নৃত্য ভঙ্গিমায়, সে ভূমানন্দের গীত বাজনায়, তোমরাইত আগমন উদ্বোধিত হইতেছে! এই ত তোমার আসিবার উপযুক্ত সময়। এ শুভ মুহূর্ত্তে তুমি না আসিয়া কি থাকিতে পার? সমস্ত মানব প্রাণ-এই দেখ আনন্দ! তোমাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য ঊর্দ্ধনেত্রে কত আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া দণ্ডায়মান! এই শুভ ক্ষণে নিখিল জীব কদম্বের হৃদয়াকাশে নিরানন্দ তমো বিদূরিত করিয়া কোটী সূর্য্যপ্রভা সমুদ্ভাসিত কর!

আবার তোমায় ডাকিতেছি এস আনন্দ এস! এস মানব বন্ধু আনন্দ এস! এস এস দুঃখ যামিনীর বুকচেরা ধন, সুখ প্রভাতের পরশ রতন, সব সুখ দুঃখ মন্থন ধন আনন্দ তুমি এস! এই অনন্ত জ্বালা মালাময় অন্তরের অন্তস্তলে আসিয়া তোমারই আসন তুমি অধিকার কর! তোমার

শান্ত শীতল স্নিগ্ধ মেদুর পরশ সঙ্কেতে বুঝাইয়া দাও "যো বৈ ভূমা, তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে আমাদের সুখ নাই, অল্প লইয়া আমরা আনন্দ পাই না, যাহা ভূমা, যাহা বিভু, যাহার আর বাড়িতে ঠাঁই নাই, আমরা যেন সেই আনন্দকে পাইয়া বিভোর হইয়া থাকি। তোমার মঙ্গল পরশে যেন বুঝিতে পারি "আনন্দং খল্বিদং ব্রহ্ম" যেন সেই অনন্ত স্বরূপ, আনন্দ চিন্ময় রস বিগ্রহ, নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিটীকে সমস্ত অমৃতের আদি প্রস্রবণ বলিয়া চিনিতে পারি। যেন সেই "অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনং মিবানলং" পরম পুরুষকে, জ্যোতিরভ্যন্তরে, রূপং দ্বিভুজং শ্যাম সুন্দরং সদোপাস্য মুরলীমোহন শ্যাম নটবর বলিয়া চিনিতে পারি। যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সদানন্দ কেন্দ্র, জগতের যত কিছু আনন্দ, যত কিছু অমৃত, যত কিছু সৌন্দর্য্য, সে অনন্ত সুধানিধি হইতে খণ্ডে খণ্ডে বিশ্লিষ্ট; আবার সে অনন্ত কল্যাণ গুণাকরের অনন্ত রূপ ভাণ্ডারে যত কিছু বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য আসিয়া পুঞ্জীভূত, সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" সত্যস্বরূপ মঙ্গল স্বরূপ সৌন্দর্য্য স্বরূপ মূর্ত্তিটীকে যেন "শান্তং শিবং" অদ্বৈতং বলিয়া চিনিতে পারি। যেন শান্তি স্বরূপ, শিব স্বরূপ, আর অদ্বৈত স্বরূপ সেই নিতাই গৌর সীতানাথের মধুর মঙ্গল স্বরূপ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যেন বুঝিতে পারি যে, যে নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিটীকে জগতের প্রথম সভ্যতার দিনে, মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগবেষণা, তপোবন তরুতলে বসিয়া, ওঙ্কারে ঝঙ্কারে ঘোষণা করিয়াছিল "রসো বৈসঃ", তিনিই আমাদের রস স্বরূপ রসিক শেখর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন। একই সেই তিনি চির সুহৃৎ, চির সুন্দর, ভাদ্রাষ্টমীর তামসী নিশীথে জগতের পূণ্যক্ষণে পূর্ণাবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ, আবার ফাগুনের উড়া ফাগে, রক্ত রাগে, গোরোচনা গৌরী অঙ্গ ছটার অঙ্গ রাখায়, নিজাঙ্গ ঢাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। একই সেই তিনি যেখানের তাল কাল, তমাল কাল, কোকিল কাল, ভ্রমর কাল, কাল কালিন্দীর জল কালো, সেই কালোর দেশে, কালো রাত্রিতে, কালীয় দমন কালাচাঁদ। একই সেই তিনি—আবার যেখানে লাল ফাগুয়ায় সব লালে লাল, যেখানে লাল ফুলে লাল অলি, লাল মধু খায়, সেখানে লাল চাঁদিনীতে শচীর দুলাল। যেন বুঝিতে পারি তিনিই ভক্তের প্রাণের ঠাকুর, প্রেমিকের পরাণ বন্ধু, পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত 'রসরাজ মহাভাব' স্বয়ং ভগবান, কান্তা কান্তি কলেবর, শ্যামসুন্দর, জগতের পরম তত্ত্ব, সাধনার চরম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। আর যেন বুঝিতে পারি সেই নন্দ যশোদার প্রেম

বন্ধনে অলিন্দ বদ্ধ আনন্দ ঘন বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দনন্দনই, আমাদের সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর, মধুর হইতেও সুমধুর, আনন্দ হইতেও পরমানন্দময়।

এস আনন্দ এস! এস এস বন্ধু! বলিয়া দাও বুঝাইয়া দাও তুমি আনন্দময়, তিনি আনন্দময়, আমরাও আনন্দময়, সকলই আনন্দময়! বুঝাইয়া দাও 'ওঁ আনন্দং ব্রহ্ম' তিনি আনন্দময়। বুঝাইয়া দাও "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ হইতেই নিখিল প্রাণীর সৃষ্টি, অতএব নিখিল নর নারীর হৃদয়েই আনন্দকণা অধিষ্ঠানের আসন আছে। আর বুঝাইয়া দাও 'আনন্দ রূপ মমৃতং যদ্বিভাতি' ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, উষায়, সন্ধ্যায় যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে কেবলই আনন্দ, 'যাঁহা তাঁহা আঁখে পড়ে' তাঁহা তাঁহা আনন্দময় কৃষ্ণ মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে!

এস এস আনন্দ! আজ জগতের আনন্দযজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ। তুমি এস, তোমায় আকুল প্রাণে ডাকিতেছি তুমি এস! দীনের এই প্রীতি চন্দন চর্চ্চিত, বন্দন উপহার, নিরানন্দ ভরা, আনন্দহারা, প্রাণের আকুল অভিনন্দন তুমি গ্রহণ কর! আশা পূর্ণ কর, জীবন সুখময় কর, জগৎ আনন্দময় কর, সাধনা সার্থক কর!

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ,
কাল্‌না—বর্দ্ধমান।

বাঙ্গালী অবতার।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহং॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন, যে সময় যে সময় ধর্ম্মের অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটে, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই। এস্থলে "যদা যদা" শব্দের দ্বারা প্রভুর আবির্ভাবের কাল ও হেতু নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু "যত্র যত্র" শব্দের প্রয়োগ এতৎসহ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোথায় কোনদেশে কোন সমাজে তাঁহার আবির্ভাব হইবে তৎসম্বন্ধে কোন কথায় স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই।

কিন্তু তত্রাচ সহজেই নিষ্পন্ন হয় যে "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" এই কথা সঙ্কেতে প্রকাশ করিতেছে যে, যেখানে গ্লানি সেখানে যথা সময়ে প্রভু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। "যদা যদা" শব্দদ্বারা "যত্র যত্র" স্বতই ধ্বনিত হইতেছে। কারণ যখন যাহা ঘটে কোনও স্থান অধিকার না করিয়া ঘটিতে পারে না, (কারণ এই স্থানও ঘটনার এক হেতু) এবং ধর্ম্মের গ্লানিবশতঃ সেই স্থানেই গ্লানির কেন্দ্র বা মুখ্য স্থলেই প্রভুর প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। যেহেতুক সেই ধর্ম্ম গ্লানি দুষ্ট স্থলের জন্যই আবির্ভাবের প্রয়োজন।

একই সময়ে পৃথিবীময় গ্লানি সম্ভবে না। সুতরাং সমস্ত ভূমণ্ডলের জন্য প্রভু প্রকট হয়েন না। কোন দেশ বিশেষের ধর্ম্ম সংস্কারার্থে তিনি মায়া দেহ ধারণ করেন। এই জন্য অবতার দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন। তন্মধ্যে অংশ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন এই পঞ্চ অবতার সমস্ত ভূমণ্ডলের সাধারণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন রাম, রাম, রাম * কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য সকলেই শুধু স্থূল গণনায় ভারত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকিলেও সূক্ষ্ম বিবেচনায় তৎফল জগদ্ব্যাপি সন্দেহ নাই। উক্ত সাধারণ অবতার বাদে সমস্ত ইয়ুরোপে চতুর্যুগান্তে একটি অবতার প্রকট হইয়াছেন যীশু। পশ্চিম এসিয়া খণ্ডে আবির্ভূত একমাত্র মহম্মদ। এসব প্রামাণিক অবতার। তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি ভারতেরই অঙ্গ মাত্র। ভারতসম্ভূত এক অবতারের লীলা কল্পনে একাঙ্গ বলিয়া এসব ছাইযাছে ; ইনি বুদ্ধ।

এখন আপনারা মানিবেন কি, ভারতেই ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি? নচেৎ শ্রীভগবান এক ভারতেই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন কেন ? এ কথা যথার্থ বটে। ভারত কুলে, শীলে, জ্ঞানে, সভ্যতায় পৃথিবীতে বৃদ্ধ গুরু, অথচ তাহারই বুকের উপর মুহুর্মুহু ধর্ম্মগ্লানি সংঘটিত হইতেছে। ইহার হেতু অতি সুন্দর। অসভ্য জাতি বিশেষে কোন ধর্ম্ম বা শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া যাউন, উহা অটুট থাকিবে। কারণ অশিক্ষিতের ভীরুতা একটা স্বভাব। তন্নিবন্ধন তাহারা প্রাণপণেও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না। বরং প্রাণদিয়া মানে গণে, অনুসরণ করে। ঠিক যেন উহা জাতীয় স্বভাব। কিন্তু সভ্য সুশিক্ষিত মধ্যে বুদ্ধির অতি বিকাশ হেতু উহার কম্প চাঞ্চল্যে ধর্ম্ম স্পন্দিত ও আলোড়িত হয়। বুদ্ধি বিকাশ সহকারে লোকের সাহস এত বেশী হয় যে, চিরপ্রথিত ধর্ম্মকেও ক্রীড়াপুতুলবৎ হস্তে নাড়া চাড়া করে এবং

* পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।

তৎকালে মতভেদ সমুৎপন্ন হয় ও নানা বিকার আসিয়া ধর্ম্মের গুরুত্ব হানি করে। তখন নানা মুনির নানা মত দল বাঁধিয়া শ্মসান ভূতবৎ নাচিতে থাকে। এই পৌনঃ পুনিক ধর্ম্মগ্লানি, ভারত যে অতি পুরাণ উন্নত দেশ তাহার পরিচয় দিতেছে। ভারত মধ্যে বঙ্গদেশ এককালে এতই অবনত ছিল যে এখানে কোনই ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অত্যাচার ছিল না। (এখনও যেমন পাহাড়ে পর্ব্বতে নাই)। সুতরাং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে হইয়াছেন (অংশ বা পূর্ণ)। কিন্তু প্রভু বঙ্গে এতকাল আর কভু আবিভূর্ত হয়েন নাই। বঙ্গের উন্নতি সভ্যতার সঙ্গেই প্রভুর আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল।

আমরা ধর্ম্ম গ্লানি জীবন ভরিয়া অহরহঃ দেখিতেছি অথচ অবতারের আগমন দেখিনা। ইহার কারণ কি? যেদিকে চাহি কেবল অধর্ম্মেরই বিকট কেলি, বাটপারি দেখিতেছি। কিন্তু তবু প্রভু আবিভূর্ত হয়েন না কেন? তবে কি ভগবদ্বাক্য মিথ্যা? না, ভগবদ্বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। উহা ম্যাকবেথ ভুলান 'ডাইনের' উক্তি নয়। আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইতস্ততঃ আমরা যে সব রোগবিকার দর্শন করিতেছি, ইহাই প্রকৃত গ্লানি নহে। অথবা উহা গ্লানির অতীব ক্ষুদ্রাংশ। ধর্ম্ম গ্লানি পূর্ণমাত্রায় না চড়িলে অবতারোৎপত্তির হেতু দাঁড়ায় না। "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ" এবং "অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানম্" কি, আমরা প্রহ্লাদ চরিত্রে তাহার স্ফুট বিবৃতি প্রাপ্ত হই। অবতারোৎপত্তির হেতু আমরা প্রহ্লাদ কাহিনীতে বিশদ ভাসমান দেখিতে পাই। "ধর্ম্মস্য গ্লানি" অর্থাৎ ধর্ম্মের বা ভক্তির উপর অত্যাচার। দেখুন, ভক্ত প্রহ্লাদ সাক্ষাৎধর্ম্ম স্বরূপ। তাহার উপর পাপ হিরণ্য কশিপুর নিষ্ঠুর পাশব অত্যাচার স্মরণ করিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠে! পক্ষান্তরে অধর্ম্মরূপী হিরণ্যকশিপুর অভ্যুত্থান ভাবিয়া দেখুন, উনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর, প্রতাপে অদ্বিতীয়, উনি ভাবিলেন 'আমার উপর আর কর্ত্তা নাই, "আমিই ঈশ্বর, হরি কে'? "আমিই ঈশ্বর" এই জ্ঞানের উপর মোহ ও পাপ নাই। ইহাই পাপের চরম। এই জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রহ্লাদ হরিভক্ত; ভক্তের উপর দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন! ভক্ত বৎসল ভগবানের প্রাণে তা সহিলনা। প্রহ্লাদ প্রাণের উৎস হইতে এমনি ডাক ছাড়িলেন যে, দীন বৎসল ঠাকুর আর আসনে থাকিতে পারিলেন না, নৃসিংহ রূপে আবিভূর্ত হইয়া ভক্তকে অভয় দিলেন, পাপধ্বংশ করিলেন, ধর্ম্মের (ভক্তির) জয় ঘোষণা করিলেন। ভক্তের প্রাণ শীতল হইল। যখন

পাপ এত দুর প্রবল হইয়া ছাইয়া পড়ে যে লোক মদগর্ব্বিত ও মোহান্ধ হইয়া ভাবে "আমিই সর্ব্বে সর্ব্বা, দুনিয়ামে আওর কোন্ হ্যায়'? এমন কি সেই শয়তান ঈশ্বরকেও অধিকারে বঞ্চিত করিতে বসে, ভাবে, "হরি কোন্ হ্যায়? আমি যা করি ভাল,যা করি শোভা পায়, বেশ।" তখন আর মানীর মান থাকে না, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নিয়া পালাইতে হয়, ন্যায়কে অন্যায়ের চাপায় ফাপর হইতে হয়, দীন দরিদ্র গরীব কাঙ্গালের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না, সাধু সজ্জন যখন এইরূপ লাঞ্ছিত ও পীড়িত হয় তখন তাঁহারা পীড়া, যাতনা প্রভুর নামে নিরীহ দীন কাতর ভাবে সহ্য করিতে করিতে, স্থিতি স্থাপকতা বশে এমনি অসহিষ্ণু হইয়া অবশেষে কাঁদিয়া দেয় যে, তখন তুড়ন্বীবৎ শোঁ শোঁ শব্দে এক উচ্ছাস উত্থিত হয় এবং প্রাণ ভরিয়া 'হা কৃষ্ণ ত্রাহি ত্রাহি' নাদ গর্জ্জন হয়। অমনি চৈতন্যসিন্ধু আলোড়িত হইয়া জলস্তম্ভবৎ ঘন চৈতন্য মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়া বরাভয় দান করেন। ভক্তের ডাকে ভগবান আসেন, কেমন ধারা? সূর্য্যকান্ত মণিতে যেমন সূর্য্যতেজ ঘনীভূত হয়, কুণ্ডলগ্ন নলে চুমুক দিলে যেমন জল আসে, সেইরূপ গ্লানির মাত্রা পূর্ণ হইলে পীড়িত ভক্তের প্রাণের চুমুকে অবতার প্রকট হয়েন। গ্লানির ব্যাপকত্ব যত অধিক অবতারের অধিকার তত ব্যাপক। এক দিকে বলা যাইতে পারে নৃসিংহের আগমন কেবল প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য, কিন্তু দেখুন ত্রিলোক পর্য্যন্ত হিরণ্যকশিপু দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ছিল। এ জন্য নৃসিংহকে জগতের সাধারণ অবতার বলিয়াছি। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদের লোক সমাজে ব্যাপকতা (Popularity) বেশী, এ সব ব্যক্তি বিশেষকে কৃপা করিতে আসেন নাই। ইহারা খণ্ড জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন। কোন্ তরঙ্গ কত দূর ধায়, এখনও নির্ণয় করা যায়না। শ্রীচৈতন্যে প্রভু উৎপীড়িত ভক্ত মণ্ডলীর আহ্বানে আভির্ভূত না হইলেও মূলে তাহাই। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তগণের প্রতিনিধি হইয়া ডাকিয়া ঠাকুরকে পাড়িয়া আনিয়া জীব নিস্তার করিয়াছেন। কোন ভক্ত বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান আসেন কিন্তু আসেন জীবে কারণ্য বিস্তার করিতে।

চক্ষু যতই নিস্তেজ চশমার শক্তি (Power) ততই প্রখর হওয়া আবশ্যক। যাহারা চশমা ব্যবহার করেন তাহারা এ তত্ত্ব জানেন। যজ্ঞবলি, পশু ঘাতন যখন গ্লানিরূপে পরিণত হইল, তখন বুদ্ধ আসিলেন। কারণ কর্ম্ম

চে'য়ে জ্ঞান বরীয়ান। জ্ঞানের উদ্দাম পরিণাম নাস্তিকতারূপ গ্লানি দেশ ছাইল, ধর্ম্মের স্থল কেবল নীতিতেই অধিকার করিল, তখন আসিলেন শঙ্কর। কারণ নাস্তিকতা চে'য়ে অদ্বৈত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, সুন্দর শাসন। আবার যখন জ্ঞান বিকার 'সোহঙ্কার' মদে দেশ উৎসন্ন হইতে চলিল, তখন আসিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। জ্ঞান পরিণাম ভক্তি। আমি নাই আমি আছি, কিন্তু ঈশ্বর—আমিও ঈশ্বর। আমিও চিৎ তিনিও চিৎ, সুতরাং অভেদ (অভিন্ন)। তিনি পূর্ণ চিৎ—আমি চিৎ কণ; সুতরাং ভেদ (ভিন্ন)। এই ভেদাভেদ বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—আগমন করিলেন। বহু শতাব্দীর ভিতর আমরা ভারত ভিন্ন অন্যত্র ধর্ম্মগ্লানি দেখিতে পাই না, ইহার কারণ এই যে মোটাধর্ম্ম সহজে রক্ষিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সহজে নির্ব্বিকার রাখা যায় না। স্থুল ধর্ম্মের গ্লানি কম। সভ্যতার সঙ্গে শিষ্টাচার, আদব ক্বায়দা বর্দ্ধিত হয়। তখন সামান্য ভ্রমেও অশিষ্টতা হয়। কিন্তু অশিক্ষিত অভদ্র সমাজে গায়ে পা ঠেকাইয়া বসিলেও অভদ্রতা হয় না, ভারতধর্ম্ম সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম! চারি যুগ মধ্যে যতগুলি ধর্ম্মগ্লানি ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে যেইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তৎসম্বন্ধী অবতার, অবতারগণ মধ্যে প্রবল ও প্রখর।

চারিশত বৎসর হইল, তাহারও আগে ভারতে, বিশেষতঃ ভারতের কোমল কলিজা স্বরূপ বঙ্গদেশে, তাহাও আর্য্যাবর্ত্তের সুষুম্না নাড়ী স্বরূপ গঙ্গাতীরে, এমন ভীষণ ধর্ম্মগ্লানি সংঘটিত হইয়াছিল যে ঐরূপ আর কদাপি, কুত্রাপি ঘটে নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধি দু'টি পৃথক বস্তু। জ্ঞান ভগবৎ সম্বন্ধি, বুদ্ধি আত্ম সম্বন্ধিনী। জ্ঞানে সবকে শৃঙ্খলিত রাখে। বুদ্ধি সবকে আউলাইয়া দেয়। মুসলমানশাসন কালে, লোক জ্ঞানদৃষ্টি হারাইয়া বুদ্ধি বশে আত্মসুখে ব্যস্ত হইয়া ব্যবসায়ী হইয়া পড়িল। এবং এই ভাবে তাহাদের স্ব স্ব মত ধর্ম্ম মতে মনগড়া ধর্ম্ম মতে পরিণত হইল, কিম্বা অনেকগুলি বুদ্ধিমান লোক ধর্ম্ম দিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল। এইরূপে স্রোতস্বতী বেগ হারাইয়া যেমন নানা শাখায় বিভক্ত হয়, সেইরূপ বঙ্গবাসী সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এবং অজ্ঞানাচ্ছন্নতায় ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি দেবতার পূজায় রত হইয়া অসার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। একেশ্বর বাদ ও নির্ম্মল ভক্তি তত্ত্ব দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এবং লোক সমাজে ঘোর অনৈক্য পিশাচের লীলা খেলা হইতে লাগিল। শুষ্ক বিদ্যার স্থল নবদ্বীপই এই গ্লানির মূলোৎস হইয়াছিল। এখানেই ভক্তগণের অবমাননা, ভক্তগণের

প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। আরও কারণ এই যে পণ্ডিতের মূর্খতায় যেরূপ বিষ ফল উৎপাদন করিতে পারে এবং ব্যাপক হইলে সমাজ কলুষিত করিতে পারে মূর্খের মূর্খতায় তত অনিষ্ট ঘটাইতে পারে না। এই তুমুল বিষ প্রবাহ ফিরাইতে, বিদ্বানের চৈতন্য জন্মাইতে অতি বড় বিদ্বানের অতি বড় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবার বাঙ্গালার কোমল মাটির জীব ও অতি কোমল, সুতরাং অতি কোমল মধুর মহা চৈতন্যের আগমন আবশ্যক হইয়াছিল। লর্ড ম্যাকলে যে ভাবেই "The castilians have a proverb that in volencia the earth is water and the man woman ; and the description is at least equally applicable to the vast plains of the lower Ganges" এই কথা গুলি লিখিয়া থাকুন, দেবী সরস্বতী সত্যই বলাইয়াছেন। বাঙ্গালী ভালবাসার ঘট! ভালবাসা জিনিষটী (woman) মেয়ে বটে। মে'য়ে রাধার ভাব নিয়াই. গৌর এসেছেন। আবার তাই বঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীহর ভক্তি সাগর—ঢাকা।

গৌর আকুলতা।

হে গৌর ভগবান! আমি তোমায় কি ব'লে ডাকিব? এ পর্য্যন্ত কত নামেই ডাকিলাম কিন্তু কৈ, তোমার জগমন ভুলান সোণার ছবি খানি তুমি দেখাইলে কৈ? তাতেই বুঝি, আমি তোমাকে ডাকিতে জানিনা। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে অবশ্যই সে ডাক তোমার কাণে পৌছিত, অবশ্যই প্রভু তোমার কৃপা হইত। কিন্তু প্রভু করি কি? এক নামে তোমাকে ডাকিতে তোমার শত নাম অন্তর ভেদ করিয়া আমার মুখে ফুটিয়া উঠে! আমাকে একেবারে পাগল করিয়া তোলে! আমি যেন আর ইহলোকে থাকি না। আমার লজ্জা সরম বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই তখন লোপ পায়! বল বল দয়াল। কি নামে তোমায় ডাকিব। কি নামে ডাকিলে তোমার স্নেহসুধা লাভ করিতে পারিব।

মহাজনগণ বলেন "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা" আমার সাধনই হইলনা সিদ্ধদেহের আশা কিরূপে করিতে পারি? প্রভু গো!

আমার কেবল তোমার জগমন ভুলানরূপ খানিই ধ্যানের বস্ত হইয়াছে। আমার কেবল তোমার অমৃতোপম শ্রীগৌরাঙ্গ নামই জপের মন্ত্র হইয়াছে। বল বল নাম! আমার কি এ আকুলতার কোন মূল নাই? আমি কি ভ্রান্তি বশে প্রতারিত হইতে বসিয়াছি? বল বল গৌর। তোমায় ডাকি কি ব'লে?

কেহ কেহ বলেন তোমাকে গুরু জ্ঞানে, সাধনের স্থানটীকে বৃন্দাবন কল্পনা করিয়া, সখীর অনুগতা হইয়া, রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা করাই বিধেয়। প্রভু গো! আমি শাস্ত্র জানিনা, যুক্তি বুঝি না, যুগল উপাসনা তত্ত্ব ও সম্যক ধারণা করিতে পারি না, আমি কেবল তোমার নামই জানি, তোমার অমিয়া মথিত মধুর গৌরাঙ্গ নাম শুনিলেই আত্মহারা হইয়া পড়ি। এ অবস্থায় তোমার নাম নাই, বীজ নাই, পূজা নাই একথায় আমি আস্থা স্থাপন করি কিরূপে? কারণ ইহা হইলে আমি আর কাহাকে ভাল বাসিব? কাহার মোহনরূপ অহর্নিশ চিন্তা করিব? ও নাম ছাড়া আর যে কোন নামই ভাল লাগে না। ও রূপের কাছে আর যে কোন রূপই দাঁড়াইতে পারেনা। আর এক কথা, আমার প্রাণ মন তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি। নিবেদিত বস্তু আমি আর কাহাকে দিব? তাতে কি আমার পাপ সঞ্চয় হইবে না? বল বল প্রভু। আমার উপায় কি হইবে? আমার এত সাধের বস্ত ছাড়িয়া আমি কিরূপে থাকিব? সত্যই কি তোমার নাম নাই, মন্ত্র নাই, পূজা নাই? উহারা বলে কি? এ কথা যে প্রাণে বরদাস্ত হয় না! তুমি আমার অন্তরের দেবতা, মন্ত্র না থাকিলে কিরূপে তোমায় অন্তরে পাইব? যদি তোমার মন্ত্র না থাকিল উপাসনা না থাকিল, তবে তুমি যুগধর্ম্ম পালক কিসে? ইহা যে প্রভু বুঝিতে পারি না! কলির জীবের মলিন দশা দেখিয়া, সেই গোলকধাম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আসিলে, তোমার মন্ত্র নাই, তোমার উপাসনা নাই এ কথা কি সম্ভব হইতে পারে? বল বল প্রভু! একথা কি জন্য উঠিল? এ সংশয়ে কি পাপের আশ্রয়ে তোমার চরণাশ্রিত কাঙ্গালদিগের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল?

প্রভু! আমার কোন দার্শনিক জটিল বুদ্ধি,—কি শাস্ত্রতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই। আমি যেমন সরল, তেমন সরলান্তঃকরণে ইহাই বুঝি যে, তোমাকে যখন সকলেই প্রেমাবতার বলিয়া থাকে তখন তোমার ধ্যান, বীজ, পূজা অবশ্যই আছে। প্রভু! আমাকে বলিয়া

দাও, কি নামে ডাকিলে, কি মন্ত্রে জপিলে তোমাকে পাওয়া যায়, জীবের দুঃখ দুর্গতির অবসান হইয়া থাকে! আমি সেই নাম আর সেই মন্ত্রেই তোমার উপাসনা করিয়া এ জন্মের সাধ পূর্ণ করিয়া লই। এই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক করি। যদি এই সাধনযোগ্য, ভজনযোগ্য দেহ লাভ করিয়াও তোমায় ডাকিতে না পারিলাম, তবে আমি কি কাজে সংসারে আসিলাম? আবারও প্রভু সেই চৌরাশি কুণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে নাকি?

প্রভু! সে ভয় যে আমার হইতেছে না। কারণ তুমি আমার, আমি তোমার, তোমার সহিত জীবনে মরণে সম্বন্ধ, তুমি করুণাময়, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিতে পার? কখনই না। কর্ম্মদোষে, মায়াবশে, যদিও তোমাকে আমি ভুলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে ভুলিতে পার না, যেহেতু তোমার অযাচিত দয়া, অসম্ভব কৃপা! প্রভু! তুমি বলিয়া দাও কি নামে তোমাকে ডাকিব, কিরূপে তোমাকে ধ্যান করিব? কি ভাবে জ্ঞান "ধূপতিতে" শ্রদ্ধাধূপ জ্বালিয়া তোমাকে আরতি করিব? কি আকারে ভক্তি কুসুমে প্রেমচন্দন মিশাইয়া তোমার ভুবনমোহন রাতুল চরণ অর্চ্চনা করিব?

হে গৌর ভগবান! আমার বড় সাধ, দেহটাকে নবদ্বীপ করিতে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়টাকেই শ্রীবাসের আঙ্গিনা করিয়া লইতে। প্রভু! তোমার কৃপায় এসাধ আমার অবশ্যই পূর্ণ হইতে পারে। প্রভু! একদিন একটু করুণ নয়নে চাহিবে কি? একদিন আমার হৃদয় শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তুমি আসিবে কি? আমি যে সেই কীর্ত্তন বিহারই অধিক ভালবাসি। সেই মনোমোহকর ভাব ভঙ্গীই সর্ব্বদা চিন্তা করি! প্রভু গো! আমার বাসনা কি পূর্ণ হইবে না? আমি আগেই বলিয়াছি, আমি তোমাকে ডাকিতে জানি না। সুতরাং ডাকিয়া তোমাকে পাইব না। তোমার কৃপা মাত্রই আমার সম্বল। প্রভু গো! দেখিও তোমার দীন দয়াল নামে যেন কলঙ্ক না রটে!

আমি এবার কত চৌরাশি ঘুরিয়া এ সাধের মানব কুলে আসিয়া পড়িয়াছি। যদি এবারও তোমাকে ডাকিতে না শিখিলাম, যদি এবারও তোমাকে ডাকিতে না পারিলাম, তবে আমার উপায় কি হইবে? তুমিই বলিয়া দাও, আবার আমাকে চৌরাশি ঘুরাবে নাকি? কত ঘুরিয়া আসিলাম ইহাতেও কি ঘুরার শেষ হয় নাই? শুনিয়াছি কলিতে যাগ

যজ্ঞ কর্ম্ম কাণ্ড কিছুই নাই। এক মাত্র আকুল ভাবে তোমাকে ডাকিতে পারিলেই মনোরথ পূর্ণ হয়। তুমি কলির স্বল্পায়ু কাম হত মানবের পক্ষে ভজনের সহজ উপায় করিয়া দিয়াছ। অতএব তোমার মত এমন দয়াল আর কে আছে ?

কিন্তু হায়! আমি সংসারের দুরত্যয়া মায়ায়, কামিনীকাঞ্চনের প্রলোভনে তাহাও পারিলাম না! এখন জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায়, সংসার মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে, জ্বলিয়া, পুড়িয়া ভবের ঘাটে বসিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলি গণিতেছি। কিন্তু নাম গাহিতে ভুলিয়া যাইতেছি। কবে যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়া আমার জীবনভাস্করকে কাল জলধি সলিলে ডুবাইয়া ফেলিবে কে জানে ?

কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি নাই। "মরিব মরিব সই নিশ্চয়ই মরিব, কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব ?" কানুর জন্যই ভাবনা! কানুর জন্যই এত সংসার যাতনা! কানুর জন্যই এত চৌরাশি ভ্রমণ! তাই ভবে মরিয়াও মরিতেছি না, দেহের খোলস বদলাইতেছি মাত্র। কারণ আমার কানুকে কাহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইব ? তাই এত ঘুরিতেছি, এত জ্বলিতেছি, এত মরিতেছি!

কানুকে আর কাহার হাতে সমর্পণ করিব ? সে যে আমার হৃদয়ের ধন, অন্তরের রতন। সেই অন্তরের বস্তুকে অন্তরে সমর্পণ করিতে না পারিলে আমার ত মরা হয় না। কারণ মরিয়াও আবার জন্মিতে হয়। যে দিন আমার কানুকে অন্তরে সমর্পণ করিয়া, হৃদ্‌মন্দিরে রাখিয়া অহর্নিশ দেখিতে পাইব, সেই দিনই আমার যথার্থ মরণ হইল! সেই নির্ব্বিকল্প ভাব সমাধিতে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে, আর জন্মিতে হইবে না। কারণ তখন আর আমার কানুর জন্য ভাবনা নাই। যাঁহার জন্য জন্মিয়াও মরিতেছি, মরিয়াও জন্মিতেছি, ঘুরিতেছি, সে ধনকে আমি যথাস্থানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি। তখন শত শত প্রলয় মহাপ্রলয় গর্জ্জন করিয়া আসিলেও আমার কানুধন বিচলিত হইবে না। আমার মানস নয়নের পলক পড়িবে না। কিন্তু এবারও বুঝি আমি কানুকে সে হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বুঝি কানুর জন্য আরও কতবার ঘুরিতে হইবে। হে আমার গৌরকানু! আর আমাকে তুমি সংসার গারদে পূরিওনা, সংসার জ্বালা আর সহ্য করিতে পারি না! এখন আমাকে ডাক শিখাইয়া দাও। সে নামে ডাকিতে

ডাকিতে তোমাকে সেই নিশ্চিন্তপুরে রাখিয়া, আমি মরিয়া যাই। কারণ বাহিরে মরিতে না পারিলে যে আমি ভিতরে বাঁচিতে পারি না। হায় সে মরা বাঁচা আমার কবে হইবে? সেই বিষামৃত যোগ আমার ভাগ্যে কবে হইবে? সেই দিনের অপেক্ষায় ভবের কূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আশা করি, এ জন্মেই আমার জন্ম ভোগ ফুরাইবে। সমস্তই তোমার কৃপা সাপেক্ষ। হে গৌর ভগবন! যেন তোমার নাম লইতে লইতে মরিয়া পুনরায় (অন্তর রাজ্যে যাইয়া) বাঁচিতে পারি। এবং তোমার চরণ দিবানিশি সেবা করিতে পারি। প্রভু-গো. সেই দিনের যেন বেশী দিন বিলম্ব আর না থাকে। হে আমার হৃদয় রমণ, সোনার চাঁদ, গৌরকিশোর! সেই দিন কি এজন্মে হইবে? সেই দিনের আসার আশায় হাসিতে কাঁদিতে ভবের ঘাটে বসিয়া রহিলাম। জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ !!

শ্রীবিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।
ডুবলাচাঁদ, 'ভক্তিকুটীর' নোয়াখালী।

কাঙ্গালের মনের কথা।

ভাই মরজগতের মানুষ! আর মোহমদিরা পানে বেহুস্ হইয়া থাকিওনা। একবার চৈতন্য হও। হইয়া আপন কর্ত্তব্য পালনে প্রাণপণ চেষ্টা কর। দিন তো ফুরাইয়া গেল। অভিমান,—অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। সংসারের অলীক সুখ-দুঃখে অভিভূত হইয়া, আর আপনাকে সুখী-দুঃখী মনে করিওনা।

একটুকু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখ, এই সংসার স্বপ্নের খেলা! পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, ঘর, বাড়ী, বিষয়, বিভব সমস্তই মিথ্যা। সময় অনিবার্য্য গতিতে চলিয়াছে। সে কাহারও নিষেধ বাধা শুনিতেছে না বা মানিতেছেনা।

এই যে দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর অনন্ত অতীতের অতলস্পর্শ গভীরতায় ডুবিয়া পড়িল !! আসিতে আসিতে আমরাও জড় জগতের দুঃখ দুর্দ্দশার বা অনিত্য সুখ সন্তোষের ভিতর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে বৎসরের শেষ দিনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ভাই ভাবিয়া দেখ, করিলাম কি? কিছুই না। এইরূপে যাইতে যাইতে হঠাৎ একদিন সেই শেষের

দিনটাতে যাইয়া উপস্থিত হইব। সে দিন স্নেহ মমতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলটী ছিঁড়িয়া যাইবে,—পুত্র, কন্যা পরিজনের নিকট হইতে অনিচ্ছা স্বত্বেও চির-বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

তুমি তোমার শেষের দিনটার দিকে কখন চাইয়া দেখিয়াছ কি ?

বোধ করি না। ওঃ! কি ভয়ানক দিন!! সেদিনের কথা মনে হইলেই অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। হরি হরি হরি !!! জীব দেহের কি শোচণীয় পরিণাম রে !!

দেখ, দেখ,—তোমার সেই অন্তিম চিত্রটী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লও। শেষের দিনের অবস্থাটা ক্ষণকালের জন্য আপন মানসপটে অঁকিয়া তুল।

ঐ দেখ,—তোমার সুস্থ ও সবল দেহটী সম্প্রতি কালপ্রভাবে রুগ্নাবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণ,—কণ্ঠাগত। মুখশ্রী, নিতান্ত মলিন। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে। তুমি আর এখন তোমার বাসগৃহ বা সুখ দায়িনী পর্য্যাঙ্ক শয্যায় না,—বাহিরে,—ধরাশয্যায়। এখন আর তোমার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই,—সটান চিত্ হইয়া পড়িয়া আছ। এই যে তোমার নেত্রদ্বয় উর্দ্ধে উঠিয়া শিবনেত্রের আকার ধারণ করিয়াছে।

আর অধিক বিলম্ব নাই,ঘনশ্বাসের পর যে দীর্ঘশ্বাস উপস্থিত! এখনই লীলা সাঙ্গ।

এই যে চারিদিকে তোমার স্বজন বান্ধব কত আর্ত্তনাদ করিতেছে,—মাথা কুটিতেছে,—মরা কান্নার রোল তুলিয়াছে,—তুমি আর এখন তাহার কিছুই দেখিতে শুনিতে পাও না!!! হায়রে তোমার দশা! চক্ষু আছে দেখ না,—কর্ণ আছে, শুন না,—নাসিকা আছে গন্ধ পাওনা—জিহ্বা আছে রস বোধ করিতে পার না,—ত্বক আছে স্পর্শ জ্ঞান নাই। হরি হরি!! কি ছিলে আর কি হইলে রে! চরণদ্বয় অবশ হইয়া গিয়াছে! হাত দুখানিরও তদবস্থা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলি আছে, কিন্তু থাকিয়াও নাই। তোমার মাটির দেহটার এখন মাটি হইতে চলিল। ফুরাইল, ফুরাইল, হরিবোল! হরিবোল !! হরি বোল !!!

ঐ শুন, না শুন না ? হায়রে! আর কি শুনার দিন আছে !! এই যে তোমার দুই একজন আসন্ন-বন্ধু কাণের উপর পড়িয়া খুব জোরে জোরে

"হরেকৃষ্ণ" নাম শুনাইতেছে। তুমি কোথায়? শ্রীনামটী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে কি? অহো! কি মর্ম্মবিদারক অবস্থা!! এখনই তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। এখনই তুমি এই সুখ-দুঃখময় সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে। তোমার অতি যত্নের দেহটী এখনই শ্মশানানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

কেমন?—এই যে আমি দেখাইতেছি, তোমার চরমাবস্থার এই আলেখ্যটী দৃষ্টি গোচর হইতেছে কি? ভবিষ্যতের ভীষণ ও অনিবার্য্য অবস্থাটী অনুভবে আনিতে পারিতেছ কি? হরি! হরি!! হরি!!!

তুমি রাজা হও, আর প্রজাই হও,—পণ্ডিত হও আর মূর্খই হও,—ধনী হও আর দরিদ্রই হও,—যাহাই হওনা কেন,—এই অন্তিম দশাটীতে একদিন না একদিন পঁহুচিতেই হইবে। নির্ম্মম কৃতান্ত তোমার অন্ত দিনের আগমনাপেক্ষায় পাছে লাগিয়াই আছে। মনে ভাবিও না, "সকলেই মরিবে, কেবল মরিবনা আমি।"

সময় সঙ্কীর্ণ। আর বৃথা কার্য্যে কালক্ষেপ করা ভাল নয়। যে দিন অতীতে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর শোচনার প্রয়োজন নাই। এখন প্রস্তুত হও। যাবার দিন অতি নিকটে। মনে কর যাবার দিন অতি নিকটে।

ভাইরে! রোগ, শোক, পাপ, তাপ পরিপূর্ণ এই জঞ্জাল জড়িত সংসারের আশা ছাড়িয়া দেও। রিপুর রাজ্য হইতে আত্মরক্ষা কর। করিয়া প্রেম জগতে যাও। স্বাধীন হও। স্বাধীন না হইলে আর তোমার আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণের পথ পরিষ্কার হইবে না।

আশা কুহকিনীর কুহকজালে জড়িত হইয়া আর মিথ্যাকে সত্য মনে করিও না। করিয়া পদে পদে প্রতারিত হইও না। এই সংসারে কেবল শ্রীহরিনাম ভিন্ন, কিছুই সত্য না, সকলি মিথ্যা।

শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্রে আকৃষ্ট হইয়া আর কত কাল এই পাঞ্চ্যজগতের সুখ ভোগ করিবে? তোমার জন্য এমনি একটি দিন আসিতেছে যে, এই শব্দস্পর্শাদির অনুভূতি তোমার মাত্রও থাকিবে না।

তবে আর বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ? যাহাতে আর এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহ লইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে না হয়, তাহার উপায়োদ্যোগ করিতে থাক।

এখনও সময় আছে। এখনও গৌরগণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলে কালের দায় হইতে এড়াইতে পারিবে।

গৌর গোষ্ঠী বড় দয়ালু। বড় পরদুঃখকাতর,—স্নেহ পরবশ। তোমার ভ্রান্তি ঘুচাইয়া, তাঁহারা তোমাকে আপন করিয়া লইবেন। এবং এইবার হইতে তোমার জড় জগতে আসা যাওয়া যাহাতে না লাগে, তাহাই করিবেন।

তবে যাও,—আর বিলম্ব করিও না। মায়ার মোহিনীমন্ত্রে আর মুগ্ধ হইও না। যত শীঘ্র পার, গৌরভক্তের চরণে শরণ লও।

সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার ভাব আনিও না। সরল মনে, সরল প্রাণে গৌরানুগত হইয়া কেবল তাঁ'রে ডাক।

গৌরদাসের চরণাশ্রিত হইতে পারিলে,—তোমার অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের প্রেমজ্যোৎস্না আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। হৃদয় আলোকিত হইবে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, পাপ প্রবৃত্তি সমূহ অবশ্যই সরিয়া দাঁড়াইবে। তবেই তুমি মনোরাজ্যে স্বাধীন রাজা হইয়া বসিতে পারিবে।

এখন তুমি পরাধীন। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ তোমাকে ক্রীত দাসের ন্যায় সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিয়াছে। জীবদেহের বিনাশ ভাবনায় বাধা দিয়া ক্ষণস্থায়ী ঐহিকানন্দের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

ভাই! যদি মরণের কথা স্মরণ রাখিতে পার, তবে তোমার অনেক মঙ্গল হইতে পারে। মোহমদিরার নেশা ছুটিয়া যাইতে পারে। অনিত্য পুত্রকলত্রের মমতা অন্তর্হিত হইতে পারে।

জগতে এমন কেহ নাই যে সে মরিবে না। তবে আর অভিমানে স্ফীত হইয়া দু'টা দিন ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

ভাই! প্রাণারাম শ্রীহরির নাম কর। জন্ম মরণ বারণ হইয়া যাইবে। নিত্য নবদ্বীপের অত্যুজ্জ্বলালোকে দীপ্তিমান্ হইয়া আপনাকে আপনি ধন্য মনে করিবে। পরিণামের সম্বল হরি নাম বিনে জীবের কি আর পরিত্রাণের পথ আছে? বল ভাই! প্রাণ ভরিয়া বল,—হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য
বাঙ্গলা,—সহিলপুর।

প্রলয় তত্ত্ব।

শ্রদ্ধেয় সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল সেন মহাশয় প্রথম খণ্ডের "আনন্দে" 'চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক উপাসনা' লিখিতে গিয়া প্রথমেই প্রলয় সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় স্বতন্ত্র থাকায়, ঐ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু লেখেন নাই। আমরা সেই প্রতিধ্বনি মূলেই প্রলয় তত্ত্বের অবতারণা করিলাম।

হিন্দু শাস্ত্র মতে প্রলয় চতুর্ব্বিধ। নৈত্যিক, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক। প্রতি দিবসীয় মরণাদি ধ্বংশ ব্যাপারকে নৈত্যিক প্রলয় বলে। ব্রহ্ম রাত্রি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয় হয় তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম উপাদান সকল স্বয়ং হিরণ্য গর্ভ (ব্রহ্মা) কে সহ মূল প্রকৃতিতে লীন হওয়াকেই প্রাকৃতিক প্রলয় বলে। ঐ প্রকৃতির ব্রহ্মাশ্রয়কেই আত্যন্তিক প্রলয় বলে। আত্যন্তিক প্রলয়ই মহা প্রলয়।

অধুনা জড় বিজ্ঞানের দিনে ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় তত্ত্বের বড় বেশী আলোচনা নাই। অন্যের সম্বন্ধে অনুযোগের কারণ না থাকিলেও, হিন্দু সন্তানের পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা নহে কি? তাহারা কেন ঘরের খবর না লইয়া পরের কথায় আস্থা স্থাপন করেন? অন্যে পরে কা কথা, বঙ্গের সুসন্তান কৃতীকবি 'হেম চন্দ্র'ই একদিন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের কথায় বিচলিত হইয়া "ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল" * এই হতাশার সুরে সুদীর্ঘ একটী কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এখন একটা ভাব হইয়াছে বিলাতী বিদ্যা যিনি অর্জ্জন করিবেন তিনি বিলাতের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিবেন। একবার এদিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না। ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ত্রুটি। তাহারা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের সন্তান, একথাটী তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। তবেই তত্ত্ব কথায় আপনাদিগকে দরিদ্র মনে করার কিছুই কারণ থাকে না। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের খবর তাহারা ঘরে বসিয়াই পাইতে পারেন।

আমরা অনেক সময় শুনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় পৃথিবী যায় যায় বলিয়া এক একটা ধ্বনি উঠে। বিগত ধূমকেতু উদয়ের পরক্ষণেও দিকে দিকে প্রলয় বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি কোন কোন ইয়ুরোপীয় নরনারী কৃতনিশ্চয় হইয়া, আপন অর্জ্জিত

* কবিতাবলী দ্রষ্টব্য।

সম্পত্তি তাবৎ ভোগ বিলাস চরিতার্থের জন্য নিয়োজিত করে। যখন পৃথিবীই থাকিবেনা তখন বিত্ত বিভবের আর মায়া কি? উহাত আর কাহারই উপভোগে আসিবে না। অতএব খাও শ্যাম্পিন, খাও খানা, লুটাও দুনিয়াকা মজা। বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টিপরায়ণ মানুষের ঐরূপ প্রবৃত্তি হইতেই পারে। দুঃখের বিষয় উহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমাদেরও এখন প্রবৃত্তি স্রোত উল্টিয়া যাইতেছে! তাই দেখিয়াছি, ঐ সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় লোকদিগেরও অন্তর কাঁপনী উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথা কহিয়াছিল, এমন কি পেটুক শ্রেণীর লোকে, ভূরি ভোজনের উদ্যোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম নিকট মনে করিয়াও, কাহারও মুখে একবার হরিনাম স্ফুরিত হইল না! অন্ধতা আর কাহাকে বলে?

যাই হউক, আমরা আজ একটু ঘরের খবর সকলকেই দিয়া রাখিতেছি! যাঁহারা স্বধর্ম্মে আস্থাবান, শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন, তাঁহারা এই প্রবন্ধটী পড়িয়া রাখিলে আর কখনও পরের কথায় পৃথিবীর অস্তিত্ব নাশের ভয় মনে পোষণ করিবেন না।

পুরাণে 'ব্রহ্মদিন', আর 'ব্রহ্মরাত্রির' উল্লেখ আছে। উহা ব্রহ্মারদিন, আর ব্রহ্মার রাত্রি,। এই একটী দিনের পরিমাণ চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর। রাত্রির পরিমাণও তাই। ঐ একদিন, এক রাত্রিই কিন্তু ব্রহ্মার আয়ুস্কাল। তাহা হইলেও পশ্চাতে বুঝা যাইবে ব্রহ্মা স্বল্পায়ুনা। ঐ ব্রহ্মদিনে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ঐ সময় নৈত্যিক প্রলয় (মৃত্যু) ছাড়া আর কোন প্রলয়ের সম্ভাবনা থাকে না। নৈত্যিক প্রলয় সৃষ্টির সহায়। এক তৃণ না মরিলে, অন্যতৃণ দাঁড়াইতে পারে না। যখন ব্রহ্মরাত্রি আসিয়া দেখা দিবে, তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুপ্তি ক্রোড়ে আশ্রয় লইবেন। যেরূপ পরিশ্রম, সেইরূপই বিশ্রাম। চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসরই ব্রহ্মার নিদ্রাতে যাইবে। ঐ সময় পৃথিবী নৈমিত্তিক প্রলয়ে বিধ্বস্ত হইতে থাকিবে। স্থূলভূত সূক্ষ্ম ভূতে পরিণত হইবে। ব্রহ্ম রাত্রি অবসানে ব্রহ্মা জাগিলেও নৈমিত্তিক প্রলয়াবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র সহ মূল প্রকৃতিতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হইবেন। তখন প্রাকৃতিক প্রলয় সিদ্ধ হইবে। সেই সর্ব্বগর্ভা প্রকৃতি ও যখন জগদেক কারণ, অব্যক্ত, নিত্য, সদসদাত্মক বস্তুতে আত্ম নিমজ্জন করিবেন, তখনই আত্যন্তিক

বা মহাপ্রলয় সাধিত হইবে। তৎকালে ঐ অচিন্ত্য বস্তুই থাকিবেন, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নাম গন্ধও থাকিবে না।

সেই ব্রহ্মদিনের এখনও অর্দ্ধেক শেষ হয় নাই। কারণ একটি ব্রহ্মদিনে চতুর্দ্দশটি মনু রাজত্ব করেন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই ছয়টি মনুর রাজত্ব শেষ হইয়া এখন বৈবস্বত মনুর রাজত্ব চলিতেছে। দিব্য চারি হাজার আট শত, তিন হাজার ছয়শত, দুই হাজার চারিশত, এক হাজার দুই শত বৎসরে, অর্থাৎ সাধারণ সতর লক্ষ আটাইশ হাজার, বারলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার, আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার, ও চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসরে, সত্য-ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার এই চতুর্যুগ এক এক মনুর আমলে একাত্তরবার প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ একাত্তর বার প্রত্যাবর্ত্তনে এক মন্বন্তর অর্থাৎ এক মনুর রাজত্ব শেষ ও পরবর্ত্তী মনুর রাজত্ব আরম্ভ। বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর সময়ে মাত্র সপ্তবিংশ চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের শেষ যুগ, কলি সর্ব্বে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। এই কলিশেষ হইলে উনত্রিংশ চতুর্যুগ আরম্ভ হইবে। তবেই দেখা যায়, এখনও অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলি সংশ্লিষ্ট বৎসর গুলি, আর তেতাল্লিশটি চতুর্যুগ যাইবে, তবে বৈবস্বত মন্বন্তর ফুরাইয়া সাবর্ণি নামক অষ্টম মন্বন্তর আরব্ধ হইবে। তারপর নবম, তারপর দশম, এইরূপ করিয়া চতুর্দ্দশটি মন্বন্তর সেদিন গা ঢাকা দিবে, সেই দিন জগৎব্যাপারের পরিসমাপ্তি, ব্রহ্মরাত্রির উদয় ও ক্রমে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতি, আত্যন্তিক প্রলয় সংঘটিত হইবে। ভক্তপাঠক! সে অনেক দূরের কথা। আসুন আমরা নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন ইষ্ট চিন্তা করিতে থাকি।

জীব! তুমি কি চাও?

—:০:—

বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীভগবান, করুণা নয়নে জীবেরদিকে চাহিয়া বলিতেছেন "জীব! তুমি কি চাও? তোমরা সংসারে যাহা কিছু উপভোগ কর, তাহার মূলে সুখ ও দুঃখ বিরাজমান। আমি আজ সেই সুখ দুঃখ তোমাদিগকে বিতরণ করিব, তোমরা কে কি লইবে বল"।

জীব সুখের কাঙ্গাল, আজীবন কেবল সুখের সন্ধানেই সে ব্যাপৃত। অনেক সুখভ্রান্ত জীব, পরম দুঃখকেই হয়ত চরম সুখ মনে করিয়া, ক্ষণিক আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে! কিন্তু প্রকৃত সুখ কেহই পাইতেছে না! সুখের অনুসন্ধানে, না চাহিতেই, দুঃখ আপনিই আসিয়া সমুপস্থিত হয়!

শ্রীভগবান আজ মুক্তহস্ত, যে যাহা চাহিবে সে তাহাই পাইবে। এখন কি চাই? সুখ না দুঃখ?

কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষীদিগের পদাঙ্ক অনুসরণই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। একটা চলিত কথায় বলে "যে যাহা চায়, সে বহু দূর" যে ধন চায়, ধন সহজে তাহার হস্তগত হয় না। ফল কথা—প্রকৃত যে ধন চায় না, ধন তার পাছে পাছে ফিরে। বিষয় বিরক্ত, সংসার বিরাগী, প্রাতঃস্মরণীয় "লালাবাবু" তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীধাম বৃন্দাবনে "লালাবাবুর" স্থাপিত, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব সেবা পারিপাট্য, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন! যে মান চায় না, দীনাতি দীন, সকলের পদতল দিয়া যাহার গমনাগমনের পথ, হীনকর্ম্মী চণ্ডালকেও যিনি উচ্চ সম্মানে আপ্যায়িত করেন, যিনি প্রকৃতই মানের কাঙ্গাল নহেন, মান অজ্ঞাতসারে তাঁহার মর্য্যাদা জগতে রক্ষা করেন। ইহ সংসারেই যে কেবল এরূপ বিধান ব্যবস্থিত, এরূপ নহে, শ্রীভগবান সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, কৃষ্ণগত প্রাণ, কি করিলে শ্রীকৃষ্ণ চরণে স্থান পাইবে, অহরহ সেই চিন্তা। তজ্জন্য ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেও হইয়াছিল। আর যে শ্রীকৃষ্ণ চরণ চায় না, যে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও করে না, এমন কি, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম করে, সে পর্য্যন্ত তাহার পরম শত্রু, এমন যে হিরণ্যকশিপু, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের বাসনানুরূপ কৃপা করিবার পূর্ব্বেই, অভক্ত পরম শত্রু হিরণ্যকশিপুকে পূর্ণ কৃপা করিলেন। ফল কথা, "যাহাকে চাও সে বহু দূর।" অনুসন্ধান করিলে এরূপ ক্ষেত্র অনেক দৃষ্ট হইবে।

সাধু মহাপুরুষগণ, কখনও সুখ চায়েন নাই। কুন্তিদেবী বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ! বাপ! আমাকে সর্ব্বদাই দুঃখে রাখিও। দুঃখে পড়িয়া যখন তোমাকে ডাকি, তখন তোমাকে পাইলে, আমার যে আনন্দ হয়, সুখের সময় পাইলে, তাহার শতাংশের একাংশও পাইনা।" ভক্ত "তুলসীদাস"ও বলিয়া গিয়াছেনঃ—

সুখ্ মে বাজ্ পড়ুক্ দুঃখ্ মে বলিহারী যাই,
য্যাহা দুঃখ্ আওয়ে যো; ঘড়ি ঘড়ি হরি নাম শুনাই।

ভক্ত মনীষীগণের চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সুখের পরিবর্ত্তে তাঁহারা দুঃখকেই বেশী আদর সম্মান দিয়াছেন। ফলও তদনুরূপ পাইয়াছেন। দুঃখ আদর সম্মান পাইয়া সরিয়া থাকিলেন, আর আনন্দ স্বরূপ সুখ, নিত্য সহচররূপে বিরাজ করিলেন।

সুখের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়া অতি সহজেই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি, গৌরহে! আমাকে দুঃখ দাও, আমি দুখের বোঝা বহিয়া, দুঃখের কান্না কাঁদিয়া, সুখ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তোমার চাঁদ মুখ খানি যেন দেখিতে পাই।

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।
রংপুর (মাহিগঞ্জ)

অস্ত গমন গাথা।

বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠ উঠ মা, আমার।
এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমিত থাক না আর॥
আমি না উঠিতে উঠি, দ্বারে কর করা ঘাত।
নিকটে দাঁড়ালে কর, যোড় হাতে প্রণিপাত॥
এমন সোণার বউ সংসারে ক'জনে পায়?
বড়াই করিয়া মাগো, শচী তা বলিতে পায়॥
দেখিনা, সরমে কেহ, হ'তে এত ম্রিয়মান।
দেখি না এমন বুদ্ধি এমন নির্ম্মল জ্ঞান॥
যেইরূপে সেইগুণে আননে কথাটী নাই।
দশটী বধুর কাজ করিছ তুমি একাই॥
দুপর গড়া'য়ে যায়, ও দিকে দু'পর রাতি।
নাই শীত, নাই গ্রীষ্ম, নাই আলাপের সাথী॥
রাঁধিয়া, বাড়িয়া থাক, নিমাইর অপেক্ষা করি।
সেতো থাকে সর্ব্বদায়, 'শ্রীবাসের' বাড়ী পড়ি॥
ডাকিয়া আনিতে তারে আমার শকতি নাই।
গৃহে নাই অন্য কেহ, ডাকিতে কারে পাঠাই॥

কাজেই নিমাই আসে, আপন ইচ্ছাতে তার।
তাহাতে না কর তুমি একটু বদন ভার॥
খাওয়াতে, লওয়াতে তারে, একটু কর না ভুল।
বধূ কুলে তুমি মাগো, মধু ভরা পদ্ম ফুল॥
আজি কেন উঠ না মা, হ'ল কি কিছু অসুখ?
উঠিয়া নিমাই কেন প্রভাতে ধুইল না মুখ!!
একি মা, এখনো তুমি কি লাগি দিছনা সাড়া?
কাঁপিছে পরাণ মম, থাকিতে পারিনা খাঁড়া॥
নিমাই এ'সেছে জে'নে, মুদেছিনু দু'নয়ন।
ভোরে দেখিয়াছি মাগো, ভারি এক দুঃস্বপন॥
আমার অঞ্চল হ'তে, কি যেন খসিয়ে প'ল।
আকাশে থাকিতে চাঁদ, নদীয়া আঁধার হ'ল॥
স্বহস্ত রোপিত মোর সাধের লবঙ্গ লতা।
হইল ভূতল লগ্ন, মরমে হ'য়ে আহতা॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগো, এই মাত্র জে'গেছি।
উঠ লক্ষ্মী, উঠ সোনা, আর ঘুমাইও না, ছিঃ॥
একি মা, দেখি যে আমি দ্বারেও নাহি অর্গল।
তুমিত কখন বাছা, দেখাও না এত বল॥
আঁধারে আড়ষ্ট হ'য়ে, ভ'য়ে ফেল পা।
এমন একেলা ঘরে, কোন দিনও শোও না॥
বাতাস বহিলে জোরে, হ'য়ে থাক মৌন মুখী।
চমকিয়া উঠ, দে'খে বিদ্যুতের চকমকি॥
রে ভীরু বালিকা তোর আজি একি দুঃসাহস।
কখনো না দেখি তোরে এমন নিদ্রার বশ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠেছ কি তবে মা!
সরমে বাহির বুঝি এখনো হ'তেছে না॥
হারে ও লাজুক মে'য়ে, কিছু তোর লজ্জা নাই।
জন্মে জন্মে আমি যেন তোর মত বধূ পাই॥
সকালে উঠিয়া বুঝি দ্বারে ঘা' দিয়া ছিলে।
না পে'য়ে আমার সাড়া, আরবার গৃহে গেলে॥

তাতেই হ'য়েছে মাগো, অকাল নিদ্রা তোমার।
দৈবাৎ এমন ত্রুটি ধরে কেবা বালিকার॥
হারে ও অবোধ মে'য়ে, তোরে কিছু ক'হিব না।
বাহির হইয়া আয়, ঐ দিকে চাহিব না॥
একি!
তবে কি সে বিষ্ণুপ্রিয়া, মা আমার গৃহে নাই?
দেখি অগ্রসর হ'য়ে, ওমা আমি কোথা যাই!!
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভূমে কেন আছ পড়ি।
রত্ন জ্ঞানে আমি যে মা, সদা তোরে যত্ন করি॥
বল বল ত্বরা বল, কি এমন পে'লে তাপ।
ধূলায় গড়ায় কিমা, সোহাগের স্বর্ণ চাপ?
ওগো, কে আছ গো, এ'সে দেখগো মায়ের মোরা।
এত নয় নিদ্রা, ওগো, এযে অচৈতন্য ঘোর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, যাটু যাটু চাহিয়াছে।
ঐযে আমার লক্ষ্মী, স্বর্ণ অক্ষি মেলিয়াছে॥
আয় মা, ঝাড়িয়া দেই, অঞ্চলে অঙ্গের ধূলা।
আয় মা, বাঁধিয়া দেই, আলু থালু কেশ গুলা॥
আয় মা, ধু'য়ায়ে দেই, তোর চন্দ্র মুখ খানি।
আয় মা, লইয়া কোলে জুড়াই মনের গ্লানি॥
কেন মা, উদাস দৃষ্টি পলাশ নয়নে তোর।
ক'য়েছে কি কটু কথা, চঞ্চল নিমাই মোর?
আচ্ছা, সে আসুক ঘরে, ওমা ওমা, একি একি!
আসিবেনা বাছা মোর, ইঙ্গিতে কহিলে নাকি?
আবার ঢালিছ মাগো, অঝুরে নয়ন জল!
বল বল শীঘ্র বল, ঘ'টেছে কি অমঙ্গল"!!
মূর্চ্ছিতা হইলা মাতা, হৃদপিণ্ড গেল খসি!
শু'নে আহতার মুখে, "অস্ত সে নিমাই শশী"!!

চৈতন্য চন্দ্রালোক।

শুভ আবির্ভাব।

জগতের পুণ্যার্জ্জিত অপূর্ব্ব বৈষ্ণব গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে", মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ণনা পাঠ করিয়া, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে। সেই প্রেম পীযুষ-পূর্ণ অবতরণ কাহিনী, অনন্তকাল ভক্ত দিগের পুলকাশ্রু সঞ্চার করিবে।

প্রথমতঃ সংসার বিষ্ণু মায়ায় আচ্ছন্ন দেখিয়া, প্রেম ও করুণার প্রকট মূর্ত্তি, বৈষ্ণবাচার্য্য গণ পরস্পর বলা বলি করিতেছেন ঃ—

কে মতে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

বহির্মুখ জীবের অধোগতির প্রতি সম্যক কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া, তাঁহারা মর্ম্মভেদী স্বরে কহিতেছেন, "আহা। এই জীব সকলের উদ্ধারের আর উপায় দেখিনা! ইহারা সর্ব্বদা বিষয় সুখে উন্মত্ত আছে। এমন কি কহিলেও কেহ, কৃষ্ণ নাম লইতে চায় না! নিরন্তর শাস্ত্রাদির কূট ব্যাখ্যা চলিতেছে! তাহাতে বিন্দুমাত্র ও ভক্তির সংশ্রব নাই! অহো, সংসার কি মহাপাপেই ডুবিতে বসিয়াছে"!

সেই পূত চরিত্র মহাত্মাগণ, যেমন হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন, সেইরূপ নির্ম্মল ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, প্রতি দিন গঙ্গাবহগাহন ও কৃষ্ণ আরাধনা পূর্ব্বক "শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ" বলিয়া জীবের জন্য কল্যাণ মাগিতে ছিলেন। অন্যদিকে, আর একজন মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় মহাযোগে নিমগ্ন থাকিয়া, ঘন ঘন হুঙ্কারে জগতের এই বিপদ বার্ত্তা বৈকুণ্ঠ দ্বারে পৌঁছাইতে ছিলেন। তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার মহাপুরুষ অদ্বৈতা চার্য্য, যথাঃ—

সেই নবদ্বীপে বৈসে, বৈষ্ণবাগ্র গণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব লোকে ধন্য॥
জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের গুরু মুখ্য তর।
কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্ব্বদা বাখানে "কৃষ্ণ পদ ভক্তিসার॥
তুলসী মঞ্জরী, সহিত গঙ্গা জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদী বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥

বস্তুতঃ বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈত প্রভুর প্রার্থনাই, সর্ব্বাগ্রে সেই বৈকুণ্ঠ বিহারীর কুণ্ডল রাজিত কর্ণে, ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, যথাঃ—

প্রেমের হুঙ্কার শুনি কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তি বশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥

এ সাক্ষাৎ গৌরহরি রূপে সাক্ষাৎ নয়। সমাধি অবস্থায় যে ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার ঘটে, এ সেই সাক্ষাৎ। এই কৃতার্থতা বশেই একদিন ভক্তের অভিমান ভাষায় ফুটিয়া, জগৎকে একটী অভূতপূর্ব্ব সান্ত্বনা দান করিয়াছিল, যথাঃ—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হে মাঞি॥
আনিব বৈকুণ্ঠ নাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সব জীব উদ্ধারিয়া॥

অন্যত্র ঃ—

শুন শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
সভে উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণ ভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যবে নাহি পারো, তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস॥

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ দিগের কিছুই অসাধ্য নাই। তাঁহারা ভগবৎ প্রেমে প্রসাদিত হইয়া, এই পৃথিবীতে 'সোহং'তত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবাসাদি ভক্ত সজ্জন দিগের নিগ্রহাশঙ্কায়, অদ্বিতীয় ভক্তবীর অদ্বৈতাচার্য্যে ঐশী শক্তির সঞ্চার অসম্ভব নহে, সেই ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যে যুগান্তকারী প্রলয় নির্ঘোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাও অসম্ভব বা অতি রঞ্জিত কথা নহে। তবে ভগবানের কার্য্য ভগবানই করিয়া থাকেন। অদ্বৈতে ভগদ্বিভূতির সামান্য বিকাশ সম্ভব হইলেও, তদ্দ্বারা ভগবদিচ্ছার পূর্ণতা সাধন হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের দিন ক্রমশই নিকট হইতে লাগিল। সুন্দর ক্ষেত্র ও জুটিল, যথা :—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো ধর্ম্মেতে তৎপর॥
উদার চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহাদিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব, জগন্নাথ মিশ্র চন্দ॥
তাঁর পত্নী শচীনাম মহা পতি ব্রতা।
মূর্ত্তি মতী বিষ্ণু ভক্তি, সেই জগন্মাতা॥
বহু পুত্র কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহা ভাগ॥
বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্মহৈতে বিশ্বরূপের হইল বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
*   *   *   *   *
তবে মহাপ্রভু গৌর চন্দ্র ভগবান।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠাণ॥

উপযুক্ত সময় উপযুক্ত ক্ষেত্রেই তিনি আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাগবত কার বর্ণিত, শচী জগন্নাথের ন্যায় পবিত্র দেহ অবলম্বন, সর্ব্বাংশেই তাঁহার যোগ্য হইয়াছিল। আজ জগতের সেই শুভ মুহূর্ত্তের সঞ্চার হইল; অহো, তাহা কি সুন্দর! কি মধুর!! কি বিচিত্র!!! যথা;

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥
অমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত সুমঙ্গল।

সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল ॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গা স্নানে যায়।
হরি বোল হরি বোল" বৈলে সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবত গণ।
সভে বলে, "নিরন্তর হউক গ্রহণ"
সভে বলে "আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি; কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ" ॥
গঙ্গা স্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সভে হরিধ্বনি করে দেখিয়া গ্রহণ ॥
"হরি বোল হরি বোল" এই সভে শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
চতুর্দ্দিগে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন ॥

হরি হরি হরি! জীব যখন ব্যর্থ জীবনের বোঝা বহিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধ পানে, সজল নয়নে তাকায়, তখন এইরূপেই তাঁহার করুনার উৎস প্রবাহিত হয়। এই ভাবেই তিনি আবির্ভূত হইয়া জগজ্জীবের যন্ত্রণার লাঘব করেন। পাপী, তাপী, পাষণ্ড, পতিতকে কৃতার্থ করিয়া সেই প্রিয় ধামে চলিয়া যান। জীবরে! এখন ভাবিয়া দেখ, আমরা কত ভাগ্যবান

আর ভগবান আমাদের কত নিকটের বস্তু! অহো! এতকাল পরেও সেই পুণ্য কাহিনী পাঠে এই আধি ব্যাধি পীড়িত, জন্ম জরা ভীত প্রাণে, একটী সুস্নিগ্ধ সুমধুর ভাবের সঞ্চার হয়! জগজ্জীবের পক্ষ হইতে বিপুল কৃতজ্ঞতার ভার অন্তরে উপস্থিত হইয়া, অবিরল অশ্রু পতন হইতে থাকে!!

পূর্ণিমা তো পক্ষে পক্ষেই আসে, পক্ষে পক্ষেই পূর্ণ শশীর শুভ্র রশ্মি পাতে ধরাতল উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু গৌর পূর্ণিমার মত পূর্ণিমা সচরাচর জীব লোকের ভাগ্যে দর্শন ঘটেনা। পৃথিবীতে সে এক পুন্য পরিদীপ্ত অমৃত ক্ষণের শুভ স্ত্রপাত হইয়াছিল, যে ক্ষণকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ভগবান এই মর্ত্ত্য লোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অহো! সে ক্ষণ কি সর্ব্বক্ষণ সম্ভব হইতে পারে?

এই আর্য্য ভূমে আরও কত কত বার তাঁর আগমন হইয়াছে, কিন্তু পুণ্য তীর্থ 'নদীয়ার' প্রেম বিকারের মত প্রেম বিকার আর তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি যেন জীবের মর্ম্ম গ্রন্থিটী চাপিয়া ধরিয়া গৌর হরি বেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই আজ চারিশত বৎসর পরেও তাঁহার মধুময়ী স্মৃতি, মর্ম্ম স্থান আলোড়িত করিয়া প্রতি নেত্রে আনন্দাশ্রু সঞ্চার করে! ভক্ত, অভক্ত, জ্ঞানী, মূর্খ সকলের প্রানেই সমান সুখ বিতরণ করে! অহো! গৌর হরি নামের কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ শক্তি!!

ভাগবত কার ঠাকুর মহোদয় তো সেই লীলা বৈচিত্রের স্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া. লবনের পুতুল জলে পড়িলে যে দশা হয়, সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন! অর্থাৎ সেই 'ভাগবতে'ই মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছেন! আদি খণ্ডে মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ণনায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়!

আহা, প্রাকৃত ভাষার কি সৌভাগ্য! আজ যে সে সভ্য জগতের সমক্ষে সগর্ব্বে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সে কেবল ঠাকুর মহোদয়ের অনুগ্রহ ফলে। তিনি তদ্বারা গৌর মহিমার মনোরম চিত্র অঙ্কিত না করিলে, প্রাকৃত ভাষা আজ ভগবদনুধ্যানে নিয়োজিত হইতে পারিত না। দিন দিন জড়তা গ্রাসে পতিত হইয়া, ভাষা ও মানব উভয়েই পৃথিবীর ঘোর অনর্থের হেতু হইত। যাই হউক, খুব সময় বুঝিয়া গোলক ধন শ্রীহরি গৌর শশীরূপে জীবের দ্বারে সমুদিত হইয়াছিলেন, খুব অনুধাবন করিয়া ব্যাসাবতার বৃন্দাবন সেই লীলা মাধুরী প্রাকৃত ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন! তা ন'হইলে, এই অজ্ঞান জীবদিগের আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না! (ক্রমশঃ)

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আনন্দ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

———:*:———

নদীয়া নগরে নাগর গোরা।
বরজ বিলাস রস-বিভোরা॥
ভাবের তরঙ্গে সদাই ভাসে।
অথির পরাণে কাঁদে ও হাসে॥
কখন ধূলায় পড়িয়া লুঠে।
কাঁপিয়া লাফিয়া আবার উঠে॥
গদাধর পানে সঘনে চায়।
তাঁরে, যেন কা'রে, দেখিতে পায়॥
অভিনয় করে বরজ-লীলা।
দরশে দরবে বজ্‌র শিলা॥
নয়নে গলয়ে শাউন ধারা।
বয়ানে বলয়ে শুধুই 'রারা'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, খনেক হাসে।
মনুজ-মানস—কলুষ নাশে॥
লটন রঙ্গিয়া কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিভোর সতত ভকত সঙ্গে॥

নিখিল ভুবন-মোহন-রূপ।
উজ্জ্বল মধুর রসের কূপ॥
অরুণ-বরণ চরণ-পাণি।
বিদ্যুৎ-বিজয়ী শ্রীতনু খানি॥
বদন কমল দশন কুন্দ।
অধর বাধুলী কিবা সুনন্দ॥
গলায় লম্বিত কুসুম-হার।
ত্রিলোকে মিলেনা তুলনা তার॥
মণির মঞ্জীর-চরণে রাজে।
নর্ত্তনে মধুর মধুর বাজে॥
পুরুষ যোষিত পরাণ চোরা।
নদীয়া নগরে রসের গোরা॥
এ হেন গৌরাঙ্গ মিলিবে কবে?
"বিজয়" কত বা বিরহ স'বে!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের সার কথা।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিতে হইলে, পাঠককে সর্ব্বোপরি একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বা অপ্রকট লীলাই গ্রন্থের মূল অবলম্বনীয়। নিত্যলীলা অর্থে অপ্রকট লীলা, প্রকট লীলা তাহারই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর জলস্রোতের ন্যায, ঐ লীলার স্রোত অনন্তকাল প্রবাহিত, কখনও ইহার বিরাম হয না। লীলাময় ভগবানের নরলীলার সময়ে, তাহা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় কেবল লোক-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ হয় মাত্র; ভক্ত-চক্ষুর নিকট কিন্তু উহা চিরদিনই অক্ষুণ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা নহে, অদ্যাবধিও অবিশ্রাম ঐ লীলা চলিতেছে। তাই মহাজনেরা বলেন :—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধানতঃ দুইটী প্রধান উপায় সাধনরাজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। একটী জ্ঞান, অপরটী ভক্তি। এই জ্ঞান-ভক্তির মধ্যে একটা

ভিত্তিশূন্য বিবাদ আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত করিয়াছেন। অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান ও শ্রদ্ধাভক্তি একই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ জ্ঞানকেই, মুক্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিকে উন্মত্তের বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত উন্মাদচেষ্টা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আবার অন্যপক্ষে কেহ কেহ ভক্তিকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, জ্ঞানকে তার্কিকের অসার তর্কচাতুর্য্য ও নাস্তিকের উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানী ও ভক্ত পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া, অনেক স্থলে ধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। উভয়েই মহাভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন। যথার্থ বুঝিতে গেলে, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ না হইলে খাদ-ময়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি বিমুক্ত হইয়া ভক্তি কনক-পবিত্রতায় ও মধুরতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে না, এবং ভক্তির সুশীতল অমৃতরসে সিক্ত না হইলে, জ্ঞানও নাস্তিকতার ও কঠোরতার নির্ম্মম দহনে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলকথা স্থূলদৃষ্টিতে জ্ঞান ও ভক্তি বিভিন্ন বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেও চরমাবস্থায় অভেদাকার ধারণ করে, এবং সাধককে একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। তন্নিমিত্ত ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সকলেরই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-জগতে অদ্বৈতবাদ একটী প্রধান মত। "জগদাদি সৃষ্টবস্তু মিথ্যা ও মায়া সম্ভূত, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ বস্তু। মায়া ঘুচিয়া গেলে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না, জীব শিব সকলই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মময় হইয়া যায়।" শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এই মত প্রকাশ করেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, উপাস্য উপাসক বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে, পাপপুণ্যের দায়িত্ব বোধে এবং প্রেমভক্তির চরিতার্থতায় সকলে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে মানব-জীবন কেবল কষ্টভোগের কারণ, ধর্ম্মসাধন একটী নীরস ব্যাপার হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই মতের বিরুদ্ধে তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া রামানুজ প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈত মত কিছু সংস্কৃত আকারে সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার মতে, "ব্রহ্ম একমাত্র সৎবস্তু হইলেও সৃষ্ট্যাদির বিচিত্রতা তাঁহারই ইচ্ছায় সম্ভূত হইয়াছে এবং সৃষ্টির সকল পদার্থের সহিত তিনি অন্তর্যামীরূপে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন।" সুতরাং জীবের দায়িত্ব ও উপাসনার আবশ্যকতা এ মতে অবশ্যম্ভাবী।

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, জ্ঞানমার্গীগণই অদ্বৈতবাদী, এবং ভক্তেরা

ঘোর দ্বৈতবাদী। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ভক্তিপন্থীও অদ্বৈতবাদী। অবশ্যই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অদ্বৈতানুভূতিই সাধনার চরম অবস্থা। উচ্চ সাধকেরাও বলেন যে "অদ্বৈত জ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান।" ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, দ্বৈতবাদ হইতে ভক্তির উদ্ভব হইলেও ভক্তই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। প্রেমে সেই অনন্ত-প্রেমময়ী-সত্ত্বার সহিত এক হইয়া যাওয়াই. ভক্তিবাদীর প্রধান ও শেষ লক্ষ্য। উপনিষদে উক্ত "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য, ভক্তের দ্বারাই উপপাদিত হইয়া থাকে; এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" একমাত্র ভক্তেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতিসিদ্ধ।

উত্তম-ভক্ত বলেন যে "এই সমস্ত জীব-জগৎ তিনিই হইয়াছেন।" ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অনন্তভুবনের প্রত্যেক বস্তুতেই, ভক্ত প্রেমময় পুরুষের অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্ব্বত্রই তিনি প্রাণের প্রিয় বস্তুকে দর্শন করেন। জগতে যা কিছু তাঁর নয়ন সমক্ষে দেদীপ্যমান দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি সেই বিরাট পুরুষের সাকার প্রতিমা বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, যাঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল বস্তুতে, সকল অবস্থায় ভক্ত সেই অদ্বিতীয় সত্ত্বাই উপলব্ধি করেন। মেঘের ডাকে তিনি সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহের মঙ্গল আহ্বান শুনিতে পান, বিদ্যুতের আলোকে ভগবৎ শক্তির তরল হাস্য দর্শন করেন, মলয়ানিলে মধুর গাত্রস্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। সুধাকরে তাঁহারই কারুণ্য-স্নিগ্ধতা, এবং দিবাকরের প্রখর কিরণে তাঁহারই শাসন-তীব্রতা, পুষ্পের মাধুরীতে তাঁহারই সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রত্যক্ষ করেন। নদী-তরঙ্গে তাঁর ভ্রু ভঙ্গিমা, নলিনীদলে তাঁর কোমলতা, জননীর অকৃত্রিম স্নেহে, বন্ধুর প্রগাঢ় প্রণয়ে, পত্নীর মধুর প্রেমে, সেই প্রেমস্বরূপেরই প্রেম অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। এইরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে সেই অক্ষয় পুরুষের অভিব্যক্তি বা সজীব বিকাশ অথবা বিশ্বরূপ বুঝিয়া, ভক্ত প্রেম-পরিপ্লুত হইয়া, উহারই সত্তায় আত্মোৎসর্গ করেন; এবং স্বকীয় অদ্বৈতবাদকে, সরস ও পূর্ণ করিয়া লয়েন। এই অদ্বৈতবাদ পরিণতি লাভ করিলে, শেষে—তন্ময়ও লাভ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি ঘটে, সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের বিকাশ দেখা যায়। তখন

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সমস্ত জীব-জগৎ তিনিই হইয়াছেন। এমন কি, নিজেকেও 'তিনি' মাত্র বোধ হয়, সর্ব্বত্র তন্ময় স্ফুরণ হয়, যেমন ব্রজগোপীদের হইয়াছিল।

গোপীগণ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, কেবল মাত্র তাঁহাদের প্রেমাস্পদের সুখে সুখী থাকিতেন; বিরহাদি কালে তাঁহারই চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময় সময় আপনার নিজত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইতেন, এবং সময় সময় নিজেকে নিজ-প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে, প্রেমের প্রাবল্যে, সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়া, অদ্বৈত-ভাবে উপনীত হয়েন; অর্থাৎ নিজ অস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করেন।

বেদ বলিতেছেন "তত্ত্বমসি", তুমিই সেই। এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য শুদ্ধ ভক্তেরা উপলব্ধি করেন, অর্থাৎ তখন 'আমি তিনি' 'তিনি আমি' হইয়া যায়। উপনিষদুক্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ইহাই তো অদ্বৈতবাদ। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে উঠিতে হইলে, দ্বৈতবাদই তাহার সোপান। সাধকের প্রথম অবস্থায় দ্বৈতবাদে ভগবান হইতে আপনাকে পৃথক হইতে বলে। দ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম এই যে, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধস্থাপন করা। ভক্তি সাধনের জন্য শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাবের কথা শুনা যায়। ঐ ভাবগুলি ভক্ত-জীবনের ক্রমোন্নতি। প্রথমে শান্তভাব, যখন ভগবান আছেন এবং তাঁহাকে উপাসনা করা উচিত এই বোধে উপাসনা হয়। তাঁহার সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। এইভাবে ভগবান ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক। ক্রমশঃ দাস্যভাবের বিকাশ হয়; মনে হয় তিনি রাজরাজেশ্বর, আর আমি তাঁর দাস, তাঁর প্রসাদ-ভিখারী। যে ভগবানের দাস, সে ভগবান ব্যতীত আর সংসারের অপর কোন বস্তুর দাসত্ব স্বীকার করে না, সুতরাং এই দাসত্ব বন্ধনের কারণ নহে, ইহা মুক্তিরই সোপানমাত্র। তাহাকে পিতা অথবা মাতা বা প্রভু বলিয়া চিন্তা করা এই দাস্যভাবেরই বিকাশ। তারপর সখ্যভাব, এখানে ঘনিষ্ঠতা আরও ঘনীভূত। কারণ তুমি আর তোমার সখা তো এক, কেবল সখার সঙ্গে আনন্দ কর, এক-প্রাণ অভিন্ন-হৃদয় হইয়া থাক। বাৎসল্যভাবে ভগবানকে চিন্তা করা আরও উচ্চ সাধকের অধিকার। মধুরভাব সকল ভাবের সার, ইহাতে সাধকের মনপ্রাণ সব ভগবানে তদ্গত হইয়া যায়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরমানন্দ সম্ভোগে লীন হইয়া যায়, তখন সে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, একেবারে সমাধিস্থ।

এই প্রকারে ভক্ত দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে পৌঁছেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মসাধনের পথ অতি কঠিন বলিয়া নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। মনে হয় আমার মত পাপী ততদূর যাইতে পারিবে কি না! তখন চিন্তা করিতে হইবে যে, তিনি তো আমার দূরে নহেন; তিনি যে আমার অতি নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। শুধু তাহাই নয়, আমিই যে তিনি, এই ভাবিয়া নৈরাশ্য তাড়াইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ।

কৃষ্ণনগর।

পাগল মানুষ।

কে ওই গম্ভীরা-মাঝে, বিজন কুটীরে,
দিবানিশি গৌরগুণ-ভাবেতে তন্ময়?
সংসার বাসনা শূন্য আসক্তি বিহীন,
কে ওই নিষ্কাম ভক্ত মহাপ্রেমময়!
কর্ম্মবন্ধ-নাশ করি' কর্ম্ম-মুক্ত হ'য়ে,
মায়াতীত-ভাবে ভোর কে ওই সুজন?
আন চিন্তা নাই, আন কথা নাহি শুনে,
নাগরীর ভাবে আছে সদাই মগন!
উদার সরল চিত্ত, পবিত্র অন্তর,
শান্ত, দান্ত, হিংসাহীন, কে ও মহাপ্রাণ?
মধুর মূরতিধারী দিব্য কলেবর,
মুক্ত বৈরাগ্যের ছবি প্রোজ্জ্বল মহান।
ঠিকের ঘরেতে তাঁর সদা দেখি হুস,
(তাই) প্রেমের পাগলে বলি পাগল মানুষ।

শ্রীরসিকলাল দে

সোনামুখী, গরিব ভাণ্ডার।

পাগল মানুষের কথা। *

(পতিতের প্রতি অভয়-বাণী)

কে পতিত আছ, এস ভাই! করুণাময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দের "আদান খেয়ার" উজান তরী যাইতেছে। আমাদের দেশে যদি কেহ পাপী থাক, তাহা

---

* "সোনামুখী গরীব ভাণ্ডারে"র কার্য্য করিতে করিতে, আমরা এই পাগল মানুষটীর সন্ধান পাইয়াছি। একসঙ্গ-লাভে ধন্য হইয়াছি! ইনি একজন অদ্বিতীয় গৌর-ভক্ত। রাগমার্গের উচ্চতম সাধক। পতিত জাতির পরম বন্ধু এবং নিরপরাধ নামসংকীর্ত্তনের প্রচারক। সাধারণ বাউলসম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিয়া আমরা প্রথমে ইহাকে উপেক্ষার চ'ক্ষে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু গরীবের দীনহীন সেবকরূপে আমার একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, এই জ্ঞানে আমি প্রায় দেড় বৎসর কাল, পাগলকে পরীক্ষা করিয়াছি। তাঁহার সহিত কত তর্ক করিয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত প্রশ্নই না জিজ্ঞাসা করিয়াছি। পরে তিন মাস কাল, তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া বুঝিয়াছি, এ পাগল মহাপ্রভুর অনুমোদিত, যুক্ত-বৈরাগ্যের একটী আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি!

যাহারা মহাপ্রভুর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত মহান্ত খুঁজিতেছেন, তাঁহারা এই পাগল মানুষের সঙ্গ করুন, অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। পাগলের কথাগুলি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরই অতি উপাদেয় কল্যাণকর ভাষ্য; সুতরাং উহা সৎসিদ্ধান্তের অনুকূল। প্রেমকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্মকে সম্প্রদায়িক মনে করিয়া যাহারা স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে, সত্য-সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের নিকট হয়ত পাগলের কথাগুলি অসম্বন্ধ প্রলাপোক্তি জ্ঞান হইবে। যাহাহউক মহাপ্রভুর বিশ্বোদার ভাব পূর্ণ, উন্নতোজ্জ্বল রস জানিবার পিপাসা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই পাগলটাকে ধরিতে, জানিতে, বুঝিতে চেষ্টা করুন। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ যেমন ক্ষেমঙ্করীর খাস তালুকের প্রজা, আমাদের এই পাগলও তদ্রূপ গোলকের খাস তালুকের লোক, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পাগলের অমৃতময়ী বাণী আলোচনা করিতে করিতেও, আমাদের কথার যথার্থ্য কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হইলে ত্বরায় অগ্রসর হও। "গোলোকের প্রাণধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন" পাইবা প্রকৃত অভিলাষ যাহার হইয়াছে, তাহার আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে ঐ দেখ 'শিয়রে শমন'। পাগলের কথা হাসিয়া উড়াইতে চেষ্টা না করিয়া, উহা মর্ম্ম উপলব্ধি কর। কোন ভয় থাকিবে না, নির্ভয় হইয়া প্রেমের পথে চল প্রাণের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হও ভাই!

সে অভয় বাণী কি? "মহাপ্রভু নিত্য নির্গুণ, পরমেশ্বর, পতিত-পাবন। ধন্য কলিযুগে এ কেমন আশার কথা বল দেখি? পতিত-পাবন তিনি;—পতি হইলেই তিনি ধরা দেন, দেখা দেন, প্রেম দেন!

অনুরাগমার্গে পাত্রাপাত্র বিচার নাই। "অযাচিত বিতরহি দুর্ল্লভ প্রে ফল"। ইহাতে জাতি কুলের অপেক্ষা থাকে না। স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, অন্ধ বধির, দরিদ্র সকলেরই সমান অধিকার। শ্রীভগবান, এই দরিদ্র দ্বারা এই সক পতিত জাতিকে প্রেমদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। 'এস এস এস!

(ক্রমশঃ)

দীন শ্রীরসিকলাল দে

বাকুড়া, সোনামুখী, 'গরীব ভাণ্ডার'।

বাঙ্গালী অবতার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ হইলেন! পতিত দুর্ব্বলের প্রতি তাঁহার দয়া বেশী। তাই তিনি বাঙ্গালী ও উড়িষাকে সমধিক কৃপা করিলেন। বাঙ্গালীর ঘনিষ্ট বান্ধব উড়িয়া, উড়িয়ার প্রাণের বান্ধব বাঙ্গালী। এমন অবতার হয় নাই; কারণ, অবতারী-দেহে সর্ব্ব-অবতারের স্থিতি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নিজ শ্রীঅঙ্গে সর্ব্ব-অবতার লইয়া আসিয়াছেন! এই জন্যও এ অবতারের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। আর এমন প্রেমদাতা হয় নাই। সে কথা এখন থাকুক। সকল অবতার নিজ-দেহে আনিবার প্রয়োজন পাঠকগণ ভাবিয়াছেন কি? দেখুন—অজ্ঞানঘটিত মতভেদ দেশে এত হইয়াছিল এবং এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে কেহ পূজেন রাম, কেহ পূজেন শিব, কেহ পূজেন গণেশ, ইত্যাদি। (স্বরূপ-বোধ বিলুপ্তি বশতঃ ইদৃশ আচরণ নিন্দনীয়, নচেৎ

নয়।) আবার কেবল তাহা নয, পবস্পব বিদ্বেষও পোষণ কবেন, প্রকাশ কবেন। কবিরাজকে বিবিধ ঔষধ বাখিতে হয, কাবণ বোগ-ভেদে ভিন্ন ঔষধ প্রযোগ করিতে হয। বিবাহের উৎসবে, কেহ খাবেন চিডা, কেহ খাবেন ভাত, কেহ খাবেন লুচি ইত্যাদি। কর্ত্তাকে সকল বকম আযোজনই বাখিতে হয়। বিবাহের পব নানা বকমেব ছোট বড বস্ত্র কখিতে হয, কাবণ কেহ সূক্ষ্ম, কেহ মোটা, কেহ লাল পে'ড়ে, কেহ সাদা পে'ড়ে, কেহ ৩ গজী, কেহ ৪ গজী, কেহ বা ৫ গজী পবেন। পণ্ডিতকে একটু স্মৃতি, একটু ন্যায একটু জ্যোতিষ—সকল শাস্ত্রেব একটু একটু অতিবিক্ত পডিযা বাখিতে হয। নচেৎ নানা লোকেব প্রশ্নেব উত্তব দিযা লোকদিগকে আযত্বে বাখা যায না। শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভু আসিযা, অবতাবেব মেলা খুলিলেন, তুমি নৃসিংহ পূজ, এই দেখ তোমাব নৃসিংহ আমি (আমাতে), তুমি দুর্গা পূজ, এই দেখ দুর্গা আমি, তুমি শিব পূজ, এই না আমি শিব। তুমি বিষ্ণু পূজ, এই যে আমি বিষ্ণু। পকেটে যেন "বডলিযান লাইব্রেবী" (Balleau Library) লণ্ডনেব এই সুবৃহৎ গ্রন্থাগাবে যে গ্রন্থ চাও পাইবে। এই ভাবে সর্ব্বজীবেব তৃপ্তি ও বিশ্বাস জন্মাইযা একেশ্বব নিজ প্রতি আকর্ষণ কবিলেন, এবং আনন্দে মাতাইযা, জীবে জীবে অভেদতত্ত্বেব সঞ্চাব কবিযা দিলেন। জীবসব, প্রেমেব সাস্বাদে বিভোব হইযা, এক পাশে, তুমুলকলববে, কোলাকোলি, গলাগলি আবম্ভ কবিযাছিল। দেশে পুনশ্চ ধর্ম্মমৈক্যদ্বাবা একতা প্রতিষ্ঠিত হইল। ভাবতেব সত্যধর্ম্মেব, প্রেমময ধর্ম্মেব, মহাধর্ম্মেব জয পতাকা উড্ডীন হইল। প্রেমবন্যায বাঙ্গালা ডুবু ডুবু হইযা ভাবতময তবঙ্গ ছাইল। অনেক বড বড মুসলমান, কেন শ্রীগৌবাঙ্গেব পদানত হইযাছিলেন তা জানেন? তাহাবা শ্রীগৌবাঙ্গ-বিগ্রহে মহম্মদকে অবশ্য দেখিযাছিলেন, নচেৎ তাহাবা বশ্যতা স্বীকাব কবিতেন না। তখন যদি, খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কেহ ভাগ্যবশে প্রভুকে দেখিতে পাইতেন, তবে প্রভুব কৃপা হইলে, তিনি সেই অনবদ্য শ্রীতনুতে যীশুকে দেখিতেন, সম্ভব মনে কবা যায।

বাঙ্গালীব চৈতন্য-বিলোপেব মূল কাবণ, মুসলমান শাসন নয। উহা বাহ্যিক কাবণ নয, এমনও নয। বসতিস্থল পবিবর্ত্তনদ্বাবা ও সমাজ বন্ধন ও জাতীযতা শ্লথ হয। ইহাও বাহ্য কাবণ। কিন্তু উহাব মূল নিদান, মৎস্য ভক্ষণ। মৎস্য ভক্ষণদ্বাবা আর্য্য বাঙ্গালী, পূর্ব্ব স্বভাব-প্রভাব হইতে স্খলিত হইযা পূর্ব্বাপেক্ষা সত্ত্বভ্রষ্ট ও মলিন হইযা গিযাছে। তদ্দরুণ,—এই বিভ্রাট ঘটিযাছিল, ভেদ

২

বুদ্ধির এত প্রভাব চলিতেছিল। এ কারণে এখনও বাঙ্গালীর অধিকাংশ শ্রীগৌরাঙ্গকে সত্যের আলোক গ্রহণ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশ, নিঃস্বার্থ প্রেমের অবতার গৌরকে অনেক কুটিল কটাক্ষ করিয়া থাকেন। দেহ-ধর্ম্মের আধিপত্য বিলুপ্ত করিতেই, প্রাণের ধর্ম্ম জগতে এই আসিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থভিত্তিমূলক বিলাসী সমাজ, উহাকে ততটা ভালবাসে না, কারণ ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে সবেই রুষ্ট। এখন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যত গ্লানি তত লাভ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রাধান্যের আর একটী কারণ নির্দ্ধারণ করি। উনি ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে জাতিভেদ সমধিক প্রবল, এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া, নীচবর্ণের ভক্তকে কোল দিয়াছেন! দেহের অহঙ্কার দিয়া যে জাতিভেদ, তাহা শিথিল করিয়া দেশের কল্যাণ সংস্থাপন মানসে, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের স্বার্থ কিছু রাখেন নাই। কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, তাঁহাকে তাঁহাদের মতনই একজন পণ্ডিত মনে করেন। অথচ, করুণা কণা বিতরণে সঙ্কুচিত, অনুমাত্র ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত! এই ভক্তিমান প্রেম মধুর স্বাভাবিক ধর্ম্মকে, ব্রাহ্মণগণ নির্য্যাতন করিয়া রাখিয়াছেন! কিন্তু যাহাহউক এমন দিন নিকটে বৈকি, যে, সবে দেখিবেন এই অবতার, খণ্ড জগতের নয়, সমস্ত জগতের। অপ্রাকৃত গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল ভারতের জন্য। এমন উত্তম সার নিদান কি কেবল ভারতবাসীই উপভোগ করিবে, রসাস্বাদ করিবে? তা নয়, ভারতে প্রভু, গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী) স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত ধরাধামে উহার মর্ম্ম ও মহিমার প্রচার হইবে। শ্রীকীর্ত্তনরূপে প্রভু সর্ব্বদেশে, নিজ মধুর প্রেমের ছিটাছটা ফোটা প্রকাশ ও বিতরণ না করিয়াছেন, এমনও নয়। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের এই আগমনে, কালে ভারত, পৃথিবীর প্রেমাচার্য্য হইবেন। ভারতের গৌরব করিবার কৃষ্ণ ;—গৌরাঙ্গ সম সামগ্রী দ্বিতীয় নাই। গৌরাঙ্গপদবী ভিন্ন ভারতের সুখ কল্যাণ অপর কোন পথে নাই। একপ্রাণ, একধর্ম্মী, হইয়া সঞ্জীবিত হইতে চাও শ্রীগৌরাঙ্গ ভজ! সাম্য, উদারতা, ভালবাসা, অমানিত্ব, নিঃস্বার্থতা আর কোথায় দেখিতে চাও? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবেশ প্রাপ্ত হইয়া, দেশের ব্রাহ্মণগণ আজকাল অতিসুন্দর ভাবিত ও প্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহারা পারদ ধবল জ্যোতির উপাসনা করেন। এই ধবল জ্যোতির নিত্য কাল পরিণাম যেদিন তাঁহাদের চিত্তে বিভাত হইয়া স্ফুর্ত্তি পাইবে, এবং কালোর 'ঝিলিমিলি', অনুরাগের রক্তিমচ্ছটা যেদিন তাঁহাদের ভিতর সম্পতিত হইয়া, তাঁহা-

দের প্রাণ মাধুর্য্যে আকুল করিয়া তুলিবে, সেদিন ব্রাহ্মগণ, যথার্থরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনিবেন। এইজন্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে দিয়া আমরা তত আশঙ্কা করি না। কারণ তাঁহারা অবুঝ নহেন, তাঁহাদের প্রাণ আছে, সামাজিক স্বার্থ নাই। তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবগণের বড় ভেদ নাই। মাখামাখি অনেক বেশী হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বস্তুত উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণের অধিগম্য মাত্র। মূর্খের, আচারহীন পিশাচের, গর্ব্বিজনের, স্বার্থান্ধ কামুকের অনধিগম্য। "দাশরথির" পাঁচালীতে যে আমরা শাক্ত বৈষ্ণবের যুদ্ধ বিতণ্ডা পাঠ করি, তাহা দেশে এখন নাই। এখন আছে কেবল সমাজ-শিরোমণি সমাজ-নাবিক স্মার্ত্তগণের কুদৃষ্টি! ব্রাহ্মগণ যখন বিধিপূর্ব্বক ভক্তি যজন করিবেন, তখনই ব্রাহ্ম বৈষ্ণবে ভেদ বিলুপ্ত হইবে। ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণবে ভেদ মাত্র, বিধি ও অবিধির। বিধি হইতে অনুরাগে উদ্ভব ঘটে। অবিধিতে নৈরাশ্যই এক প্রকার ফল।

যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে॥ চৈঃ চঃ

ব্রজগোপীর মতন শ্রীভগবানকে কোন যুগে কুত্রাপি কেহ ভাল বাসিতে পারেন নাই। ব্রজগোপীর ক্ষিপ্ত প্রেম মহিমা, কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ব্যতীত কেহ জানেন না। সেই প্রেমোন্মাদ মর্ম্ম যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, এমন অবতার—পূর্ণ, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। তাই বলি,—কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের তুলনা মিলে না! রাধাকৃষ্ণ-লীলা-তত্ত্ব-মহিমার পৃথগুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। মূলে আমরা মোটা কথায় যাঁহাকে ভালবাসা বলি, তাহার পরিণাম, বিজ্ঞান বৈচিত্র্যই রাধাকৃষ্ণ-লীলা। এই বিজ্ঞান যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব। বাঙ্গালী-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ; এমন বস্তু মানব দেহে আর জন্মে নাই! এই অবতারের শ্রেষ্ঠত্বদ্বারা, বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। বাঙ্গালীজাতির বিশিষ্ট গুণগুলি, প্রধানতঃ এই ঃ—বাঙ্গালী সুন্দর, বাঙ্গালীর রুচি সুন্দর, বাঙ্গালীর ভাষা-বাক্য সুন্দর মধুর, চরিত্র মধুর, হাসি মধুর, ব্যবহার মধুর, সবই কোমল মধুর মাধুরীময়। বাঙ্গালী দয়ালু, বাঙ্গালী সেবানিষ্ঠ। সাধে কি এমন অমৃত-মধুর সুখ-শীতল, স্নিগ্ধ-সুন্দর, প্রেমময় রসময়, অবতারটী বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছেন, ফুটিয়াছেন? অন্যত্র এমন ফুটিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর পূর্ণাদর্শ-স্বরূপ! বাঙ্গালীর একতম প্রতিনিধি নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ। ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ! তোমরা যদি বাঙ্গালী বলিয়া গৌরব করিতে চাও, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদানুসরণ কর। যে জাতির শ্রীগৌরাঙ্গ, সে জাতি কিদৃশী? যে দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ, সে দেশ কেমন? তোমরা ৺রাজা রাম মোহন

রায় লইয়া গৌরব কর, শ্রী জে সি বসু লইয়া গৌরব কর; এ সব গৌরবের বটে, বেশ কর! কিন্তু একবার শ্রীগৌরাঙ্গ নাম নিয়া গৌরব কর দেখি? দেখিবে জীবনের, জাতির, দেশের, কত না মঙ্গল আবির্ভূত হয়। জাতির এক উত্তম অপ্রাকৃত আদর্শ না থাকিলে, জাতির সার ও স্বত্বতা কিছু থাকে না। লীলা স্মরণে যেরূপ ভক্তির সরসতা ঘটে এবং যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, শুষ্ক স্বরূপ চিন্তার প্রয়াসে প্রাণ সেরূপ সবস হয় না। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন কর্ত্তা; তিনি সূর্য্য বানাইয়াছেন, চন্দ্র বানাইয়াছেন, এ সব স্থূল মহিমার ভাবনা বিচিন্তনে চিত্ত তত দ্রবে না। চিত্ত দ্রবীভূত করিবার জন্যই লীলাময়ের অবতার। ভক্ত মাত্রই একথা যাচাই করিয়া দেখিতে পারেন। অতএব প্রার্থনা, আহ্লাদের সহিত, সবে আমাদের নিজস্ব বাঙ্গালী অবতারের লীলাবলী পাঠ করুন!

শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর।
ঢাকা।

নিঠুরালি।

নৌমীড্য তেঽভ্র বপুষে তড়িদম্বরায়,
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল সম্মুখায়।
বন্য স্রজে কবল বেত্র বিষাণ বেণু
লক্ষ্ম শ্রিয়ে মৃদু পদে পশুপাঙ্গ জায়॥

ভাঃ ১০।১৪।১॥

শ্রীভগবানের লীলাগ্রন্থসমস্ত অশেষ রসের আকর। অনাদিকাল হইতে রসপিপাসু ভক্তমণ্ডলী তন্ময় হইয়া উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ভগবানের পার্ষদগণ যুগে যুগে লীলাবতারে, তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, লীলারস সম্যক উপভোগ করিয়াছেন। যাহাদের স্বচক্ষে সেই সব লীলা দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই, পরম কারুণিক ভক্তগণ সেই সকল বঞ্চিতদের জন্য লীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালের সাধকবর্গ সেই গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া, প্রত্যক্ষদৃষ্টবৎ লীলারস-মাধুরীর স্বাদগ্রহণে সমর্থ হইতেছেন।

হরি-কথামৃতের অক্ষয়ভাণ্ডার-স্বরূপ সে সব লীলা-কাহিনী, কিদৃশ মাধুরী মণ্ডিত, তাহাও ভাগবতকার বলিয়াছেন :—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে,
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

ভাঃ ১।১।১৯ ॥

মধুর হইতে যাহা সুমধুর তর,
শ্রবণে মাধুর্য্য যার বাড়ে নিরন্তর;
তমোহীন যশস্বীর সে লীলা অদ্ভুত,
শ্রবণে আমরা তৃপ্ত হই নাই, সুত!
তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং,
কবিভি রীড়িতং কল্মষাপহম্;
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদা ততং,
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।

ভাঃ ১০।৩১।৯ ॥

এই পৃথিবীতে দেব তব লীলামৃত,
সন্তপ্তের প্রাণরূপী, কোবিদ-কথিত,
শ্রবণ মঙ্গল, ভাগ্যবান প্রচারিত,
যাঁরা গায়, তাঁরা মহাদাতা সুনিশ্চিত।

সুকবি-কীর্ত্তিত ও কলিহত জীবগণের প্রতি অনন্ত কৃপাবান ভাগবত-পরায়ণ সাধুগণকর্ত্তৃক কথিত, এই লীলা মাধুরীর রসাস্বাদন ক্ষমতা সকলের সমান নহে। শ্রীচরিতামৃতকারের ভাষায় বলিতে গেলে, ভগবানের লীলা ব্যোমবৎ অনন্ত। বিহঙ্গগণ যেমন সাধ্যানুসারে উচ্চে উড্ডয়ন করে, ভক্তগণও স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে রস আস্বাদন করেন। অজাতদশন শিশু, বা গলিতদন্ত স্থবির, কেহই যেমন ইক্ষু চর্ব্বণের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না, তেমনি অজাতভক্তি-সাধারণে লীলাস্বাদন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। আবার পরম রমণীয় কান্ত-কলেবরে মক্ষিকা যেমন ব্রণই অন্বেষণ করে, তেমনি পাষণ্ডেরা লীলা-গ্রন্থেরও দোষ অন্বেষণ করে। ভাগ্যোদয় না হইলে লীলা-গ্রন্থ পাঠে অনুরক্তি জন্মে না। আর বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে উহার স্বাদ গ্রহণে সামর্থ্য জন্মে না।

জগতে এমন কোন পণ্ডিত নাই, যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন

যে, আমি ভগবানের সমস্ত লীলা বুঝিয়াছি। সমগ্র বেদ যাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত, সেই পদ্মযোনি বলিযাছেন :—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পবাত্মন্,
যোগেশ্ববতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাম্।
ক্কবা, কথংবা, কতিবা, কদেতি
বিস্তাবযন্ ক্রীড়সি যোগমাযাম্॥

ভাঃ ১০।১৪।২১।

হে ভূমন, ভগবন, হে পবমাত্মন,
ওহে যোগেশ্বব, এই ত্রিলোক মাঝাবে,
কোথায, কিরূপে, কবে, আছে হেন জন,
যে জন তোমাব লীলা জানিবাবে পাবে!
যোগমাযা ল'যে ক্রীড়া কব নিবন্তব,
কে বুঝিবে বল তাহা ভুবন ভিতব।

ব্রহ্মাব এই স্বীকাবোক্তিব পব, যদি কোন বিচাব মূঢ বলে যে আমি সব লীলা অবগত আছি, তবে তাহাব প্রগল্ভতা সর্বথা পবিহাস যোগ্য।

লীলা বুঝিবাব সাধ্য নাই এজন্য কি লীলাগ্রন্থ অধ্যযন কবিব না? তবে প্রাণনাথেব সহিত কেমন কবিযা পবিচয হইবে? সন্তবণে সমুদ্র পাব হইবাব সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য কি কেহ সাতাব শিখিবে না, বা জলে নামিবে না? তবে ডাঙ্গাযত সাতাব শিখিবাব কোন উপায নাই। জলেই সাঁতাব শিখিতে হইবে। লীলা-গ্রন্থদ্বাবাই লীলাময়েব প্রাপ্তিব উপায, ভক্তিধনকে লাভ কবিতে হইবে। ডুব শিখিলেই কিছু সাগব-তলেব মানিক মিলে না। ডুবুবিব সাধনা চাই। লীলাগ্রন্থেই লীলাময আছেন। তবে সাধনা চাই। বিনা সাধনায সে মানিক মিলিবে না।

লীলাময়েব সন্ধান পাইব, এই আশায লীলাগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিযাছিলাম। আমি নিতান্ত অধম ও সৌভাগ্যহীন। সেই জন্য বিচার দ্বারা অনুসন্ধান কবিযাছি! আমাব ভাগ্যে লীলা বুঝিবাব সাধ্য হয নাই। তবে এই পরিমাণ বুঝিযাছি যে, লীলা সকলেব বুঝিবার শক্তি নাই এবং অভক্তের সহিত লীলা আলোচনারও কোন প্রযোজন নাই।

ভগবদ্‌বিদ্বেষ, বা ভগবদনুরক্তি, এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তি হৃদয় হইতে দুরীভূত করিয়া, যিনি নিরপেক্ষ ভাবে লীলাগ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনি যদি

বিশেষ ভাবুক বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু না হন, তবে দেখিতে পারিবেন, অন্ততঃ আপাত-প্রতীয়মানভাবে তাঁহার হৃদ্‌বোধ হইবে যে, শ্রীভগবানের লীলা নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। তিনি বড় কঠিন হৃদয়। অনুগত সেবকদিগকে কাঁদানই তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রভু কোন অবতারেই স্বগণকে সুখী করিতে পারেন নাই। রামাবতারে, পিতা মাতা হইয়া দশরথ ও কৌশল্যা কাঁদিয়াছেন, অনুজ হইয়া ভরত কাঁদিয়াছেন, কান্তা হইয়া সীতা কাঁদিয়াছেন! দশরথ বলিয়াছেন :—

পূর্ণেন্দুকান্তবদনং চারু-পদ্মদলেক্ষণং,
রামং যদি ন পশ্যামি যাস্যামি যমসদনং।

রামচন্দ্রের অদর্শনে দশরথ প্রাণই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণাবতারে বসুদেব দেবকী ও নন্দ যশোদা যে, কিরূপ রোদন করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত গোপীগণের রোদন ও বিরহের দশম দশা প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া, ব্রজের পশুপক্ষীও রোদন করিয়াছে। অশ্রুপাত ব্যতিরেকে, সে শোককাহিনী কাহারও পাঠ করিবার সাধ্য নাই! শ্রীমতী বলিতেছেন :—

শ্রবণ হু শ্যামনাম করু গান,
জপইতে নিকলউ কঠিন পরাণ॥

এই শ্লোক পড়িয়া, "নারায়ণং তনুত্যাগে" মনে পড়িবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূত-উদ্ধবের নিকট এক গোপী বলিতেছেন :—

সরিচ্ছৈল-বনোদ্দেশা গাবো বেণু-রবা ইমে।
সঙ্কর্ষণ-সহায়েন কৃষ্ণে না চরিতাঃ প্রভো॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপ সুতং বত।
শ্রীনিকেতৈ স্তৎপদকৈ র্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ॥
গত্যা ললিতযোদার, হাস-লীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরামহে॥
হে নাথ, হে রমানাথ, ব্রজ নাথার্ত্তিনাশন!
মগ্ন মুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥

ভাঃ ১০ কঃ ৪৭।৫০।৫১।৫২॥

এই নদী, এই শৈল, এই বনদেশে,
রাম সহ বেণু রবে রাখালের বেশে,

ধেনু চরাইত কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নিকেতন,.
চারু পদচিহ্নে, এই চিহ্নিত কানন,
এই সব হেরি, পুনঃ পুনঃ পড়ে মনে,
প্রাণনাথ নন্দসুতে ভুলিব কেমনে ?
সুললিত গতি, আর সুমধুর হাস,
সলীল কুটিল দৃষ্টি, ভ্রুভঙ্গী বিলাস।
অমৃতনির্ঝর বাণী-বশে হৃত প্রাণে,
প্রাণনাথ নন্দসুতে ভুলিব কেমনে ?
হে নাথ, হে রমানাথ, ওহে ব্রজনাথ,
আর্ত্তি বিনাশন প্রভো, কর দৃষ্টিপাত।
দুঃখার্ণবে নিপতিত গোকুল তোমার,
হে গোবিন্দ গোকুলেশ করহ উদ্ধার।

যে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক অদর্শনে বিহ্বলা হইয়া পড়িতেন, রাস-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে, বিলাপকালে যাঁহারা বলিয়াছেন :—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ দৃশাম।
ভাং ১০।৩১।১৫ ॥

যখন কাননে তুমি কর বিচরণ,
অদর্শনে যুগ বলি মানি প্রতিক্ষণ।
কুটিল কুন্তল শোভী শ্রীমুখ-দর্শনে,
জড় ব্রহ্ম পক্ষ্ম বাধা, দিয়াছে নয়নে।

যে ব্রজগোপীসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, "উদ্ধব! আমার অদর্শনে গোপীরা নিশ্চিত জীবিত নাই। কারণ জীবন যদি তাহাদের থাকিত, তবে বিরহ অনলে দগ্ধ হইয়া যাইত," সেই গোপীগণ শ্রীভগবানের বিরহে যে কি গভীর শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।

এইরূপ শ্রীচৈতন্যাবতারে, প্রভুর ভক্তগণ যে কত কাঁদিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ, বি, এল। রাজসাহী ;

আমার প্রার্থনা।



গৌর হে।

অপরাধী ব'লে দাও পদে দ'লে
মার শিরে লাথি প'ড়ে প'ড়ে কাঁদি,
চরণ তবুও ছাড়িব না।

চরণের তলে বসিয়ে বিরলে,
ভিজাইব মাটি নয়নের জলে,
কাহাকেও কিছু বলিব না।

মনে মনে ক'ব কিসে যোগ্য হব,
চরণের রেণু চরণে মিশাব,
পদ হ'তে দূরে থাকিব না।

"দূর দূর' করি তাড়াইয়া দিলে,
পদ-তল হ'তে যাইব না চ'লে,
মারিলেও আমি মরিব না।

তোমার চরণে জীবনে মরণে,
চির বাস মোর জেন তুমি গৌর।
দূরে যেতে মোরে বলিও না।

বিষয়ের সুখ মনে ভাবি দুখ,
জগত সংসার ভাবি আমি ছার,
তবু, চরণের ছায়া ছাড়িব না॥

ঐ চরণের তলা বড় সুশীতল,
সব জ্বালা যায়, যায়, 'হায় হায়'
প্রভু, পদরজ দিতে ভুলিও না।

"হরি দাসিয়া র জীবনের সার,
পদ পাখালন-চরণ সেবন
বঞ্চিত তা'তে করিও না॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।
কেশীঘাট, শ্রীবৃন্দাবন।

শ্মশানে হরিনাম।

অহো, কি সুন্দর ব্যবস্থা! এমন একটা সুন্দর দেহের সৎকার, গভীর শোক-কোলাহলের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব হইতে পারিত না। তাই শ্মশানের ব্যবস্থা, শ্মশান-বন্ধুর ব্যবস্থা, শ্মশানে হরিনামের ব্যবস্থা রহিয়াছে! এ ব্যবস্থায় ভারতীয় আর্য্য মনীষীদিগের সম্যক্ কৃপাদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! সত্য সত্যই এই শ্মশানোৎসবের কল্পনায় বুঝা যায়, তাঁহারা আমাদিগের কতদূর শুভানুধ্যায়ী ছিলেন!

এ কথা নিশ্চয় যে, তাঁহাদের বশী অন্তঃকরণ শোকে দুঃখে কদাচও মুহ্যমান হইত না। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ". এ জ্ঞান তাঁহাদের স্বভাবজ ছিল, সুতরাং শ্মশানে হরিনামের ব্যবস্থা, তাঁহাদের জন্য করা, না করা সমান। তাতেই মনে হয়, তাঁহারা ভবিষ্যত ভাবিয়া, ভাবী বংশধরগণের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার কথা সুনিপুণভাবে চিন্তা করিয়া এই শ্মশান যাত্রার বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যসন্তান মাত্রেই, ইহা স্মরণে কৃতজ্ঞ হইতে পারেন।

নৈশ অন্ধকারে দিঙমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। কর্ম্মক্লিষ্ট-মানব শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সুপ্তি ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী যুড়িয়া যেন একটা নিস্তব্ধতার বিরাটরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই একটা পেচকে, দুই একটা শ্বাপদে চীৎকার করিয়া কি করিতে পারে? সে সীমাশূন্য নীরব নিঝুম অবস্থা! কিন্তু একি? নিদ্রিত নরনারীর নিদ্রাসুখ হরণ করিয়া এ বিলাপ-গাথা কে উঠাইল? অহো, এ যে কাণে না যাইয়াই, প্রাণের শান্তি কাড়িয়া লইল। মানুষ কি আর না জাগিয়া পারে? ঐ শুন, সারা পল্লী যুড়িয়া, সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! সকলেই বুঝিয়াছে, আজ তাহাদেরই একজন প্রতিবাসী যমদ্বারের অতিথি হইয়াছে! বুঝিবে ত কাজেই, ঐ শুন কেহ 'বাবাগো বাবাগো' বলিয়া, কেহ "ভাইরে ভাইরে" বলিয়া, প্রবল আর্ত্তনাদে মেদিনী কাঁপাইতেছে! আচ্ছা বলত, ঐ শোক মূর্চ্ছিত পুরীতে এখন তোমার যাইতে সাহস হয় কি? আর গিয়াই বা কি করিবে,—উহারা ত নিরর্থক এই বিলাপ করিতেছে না। গৃহের একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী আজ ইহারা চিরতরে হারাইয়াছে। ঐ টীর স্থান আর অন্য বস্তুদ্বারা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে না, সুতরাং প্রবোধ দানের উপায় কি? এ সময় তুমি তাহাদের তত্ত্বে

গেলে, ফল এই দাঁড়াইবে যে উহাদের চীৎকার আরও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ উহাদের এখন সংসার স্বপন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহারা এখন দুঃখের পাথারে পড়িয়া চারিদিক শূন্যময় দেখিতেছে। এ সময় একজন সমধর্ম্মী মানব উহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেই উহারা দ্বিগুণ আবেগে এই কারুণ্য গাথা তাহাকে শুনাইতে উপক্রম করিবে। তবে কি উহারা আপনা আপনি মৃত আত্মীয়ের শব বেষ্টন করিয়া বসিয়া, এইরূপ ক্রন্দনই করিতে থাকিবে? ব্যক্তি জগতের জনপ্রাণী কেহ কি উহাদের আর তত্ত্ব লইবে না? উহাদিগকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিবে না? করিবে বৈ কি। তবে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" এ কথায় কিন্তু কিছুই কাজ দিবে না। ঐ যোগশাস্ত্র এখন এখানে মহিমা বিস্তার করিতে পারিবে না। এবং মানুষের সেই অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্যও এখন সূচিত হইবে না। সে সূচনা আগেই হইয়া আছে। শুন তবে শ্মশানোৎসবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই কি অমৃত ফল প্রসব করিয়া রাখিয়াছে।

না আজ সে যাত্রা করিবে। চারিদিকে বন্ধুবান্ধব সকলেই উপবিষ্ট। ইহারা কি উপবাসী থাকিবে? না, ঐ যে চুল্লী প্রজ্বলিত হইল। তখন দেখা গেল, 'সাদাসিদে' হইলেও দু'চারি মুঠা অন্ন সকলেরই উদরস্থ হইল। এই বিয়োগ যন্ত্রণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাদিগকে জড়াইবার কথা, আগন্তুক আত্মীয়গণের সাধ্য সাধনায় তাহাদের অভুক্ত অবস্থার কথঞ্চিৎ প্রতীকার হইল। যাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় চারি পাঁচ খানি পাতা পড়িত, তাহাদের বাড়ীতে, এখন সন্ধ্যায় আট দশ খানি পাতা পড়িতে লাগিল। এই খানে শ্মশানোৎসবের সূত্রপাত হইল!

ঔষধ বন্ধ হইল। ঢোকে ঢোকে গঙ্গাজল দেওয়া হইতে লাগিল। ঐ ঐ, চক্ষু উর্দ্ধ দিকে উঠিল। আর কথা কি? সকলে ধরাধরি করিয়া শ্মশানযাত্রীকে তুলসীতলায় আনিল। "ওঁ হরি ওঁ রাম" উচ্চৈঃস্বরে কর্ণ কুহরে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। উহারা কাঁদে কাঁদুক, তাই বলিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার কথা নাই, কারণ, ইহারা শ্মশানবন্ধু।

দেখিতে দেখিতে, সব ফুরাইল! ক্রিয়াশীল জীবদেহ নিস্পন্দ শীতল শবাকার ধারণ করিল! এইবার উৎসবটী বেশ একটু খানি জমকাল হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য-বিমুখ গৃহবাসীদিগকে কর্ত্তব্যোন্মুখ করিবার জন্য, শ্মশানবন্ধুগণ, তখন 'মিঠে কড়া' কতরকম কথাই কহিতে লাগিলেন। ইহাতে উভয়দিকে কাজ চলিতে লাগিল। শোকের প্রথম ঝট্‌কা থামিয়া গেল, একে একে সমস্ত উদ্যোগায়োজনও শেষ হইল। এইবার শ্মশান যাত্রা।

"হরি, হরি হরি।" শবাধার স্কন্ধে, হরিধ্বনি করিতে করিতে, এইবার সকলেই শ্মশানাভিমুখে চলিল। "হরি হরি হরি।" শ্মশানের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, সে মধুর হরিধ্বনি অনন্ত আকাশ আলোড়িত করিয়া তুলিল। "হরি হরি হরি।" ঐ যেন পতাকা হস্তে শ্মশানও,—শ্মশানযাত্রীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। "হরি হরি হরি।" এইবার শব রক্ষা করিয়া, একদিকে শ্মশানচুল্লী প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্যদিকে শবে ঘৃত ম্রক্ষণ, বারিসেক, নববস্ত্র পরিধান ও পূবকপিণ্ড প্রভৃতি চলিতে লাগিল। "হরি হরি হরি।" শয্যা দূরে পড়িয়া রহিল, এইবার শ্মশানচুল্লীর উপরস্থ বংশ নির্ম্মিত শয্যায়, শবদেহ সংস্থাপন করিয়া, বন্ধুগণ চুল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিল। "হরি হরি হরি।" দেখিতে দেখিতে, লহ লহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া, শ্মশানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল! "হরি হরি হরি।" আর কি? জীব-দেহের পরিণাম যাহা দাঁড়াইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই ঘটিল!।

হরি হরি হরি। ভক্তপাঠক দেখিবেন, শ্মশান-বন্ধুদিগের কার্য্যোপক্রম ও কার্য্যশেষ পর্য্যন্ত শোকের লেশকণাও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহারা যেন, দুর্ভেদ্য এক একটী কবচের মধ্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া, মরণকে জয় করিয়া আসিল! অথবা কোন দৈববল-দৃপ্ত হইয়া, তাহারা আজ একটী অকল্মদ শোক-সঙ্গীতকে, আনন্দ-সঙ্গীতে পরিণত করিয়া ফেলিল। কিম্বা চিরাচরিত শুশ্রূষা দ্বারা,—সেই শোকান্ধকার পরীর নিষ্প্রভ জীবনদীপগুলিকে, উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু এই সমস্তেরই মূল সেই শ্মশানে হরিনাম!

শ্মশানে হরিনাম! তোমার জয় হউক। শ্মশানে হরিনাম! তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকিও। শ্মশানে হরিনাম। তুমি অমূর্ত্ত হইলেও অমৃত, অপেয় হইলেও সুস্বাদ, অস্পৃশ্য হইলেও সুস্নিগ্ধ। শ্মশানে হরিনাম! তোমার পুণ্য শুশ্রূষা, শোক-মুহ্যমান জীবের জড়তা-নাশক, চৈতন্য-সম্পাদক, কর্ত্তব্য-উদ্বোধক! শ্মশানে হরিনাম! তোমাতে কত সুখস্মৃতিই জড়িত রহিয়াছে। শ্মশানে হরিনাম! আনন্দ-প্লুত হৃদয়ে, তোমার প্রভাব ও মাহাত্ম্য জগত সমক্ষে কীর্ত্তন করিলাম, ইহার জন্য তুমিও আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিও। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সাঙ্গোপাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিলাসরূপ হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীমতী রাধা, এই হেতু রাধাকৃষ্ণ একাত্মক হইলেও, অনাদিকাল হইতে দেহভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি এই ধন্য কলিতে সেই দুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত ও শ্রীরাধার ভাবকান্তিযুক্ত হইয়া সঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদাদি সহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—

চৌদ্দশত সাতশকে মাহ ফাল্গুণেতে।
গৌররূপে অবতীর্ণ হ'ল নদীয়াতে॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সব সুলক্ষণ॥
গগণের চাঁদে রাহু গ্রাসে সেইক্ষণ।
"হরে কৃষ্ণ" "রাম" রবে ভরিল ভুবন॥
বাজে খোল করতাল নাচে ভক্তগণ।
হরিনাম সহ হরি দিল দরশন॥

প্রেমময়, তাঁহার এই শুভাগমনের শুভবার্ত্তা, তাঁহার অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে, স্বয়ং শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যথা—

"গঙ্গায়াং দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলি-পাপ বিনাশয় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে! মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুণে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহ॥"

(শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র)

ভাইরে—

জগদানন্দের শুভাগমনে চরাচর বিশ্বজগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল।

আনন্দের অন্ত নাই সদানন্দে হেরে।
আনন্দ হিল্লোল বহে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভ'রে॥
মহানন্দে নরনারী করে হুলাহুলি।
স্বরগে আনন্দে নাচে দেবের মণ্ডলী॥

ব্রহ্মা নাচে, শিব নাচে, নাচে পুরন্দর।
পাতালে অনন্ত নাচে, নাচে চরাচর॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা আনন্দে বিহ্বল।
আনন্দে উজান বহে জাহ্নবীর জল॥

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু ভগবান অংশরূপে যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার এবারের কার্য্য দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন বা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু নহে, এবার তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে,—

"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি। *
বিধি ভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাই শক্তি॥"

এই ভাবিয়া তিনি—

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণযাবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং॥"

অর্থাৎ—যাহা কখনও কাহাকেও অর্পণ করেন নাই, সেই স্বীয় উন্নত উজ্জ্বল রস ভক্তিরূপ সম্পত্তি, সাধারণকে প্রদান করিবার নিমিত্ত, করুণা করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমাভিন্ন অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে।
এই ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আর সেই দয়াময় জীবের দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং শ্রীমুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচইমু ভুবন। †

* অনুরাগহীন হইয়া শাস্ত্রের শাসনে নরক ভয় নিবারণ জন্য যে ভজন। এতাদৃশ বিধিভক্তিতে ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না।

† দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর।

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবার॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

তাঁহার স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার আরও তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—যথা—

"শ্রীরাধায়াং প্রণয়ঃ মহিমা কীদৃশো বা মৈয়েবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়
সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভ।
তদ্ভাবাঢ্যাঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দু॥

অর্থাৎ—

শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার এবং যে প্রেম দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, আমার সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধার যে সুখাতিশয় হইয়া থাকে সেই সুখই বা কি প্রকার; এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু, শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশচী দেবীর গর্ভরূপ দুগ্ধ-সমুদ্রে হরিরূপ ইন্দু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ইঁহার—

প্রথম লীলায় হৈল বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য।
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভাইরে—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্থাৎ—

উপনিষদে যিনি অদ্বৈতব্রহ্ম, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অঙ্গকান্তি; যোগশাস্ত্রে

যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষ, তিনি ইঁহার অংশ স্বরূপ; যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণ ভগবান, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। অতএব ইহা অপেক্ষা পরতত্ত্ব জগতে আর নাই।

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাই॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভাইরে—

সেই করুণাময়ের এমনই করুণা যে—

"বাহু তুলে হরি ব'লে যে দিকেতে চায়।
করিয়া কলুষনাশ প্রেমেতে ভাসায়।"

কলিকলুষনাশার্থ সেই প্রেমাবতার প্রথম ভক্তরূপ অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় ভক্তাবতাররূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য, চতুর্থ ভক্তাখ্যা অর্থাৎ শ্রীবাস এবং পঞ্চম ভক্তশক্তি অর্থাৎ গদাধর—এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে কোনই ভেদ নাই, কেবল কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদনার্থ বিভিন্ন ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন মাত্র, যথা—

"পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥"

বিশেষতঃ—নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, লীলা নিমিত্ত এই দুই পৃথক কায়া ধারণ করিলেও, ইঁহারা এক স্বরূপ, একে দুই বা দুইয়ে এক, অভেদ স্বরূপ,

"একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্যকায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥

(তত্রৈব)

শ্রীনিত্যানন্দ, পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ এবং তাঁহার লীলা কার্য্যের প্রধান সহায়। ভগবানের রাম অবতারে ইনি লক্ষণ এবং বৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। ইনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং শেষ এই চারিরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের দ্বারা ভগবৎ সেবা এবং স্বয়ং সঙ্কর্ষণরূপে কৃষ্ণলীলার সাহায্য করেন।

ভাইরে—

"হেন প্রভু নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
জীবের করুণা লাগি জগতে উদয়॥

তাঁহার—

শ্যাম * চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্ত পদ, কমল লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্ট বস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কানে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মন্দ-মন্থর পয়ান॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ সম দন্ত তাম্বুল চর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ, ডাহিনে বামে দোলে।
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

১৩৯৫ সালের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন—

যথা—

"ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত)

---

* শ্যাম শব্দে গৌরবর্ণ বুঝাইতেছে।

ভাইরে—

"নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় যাঁর॥"

নিত্যানন্দ, গৌর-প্রেমরসে ডগমগ, গৌরভক্তি ভাণ্ডারের একমাত্র ভাণ্ডারী; তাঁহার রসনা গৌর-নাম-সুধার অফুরন্ত আদি নির্ঝর। নিত্যানন্দ অক্রোধ, অমানি মানদ। শ্রীশ্রীগৌর প্রেমময়, পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট বিপন্ন জীবের পরম আশ্রয়।

নিত্যানন্দের হরি-কথায়, পাষণ্ডের মনেও ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, পাষাণও গলিয়া যায় এবং ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরস উছলিয়া উঠে। নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যায়, নামের স্রোতে জগৎ ডুবিয়া যায়। আচণ্ডাল অন্ধ আতুরাদি পতিত-জনকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার এই প্রেমময় অবতার গ্রহণ। কিরূপে জীবের দুঃখ অপনোদন করিবেন, নিত্যানন্দের কেবল এই চিন্তা; তাই তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত হইয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন; এমন কি, মার খাইয়াও তিনি নাম প্রেম দানে বিরত হন নাই। তাঁহার নিকট উত্তম অধমেরও বিচার ছিল না। যথা—

"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত, জীবের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব যদি কেহ গৌর-প্রেমামৃতের সুখাস্বাদ করিতে অভিলাষী থাকে তবে নিত্যানন্দের পদাশ্রয়ী হও। নিত্যানন্দের কৃপাবিন্দু সঞ্চয় করিতে পারিলে, জগতে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, জীবগণ অনায়াসে প্রেমধনে ধনী হইয়া শ্রীগৌরহরির অতুল পদাশ্রয় লাভ করিতে পারে।

ভাইরে—

"নিত্যানন্দ মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পান জীব কোন ছার॥"

পূর্ণ ভগবান প্রেমাবতার গোরাচাঁদের, ভক্তাবতাররূপ অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু। ইনি হরির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের সহিত দ্বৈত ভাব রহিত জন্য অদ্বৈত; ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া আচার্য্য এবং এই উভয় কারণে অদ্বৈতাচার্য্য নামধেয় যথা—

"মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদং।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতার মীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

(শ্রীশ্রীচরিতামৃতম্)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র।
চাঁইবাসা, (সিংভূম)।

মায়ের ছেলে।

মায়ের ছেলে ত সকলেই, কিন্তু ছেলের মত ছেলে না হইলে তাহাকে কেহ মায়ের ছেলে বলে না। নির্ব্বংশের বেটা, নির্ব্বংশের পোই ব'লে থাকে। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ মায়ের ছেলে ছিলেন।

শক্তি উপাসকের গৌরবের ধন রামপ্রসাদের নাম স্মরণে কাহার না আনন্দ হয়? বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের দুইটী প্রধান শাখাকে শাক্ত ও বৈষ্ণব বলে। উভয় সম্প্রদায় মধ্যে স্থূলে গোল থাকিলেও মূলে কিছুই গোল নাই। তাই রামপ্রসাদ উভয় দলের সমান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন।

'মা' শব্দটী যে মাতৃ সাধনার বীজমন্ত্র, তাহা রামপ্রসাদই সর্ব্ব প্রথম আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ 'মা' মন্ত্রের ঋষি ছিলেন।

আমরা চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিলেও, ঐ মন্ত্রে যে একটু মোহিনী শক্তি লুক্কায়িত আছে, তা বেশ বুঝিতে পারি। 'মা' ডাক ছিল বলিযাই 'প্রকৃতি-রাজ্যের পট্টমহিষীদিগকে লইয়া আমরা সুখে সন্তোষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।' 'মা' ডাকে পাষাণও ফিরিয়া চায়। ইহাতে বুঝা যায়, সাধা গলায় ঐ মন্ত্রটী গীত হইলে, থাকুন না তিনি মূলাধারে, থাকুন না তিনি ব্রহ্মদ্বারে, মায়ের প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একবার তাঁহার ছেলের কাছে অবশ্যই আসিতে হইবে। ভক্ত রামপ্রসাদ ইহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।

বলিয়াছি ত শাক্ত বৈষ্ণবে মূলে কোনই গোল নাই। অনেকে কিন্তু মূলের দিক লক্ষ্য করেন না, ফলে শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব কথাটা এখন প্রবাদ বাক্যের মত সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়া থাকে।

আজু-গোঁসাই, রামপ্রসাদের সমসাময়িক এক বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। রামপ্রসাদ নিজ সঙ্গীতে যে সকল পরমার্থ তত্ত্বের উল্লেখ করিতেন, আজু-গোঁসাই স্বরচিত সঙ্গীতে তার পাল্টা কথা শুনাইতেন। রামপ্রসাদ গাইতেন "মুক্ত কর মা, মায়া জালে।" আজু-গোঁসাই গাইতেন "বদ্ধ কর মা, খেপলা জালে।" রামপ্রসাদ গাইতেন "কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, পাগলের ছাট ম'লেও যায় না।" আজু-গোঁসাই গাইতেন "কর্ম্মের ডোর, স্বভাব চোর, মদের ঘোর মলেও যায় না"। ইত্যাদি। এইরূপ দুইজনে সঙ্গীত যুদ্ধ হইত।

শক্তি উপাসকের পঞ্চ-মকারের নিগূঢ়ার্থ সকলে জানেন না; আজু গোঁসাই ও জানিতেন না। তাই তিনি রামপ্রসাদকে একদিন 'মাতাল' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। তদুত্তরে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন।

মন ভু'লনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে।
সুরা পান করি না আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে খেপেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে।

এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কি মায়ের কৃপা লাভ হইতে পারে? মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ আজ তিনশত বৎসব কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাধন সঙ্গীত গুলি এখনও তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যতকাল বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম বাঙ্গালীর মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইবে।

শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর।

——:*:——

শ্রীবলরাম দাসের শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকে এই পদটী আছে—

শত বর্ষ তপে যেই ধন নাহি মিলে।
গীত, কাব্য, চিত্র মিলে যেই শিখাইলে॥
সাধন কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।
বলাইর সর্ব্বস্ব-ধন তাঁর পদতল॥

শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার তিনটী পথ,—কাব্য, গীত ও চিত্র। পূর্ব্বে সাধন-পথ কণ্টকাকীর্ণ ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া সেই পথ পরিষ্কার করিলেন। পরে প্রভু সেই পথ সুশীতল, সুদৃশ্য ও সুগম করিলেন। যে শ্রীভগবানকে বহু ক্লেশকর উপায়েও পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল, তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ নাচিয়া গাইয়া পাইবার উপায় বলিয়া দিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় অধম জীবে শ্রীভগবানকে নাচিয়া গাইয়া পাইতেছে।

এই যে সাধন-পথ সুগম হইল, তাহার প্রধান সহায় শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তের মধ্যে অনেকে। এই পথ সুগম করিতে এই সকল ভক্তগণের মধ্যে কে কি সাহায্য করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই সমুদায় গৌর-ভক্তের মধ্যে শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর সর্ব্ব প্রধান। এ কথা বলিবার কারণ, ইনি মনোহর সাহী গীতের সৃষ্টি করেন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র নবাবের দেওয়ান ছিলেন। বাড়ী রাজুব গ্রামে। এই গ্রাম কাটোয়ার সাত ক্রোশ পশ্চিমে, কাঁদড়ার নিকট। তাঁহার সন্তান হইয়া মরিয়া যাইত। এই রূপে কএকটী সন্তান মরিলে তাঁহার স্ত্রী গঙ্গার ঘাটে রোদন করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর মঙ্গলের সহিত তাহার দেখা হইল।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, নয়নানন্দ ; নয়নানন্দের প্রধান শিষ্য ঠাকুর মঙ্গল। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীয়-ব্রাহ্মণ। ইহার বংশীয়েরা কান্দড়ায় বাস করেন। উপাধি ঠাকুর। তাঁহাদের বহুতর শিষ্য আছে।

ঠাকুর মঙ্গল; কালীচরণের স্ত্রীকে রোদন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ শুনিয়া বলিলেন "তোমার পুত্র সন্তান হইবে, সে এবার বাঁচিয়া থাকিবে, পরম ভক্ত হইবে এবং প্রভুর অনেক কার্য্য করিবে।"

মিত্র ঠাকুরাণী বলিলেন, "পুত্রটী যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাকে

আপনার চরণে দিব।” সেই পুত্র নৃসিংহ। ষোড়শ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মন্ত্র দিবার উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা শাক্ত, তাঁহাদের কুলগুরু উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নৃসিংহ, ঠাকুর মঙ্গলের চরণ আশ্রয় করিলেন। পরে নৃসিংহ বিবাহ করিলেন। তাঁহার একটী পুত্র হইল, তাহার নাম হরেকৃষ্ণ।

নৃসিংহ ভক্তির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিতেছেন, এমন সময় প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে নৃসিংহ সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া, বীরভূম জেলায় ময়নাডাল জঙ্গলে বাস করিলেন। সেখানে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক ভজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুতর লোকে তাঁহাদের আশ্রয় লইল। তখন প্রভুর আদেশক্রমে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই শ্রীমূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠের, কান্দড়া হইতে এই দারু আনা হয়। যে ভাস্কর এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন তাঁহার নাম কেনারাম। তাঁহার বাড়ী কেন্দুলির নিকট সুগোল। শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপিও ময়নাডালে বিরাজিত।

নৃসিংহ নিজকৃত সুরে ভজন করিতেন, সেই সুরের নাম হইল মনোহরসাহী। মনোহরসহী পরগণায় সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম মনোহরসাহী রাখা হয়। সেই সময় আচার্য্য প্রভু যে সুর করেন, তাহা রাণীহাটী পরগণার সৃষ্ট বলিয়া রেণেটী নামে অভিহিত। আর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক যে সুর সৃষ্ট হয়, তাহা গরাণহাটা পরগণায় সৃষ্ট বলিয়া, গরাণহাটী হইল। কীর্ত্তন এই তিন ভাগে বিভক্ত—মনোহরসাহী, রেণেটী ও গরাণহাটী।

মিত্র ঠাকুরগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। ময়নাডাল চির দিন কীর্ত্তনের স্থান। বাদ্য ও গীত তাঁহাদের কুলধর্ম্ম। তাঁহারা বাদ্য ও গীত দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। কেহ কীর্ত্তনের কোন অঙ্গ শিখিতে গেলে, তাঁহারা তাহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। কি মধুর সেবা! এখন লোকের সে ভক্তি নাই, সুতরাং মিত্র ঠাকুরদের আর সেরূপ সম্পত্তিও নাই, কিন্তু তবু তাঁহারা যথাসাধ্য কুলধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের যত প্রকার সেবা আছে সঙ্গীতের ন্যায় সেবা আর নাই। সেই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কেবল মুরলী। শ্রীভগবানের রাসে সেবা পাওয়াই জীবের চরম পুরুষার্থ। রাসের প্রধান উপকরণ সঙ্গীত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মধ্য স্থানে, চতুষ্পার্শে সখিগণ নানাবিধ যন্ত্র লইয়া দাঁড়াইলেন। সুরের একটু অমিল হইলে রসিকশেখর বড় ব্যথা পান, এই নিমিত্ত অতি যত্নের সহিত বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের সুর মিল করা হইতেছে। সখিগণ নানাবিধ

ঐকতানিক বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীমতীর নৃত্য করিতে লজ্জা হইতেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "প্রিয়ে! তুমি না নাচিলে আমার নৃত্য আইসে না।" শ্রীমতী কোন ক্রমে লজ্জাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আর স্থির থাকিতেও পারিতেছেন না। যন্ত্রবাদ্য-ধ্বনীতে হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ আপনি নাচিয়া উঠিতেছে। এদিকে শ্যাম দক্ষিণে, তাঁহার স্পর্শসুখে জ্ঞানহারা হইয়াছেন। তখন শ্রীমতী আস্তে আস্তে কটীতে নীল শাটীর আঁচল বাঁধিলেন, আর লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়া অল্প অল্প নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত লজ্জা দূর হইয়া গেল। তখন—

বৃন্দাবনে শুনি আজ বড় কলরব।
গোপিনীগণের আজি প্রেমের উৎসব॥
ভ্রমর ঝঙ্কার করি শ্যামগুণ গায়।
আধ বদনে চাঁদবদন চেয়ে হেসে যায়॥

এ নৃত্যে পরিশ্রম নাই, এ আনন্দের ক্ষয় নাই। এ এক প্রকার রাস, আর এক প্রকার রাস শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণ কদম্বতলায় বৃক্ষ হেলন দিয়া দাঁড়াইয়া মুরলী বাজাইতেছেন। গোপিনীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ যে মুরলী বাজাইয়া থাকেন, তাহাতে তালভ্রষ্ট, কি সুরভ্রষ্ট নাই। কৃষ্ণ বিশুদ্ধ রাগে মুরলী বাজাইতেছেন, আর গোপিনীগণ স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন, যথা—

বাঁশী গান সুধা পান করে ব্রজাঙ্গনা।
সুখেতে অবশ অঙ্গ সজলনয়না॥

কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নীরব হইলেন। তখন গোপিনীগণ অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "সুন্দর! আর একটু বাজাও, তোমার গীতে আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না, বরং পিপাসা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।" বস্তুত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীতে পিপাসার শান্তি না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

শ্রীবৃন্দাবন—জীবের চরম স্থান। সঙ্গীত—বৃন্দাবনের পরম সহায়। মনোহরসাহী—গীতের শেষ উৎকর্ষ। ঠাকুর নৃসিংহবল্লভ-মনোহরসাহী সঙ্গীতের স্রষ্টা।

মনোহরসাহী সঙ্গীত কি বস্তু তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় যাহার কর্ণে সুর বোধ ও হৃদয়ে ভক্তি আছে, তিনিই জানেন।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

———

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপানুরাগ।

পূর্ণেন্দু সদৃশ যার মুখ-শোভা চমৎকার
তিলফুল-জিনি চারু-নাসা
বিশাল নয়নদ্বয় যেন ফুল্ল কুবলয়
রূপ হেরি নাহি মিটে আশা॥
কেমনে ভুলিব তারে সখি।
কোটি কোটি যুগ যদি রূপ দেখি নিরবধি
তবু তৃপ্ত না হইবে আঁখি॥
যে দিয়াছে রূপে আঁখি বল সে কেমনে সখি
ধৈরজ ধরিয়া ররে ঘরে।
জাতি কুল শীল মান তার কি থাকয়ে জ্ঞান
লাজ ভয় সব যায় দূরে॥
ঈষৎ হাসিয়া চায় সুষমা ঝরয়ে তায়
মন প্রাণ তাহে কাড়ি লয়।
অমিয় সেচিত বাণী সাধ হয় সদা শুনি
কোকিল শুনিয়া লাজ পায়।
সখিরে কেমনে বর্ণিব শোভা-রূপ।
জিনিয়া উত্তপ্ত স্বর্ণ গৌরাঙ্গ-চাঁদের বর্ণ
প্রতি অঙ্গ লাবণ্যের কূপ।
সুধাংশু বদন কোলে সুবর্ণ কুন্তল দোলে
বিম্বফল জিনিয়া অধর।
দশনে মুকুতা পাঁতি বিধি রেখেছেন গাঁথি
আহা মরি অতি মনোহর।
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ চুম্বিছে ললাটদেশ
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
দেখিলে গৌরাঙ্গ মুখ উপজয়ে কোটি সুখ
উথলিয়া উঠে প্রেমসিন্ধু॥
মথিয়া সৌন্দর্য্য সিন্ধু বুঝি নদীয়ার ইন্দু
তুলিয়াছে বিধি অনুরাগে।
দাসী কহে রূপ দেখি তিরপিত নহে আঁখি
আর কিছু ভাল নাহি লাগে॥

শ্রীঅম্বালিকা দাসী।

সাহেবনগর,—নদীয়া।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।

তৎপদ দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আনন্দ।

বন্দনা।



মা

ঐ যেন শুনি মঙ্গলধ্বনি উঠিছে সুগভীর,
ঐ যেন তোরে ঘিরিয়ে খাড়া লক্ষ ভকতবীর।
সারা বিশ্ব ভরা আনন্দ
আজি করে তোর চরণ বন্দে
ঐ যেন সবে 'মা মা' বলে লুটায় আপন শির,
ঐ যেন শুনি মঙ্গলধ্বনি উঠিছে সুগভীর।

মা

সফল মম জন্ম-জীবন সফল মম সাধ,
বল মা কোথা চাপিয়ে রাখি প্রাণের আহ্লাদ?
এই ত ছিল মনে আশা
জননী আমার বঙ্গভাষা
জাহ্নবীর মত উঠাবে কবে 'কুলু কুলু কুলু' নাদ,
সফল মম জন্ম জীবন, সফল মম সাধ।

মা,

চ'লেছ তুমি সাগর সঙ্গমে প্রসারি' শত মুখ,
বিস্ময় বিহ্বল শুনি 'কল কল' আজিকে সকল লোক।

সাধক যত স্থির চিত্তে
চিন্তিছে তোমারে স্তিমিত নেত্রে
প্রতিভা দীপিছে সবের মুখে, উল্লাসে ছাইছে বুক,
চ'লেছ তুমি সাগর-সঙ্গমে প্রসারি শত মুখ!

মা,
যদিও আমি অক্ষম দুর্ব্বল, যদিও আমি হীন,
যদিও মগ্ন দীনতা-পঙ্কে,—যদিও ভগ্ন-বীণ;
যদিও বামন চাঁদের কাছে,
তবু আমার পরাণ যাচে—
তোমারি কল্যাণ,—তোমারি শুভ—মাগো রাত্রি দিন,
যদিও আমি অক্ষম দুর্ব্বল, যদিও আমি হীন।

মা,
মায়ের স্তন্যে হ'ল যেদিন প্রথম পরিচয়,
সেই দিন তুমি করুণা ক'রে ক'রেছ মোরে ক্রয়।
পূরিয়ে কণ্ঠ অমিয়স্বরে
পাঠাইলে পুনঃ খেলা-ঘরে,
হায় মা, সেদিন স্মরণ ক'রে চ'ক্ষে জল আজ বয়,
মায়ের স্তন্যে তোমার সনে প্রথম পরিচয়!

মা,
কেমনে সে ঋণ শোধিয়ে যাব সেই ভাবনাই করি,
তুমি আজ আর নও মা দীনা, তুমি রাজেশ্বরী;
মিলিয়ে যত তাপসবর্গ
ঢালিছে চরণে প্রীতির অর্ঘ্য,
ভূতলে যেন নে'মেছে স্বর্গ—আহা মরি মরি!
তুমি আজ আর নও মা দীনা, তুমি রাজেশ্বরী!

আজ,
দ্যাখ্‌রে চাহিয়ে ভুবনবাসি, আমার মায়ের রূপ,
দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস—বিপুল চারিটী স্তূপ,
খুলিয়া দেখ ভাঁজে ভাঁজে
সকলি র'য়েছে উহার মাঝে—

গণিত, জ্যোতিষ, ছন্দ, আয়ুর্ব্বেদ—কিছু না পেয়েছে লোপ,
ভাখ্‌রে চাহিয়ে ভুবনবাসি, আমার মায়ের রূপ!

মা,

ঐ যেন শুনি মঙ্গলশঙ্খ বাজিছে সুমধুর
ঐ সুরে আজ মিশিয়ে গেছে আমার প্রাণের সুর;
ছানিয়ে মাখিয়ে ভকতি-প্রীতি
রচিয়ে এ'নেছি বন্দনা-গীতি,
নিকটে যাইতে জাগে মা, ভীতি—তাই র'য়েছি দূর,
ঐ যেন শুনি মঙ্গলশঙ্খ বাজিছে সুমধুর! *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং বৈষ্ণব-তত্ত্বের সারকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভগবৎ অনুগ্রহে জীব, সংসারের কল্পিতপথ ছাড়িয়া ঈশ্বরউন্মুখ হওত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে, হ্লাদিনীর স্ফুর্ত্তি জানিতে পারে। প্রথমে ঐ স্ফুরণের নাম প্রেম। আত্মপর-ভাব ঘুচিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন ও মৈত্রী হইলে প্রেম হইল। এই প্রেমের গাঢ়তা জন্মিলে, ভাব। এই ভাব স্থায়ী ও ঘনীভূত হইলে মহাভাব আখ্যা ধারণ করে। মহাভাব-চিন্তামণি শ্রীরাধিকার স্বরূপ। ইনি চির-তরুণী, করুণাময়ী, লাবণ্যময়ী, সৌন্দর্য্যের আধার, অনুরাগময়ী, হাস্যময়ী ইত্যাদি ইত্যাদি। মনোবৃত্তিরূপ সখী পরিবেষ্টিত। মন্দভাগ্য তাঁর-স্বরূপ-লাভ হয় না। হ্লাদিনী-শক্তির স্বরূপ এই যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির অনুকূল মনোবৃত্তি তাঁহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিতেছে। যেমন ললিতা বা কমনীয় সৌন্দর্য্যানুভূতি; বিশাখা বা চিত্তবিত্যাদি অনুভূতি; রঙ্গদেবী বা বিশুদ্ধ আমোদ কৌতুকাদির অনুভূতি; শৈব্যা বা মঙ্গলানুভূতি; কান্তি বা শোভানুভূতি, ইত্যাদি। এইরূপ অনুভূতির আস্বাদন ভিন্ন কখনও হ্লাদিনীর অনুভব সম্ভব হয় না। এই সকল শক্তিকে কৃষ্ণকান্তা বলা যায়। ইহাদের নিজের সুখস্পৃহা

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ৭ম অধিবেশনোপলক্ষে রচিত।

বা বাসনা কিছুই নাই; হ্লাদিনীকে পরিপুষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করিতে পারিলেই ইহারা সুখী। সংক্ষেপতঃ নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাই ইহাদের প্রকৃতি। এই সকল শক্তিই গোপী বা সখীশক্তি। সাধন বলে এই শক্তি-সম্বন্ধিত হইতে না পারিলে, অর্থাৎ এই সখীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে, কৃষ্ণসেবার অধিকার জন্মে না এবং রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা নিজেন্দ্রিয় সুখ জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম কাম, আর যাহা কৃষ্ণপ্রীতি সংসাধন জন্য কৃত হয়, তাহার নাম প্রেম। সখীপ্রেমে কামনার গন্ধমাত্র নাই। সখী, আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, যাহা কিছু করেন, নিজের জন্য নয়; সকলই ঈশ্বরের প্রীতী উদ্দেশে। বিশুদ্ধ-ভক্তির আশ্রয়-গ্রহণ করিতে না পারিলে সখীদিগের আশ্রয়-লাভ ও রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-দর্শন-লাভের অধিকারী হয় না।

"নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা বলি তাকে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

প্রেম ও কাম স্বতন্ত্র সামগ্রী। আমার দ্বারা অন্যে সুখী হউক এবং তাহাতেই আমি সুখী হই, এইরূপ মনোবেগের নাম প্রেম। আর অন্যের দ্বারা আমি সুখী হই, এইরূপ ভাবের নাম কাম। স্ত্রীসম্ভোগান্তে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু ভাগবৎ প্রেমের আদৌ বিচ্ছেদ নাই, বরং উহা প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

দেহাদি বহির্বিষয়ের মমতায় উদাসীন হইয়া, ভগবানে অত্যন্ত মমতার নামই ভক্তি। ভক্তি, শান্তি ও পরমানন্দ স্বরূপ। যেখানে বাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প, সুখ-দুঃখ আদি তরঙ্গের লেশমাত্র নাই, তাহাই শান্তি-নিকেতন। সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে। যে সকল বস্তু তুমি ভগবানকে অর্পণ করিয়াছ, তত্তাবতের জন্য তোমার আবার চিন্তা কি? ভালমন্দ চিন্তা করিতে হয়, ভগবানই করিবেন। সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র সার কর, তাঁরই চিন্তা কর। কর্ম্মফল, কামনা, পরিত্যাগ কর, ফলত্যাগের সাধনা অভ্যাস কর। সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া যদি কাম, ক্রোধ, অভিমান করিতে হয়, তবে তাঁহারই উপর করিবে। কামে পরমাত্মাকেই রতি কর,—ক্রোধে আপনার উপর রাগ কর, যে কেন তাকে পাইতেছি না। এবং অভিমান কর যে আমার প্রভুর ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যমান প্রভু আর কে আছেন, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সকলই ভগবানে অর্পণ করিবে, এমন কি যদি রাগদ্বেষ করিতে হয় তো তাঁহাতেই করিবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥"

ভক্তি দ্বিবিধ: বৈধী ও রাগময়ী। শাস্ত্রবিধিসম্মত ও গুরূপদেশ অনুসারে ভাবসাধন করার নাম বৈধীভক্তি। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, সেবা, বিশ্বাস, অর্চ্চন, বন্দন ও আত্মনিবেদন,—এই নয়টী ইহার প্রধান সাধন-অঙ্গ। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান হইয়া সাধুসঙ্গাদি করিতে পারিলে এই ভক্তি লাভ করা যায়। ভগবানে গাঢ় তৃষ্ণা না জন্মিলে রাগময়ী বা রাগাত্মিকা-ভক্তি জন্মে না। সাধক কুলধর্ম্মাদি বজায় রাখিয়া বেদবিহিত উপদেশ অনুসারে ভক্তির পথে চলিতেছিলেন, কোথা হইতে অনুরাগের প্রবল বন্যা আসিয়া জাতি, ধর্ম্ম, কুল, শীল সকলই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ভক্তের প্রাণ প্রিয়তমের দিকে ছুটিল। এই গাঢ় অনুরাগ জন্মিবার পূর্ব্বে মদনমোহন শ্যামসুন্দর রূপের সুচারু দর্শন চাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ ভাবে ভক্তের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। যথা:

১। শান্ত—অর্থাৎ নিষ্ঠা, কৃষ্ণনিষ্ঠা। ইহা গৌরবমিশ্রা প্রীতি। ভবযন্ত্রণা ভয়ে ও ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। ইহাই সাধারণ ভক্তের ভাব, বা ভাবরাজ্যের প্রথম সোপান।

২। দাস্য—সেবন, ইহাতে নিষ্ঠা ও সেবা উভয় মিশ্রিত। ভগবানই জগতের হেতু, ভগবানই জগৎ প্রভু, আমি তাঁর দাস এইরূপে তাঁর শরণাগত থাকা। হনুমানাদির ভাব। ইহাতে ভক্তি ও দয়া মিশ্রিত, গৌরবমিশ্র প্রীতি। নিষ্ঠা ও সেবন।

৩। সখ্য নিষ্ঠা, সেবন ও অসঙ্কোচ। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, সর্ব্বদাই তিনি আমার সহায়, তিনি দীনবন্ধু, এইরূপে সখ্যভাবে তাঁর অনুগত হওয়া। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, চেতন ও অচেতন, যাবৎ পদার্থই ঈশ্বর। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, শত্রুমিত্র সমস্তই তিনি, ইত্যাকার বোধে সর্ব্বত্র তাঁর দর্শন করা। শ্রীদামাদির ভাব। পূর্ণ প্রীতি এবং নিষ্ঠা, সেবন ও অসঙ্কোচ।

বাৎসল্য—নিষ্ঠা, সেবন, অসঙ্কোচ ও মমতাধিক্য, এবং মমতাধিক্যে লালন। পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে আদর করিয়া তদ্গত প্রাণ হওয়া। নন্দ যশোদাদির ভাব। ইহাতে প্রীতি ও দয়া মিশ্রিত।

মধুর—নিষ্ঠা, সেবন, অসঙ্কোচ, মমতাধিক্য এবং নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন।

আমার মন প্রকৃতি, নারী;—এবং তিনি পুরুষ, পতি, এই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাতে মিশাইয়া থাকা। রাধার ভাব। ইহাতে ভক্তি, প্রীতি ও দয়া সকলই বিদ্যমান। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ; সুতরাং মধুর-ভাবের ভিতর দয়াও আছে। মধুরতাই শ্রেষ্ঠ। যিনি পতিপ্রাণা সতী, তিনি পিতামাতার ন্যায় প্রিয়তমকে স্নেহ করেন, সখীর ন্যায় উপদেশ দেন, দাসীর ন্যায় সেবা করেন এবং সাধ্বীস্ত্রীর ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। সংসার রূপ আয়ানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও, নিঃস্বার্থ প্রেমিকা রাধার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ যেমন তেমন। নীচ বাসনাযুক্ত ইন্দ্রিয়-ভাব লইয়া যাইলে, এ প্রেম বুঝিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণবমতে নিত্যলীলা বা সেব্যসেবকভাব উল্লিখিত আছে। এভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর, এই পঞ্চ ভাবের, ভাব-বিশেষের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, ঈশ্বর এবং জীব, এই অবস্থায় থাকিয়া লীলারসামৃত পান করিয়া থাকেন। "জীব এবং ঈশ্বর" এই ভাবে যদিও দ্বৈতজ্ঞানের কার্য্য হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শনের সময়, সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকিতে পারে না। তাঁহার মন প্রাণ সেই মূর্ত্তিতে এককালে সংলগ্ন হইয়া যায়, নিজের পৃথক অস্তিত্ব বোধ থাকে না। তাই ভক্তসাধক বলিয়াছেন "চিনি হইতে চাহিনা আমি, চিনি খেতে ভালবাসি।" চিনি খাইতে খাইতে, বিমল সুখ-সাগরে ডুবিয়া গিয়া সাধক নিজেও চিনি হইয়া যান, অথচ আস্বাদ-সুখ চলিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা বিমলানন্দ আর কি হইতে পারে।

অবতারগণ সকলেই পূর্ণপুরুষের অংশ শক্তি। তাঁহার ইচ্ছায় নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টিলীলা রক্ষা জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, স্বয়ং ভগবানের যে অবতরণ, তাহার নাম পূর্ণ অবতার। সে অবতারের কোন নিয়ম নাই, নির্দ্ধারিত সময়ও নাই। লীলাময় ভগবানের অবতারলীলা ইচ্ছা হইলেই, তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে; ভগবান কতকগুলি স্বরূপ-শক্তিতে পরিবৃত হইয়া মাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজমণ্ডলে নিত্যলীলা করিতেছেন; সে লীলার আদি নাই, অন্ত নাই এবং বিরামও নাই। এই সকল স্বরূপশক্তি আর কিছুই নয়, নিত্য-বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদাদি গোপ গোপীগণ; শ্রীদামসুবলাদি ব্রজবালক সকল; এবং শ্রীমতী রাধিকা-পরিবৃত ললিতাদি সখীনিচয়। সংসারাসক্ত লোকদিগকে অহেতুকী শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়া, ব্রজপ্রেমের অধিকারী করিবার জন্য, করুণাময় ভগবান, কারুণ্যপূর্ণ হইয়া, স্বেচ্ছায় সমস্ত স্বরূপ-শক্তির সহিত অবতরণ করিয়া থাকেন। এই পূর্ণ-অবতার-গ্রহণ

জন্য ভগবান পৃথক কোন বিগ্রহ ধারণ করেন না। যুগাবতারের যে সকল উপকরণ থাকে, তাহার অভ্যন্তরেই প্রকাশ হইয়া থাকেন। স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বাপরযুগের শেষে দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিবার জন্য যখন ক্ষিরোদশায়ী নারায়ণকে দেবকীর গর্ভে জন্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, গোলোকবিহারী দ্বিভুজ-মুরলীধর হরি সেই কালে কৃষ্ণবিগ্রহে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেমলীলা প্রকটিত করিলেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় অন্তহিত হইলেন।

পুনরায় যখন কলির প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িল, নীরসতায় ধর্ম্মজীবন কঠোর হইয়া গেল, অদ্বৈতাদি ভক্তগণ লোক-পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ক্রন্দনে, ভক্তবৎসল হরি থাকিতে পারিলেন না, তাই নিজে আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করত, গৌরদেহে অবতীর্ণ হইয়া কলির ধর্ম্ম, সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ, আরম্ভ করিয়া দিলেন। কলিযুগের যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য, চৈতন্যাবতারের এই মূল-কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহা আপক্ষাও গভীরতর অন্তরঙ্গ কারণ আছে। লীলা-ময় ভগবানের ইচ্ছাত্রয় পূর্ণ করাই সেই কারণ। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণের অভিন্নাত্মা হইয়াও বৃন্দাবন লীলায় পৃথক প্রকাশিতা। ভগবান পূর্ণানন্দ ও পূর্ণ-প্রেম হইয়াও ভক্তরূপিনী রাধাহৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে বিহ্বল ও উন্মত্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয়ভূমি (Subject), তিনি উহার বিষয় (Object)— আশ্রয় জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলে, বিষয় জাতীয় প্রকৃতিতে সে প্রেম-মাধুর্য্য আস্বাদন করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরাধিকার এই প্রেম-সুখ আস্বাদন করিবার উদ্দেশে ভক্তরূপিনী রাধা-প্রকৃতি লাভ করার জন্য, ভগবানের প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়তঃ ভগবানের মাধুর্য্যে এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী-শক্তি আছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভগবান নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার সেই পরানন্দও শ্রীরাধার আনন্দোচ্ছ্বাসের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়; রাধার স্বচ্ছ প্রেম-দর্শনে এই মধুরিমা প্রতিবিম্বিত হইলে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব-তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। এই মধুরিমার আকর্ষণী-শক্তি কিরূপ যাহাতে রাধাও বিহ্বল হইয়া যান? শ্রীরাধার প্রকৃতিতে অনুভব করিবার জন্য দ্বিতীয় ইচ্ছার উদ্গম হইল। গোপীদিগের নিঃস্বার্থ প্রেমসুখ আস্বাদন করিবার জন্য, তৃতীয় ইচ্ছার উৎপত্তি। যাহাতে আপনার সুখদুঃখ, সম্পদ বিপদ, মান অপমান, ভুলাইয়া ভগবানের চিরদাসত্বে নিযুক্ত করায়, নিজের ইন্দ্রিয়-সুখবিলাসের বাসনা

সমূলে উৎপাটিত করিয়া, প্রভুর প্রীতিসাধনে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়কুলকে ক্রীতদাসের ন্যায় অনুগত করায়, নিজের সুখসম্ভোগের বাসনা না থাকিলেও, নাথের প্রীতিসাধন হইলে আপনা হইতেই অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল আনন্দ-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে এবং সেই সুখাস্বাদনে বিহ্বল হইলে পাছে কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সে আনন্দ-সুখকেও অতি তুচ্ছজ্ঞানে দূরীভূত করিতে তৎপর করাইয়া দেয়; গোপী-প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলে, সেই গোপীপ্রেমাস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকিয়া ভক্ত-প্রকৃতির এই সব ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া লীলাবিহারী ভগবান শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি-পরিগ্রহ করিয়া গৌরদেহে অবতীর্ণ হইলেন। উহাতে ঈশ্বরভাব, রাধাভাব, গোপীভাব ও ভক্তভাব একত্র সমাবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব অবতার-লীলা প্রকটিত হইল এবং স্বয়ং শ্রীহরি নরহরি-রূপ ধারণ করিয়া, গৌরহরি-নাম ধারণপূর্ব্বক যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং উপরোক্ত ইচ্ছাত্রয়-সম্ভূত-মাধুর্য্যসুখ আস্বাদন করিয়া অচণ্ডালে অহেতুকী ভক্তিরস বিতরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবরূপিণী হ্লাদিনীশক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্না হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থ পৃথকশরীর হইয়া-ছিলেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুইটী স্বরূপ একীভূত হওত চৈতন্য-নাম প্রাপ্ত হইয়া এবং রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তিতে সুগঠিত হইয়া পুনরায় সম্মিলিত হইয়া-ছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রণয়-পরিমাণ কত? ভগবানের মাধুর্য্যরস,— যাহা রাধাই কেবল আস্বাদন করিতে সক্ষম, তাহাই বা কিরূপ? আর ঐ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাই বা কীদৃশ? এই তিনটী তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে, রাধার ভাব-অঙ্গীকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে উদয়-লাভ করেন।

শ্রীমৎ নিত্যানন্দই অখিলবাসী জীবগণের পরমাত্মারূপী; পালনকর্ত্তা-হেতু যিনি বিষ্ণুনামে খ্যাত এবং যিনি পৃথিবীর ভর্ত্তা, এমন যে ক্ষিরোদশায়ী পুরুষ, যাঁহার অংশের অংশ বিভাগরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং অনন্ত যাহার কলারূপে পরিগণিত হয়েন, তিনিই এই অবতারে অদোষদর্শী নিত্যানন্দ-নামে অভিহিত।— "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"। এবং যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর, তাঁহারই অবতার। শ্রীহরির সহিত অভেদত্ব হেতু তাঁহার নাম অদ্বৈত, ভক্তিপ্রকাশ করেন বলিয়া তিনি আচার্য্য, এবং তিনিই ভক্তাবতার।

ভক্তি-বীজকে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচনদ্বারা অঙ্কুরিত করিলে, তাহা হইতে

যে এক লতা উৎপন্ন হয়, সেই লতা বৃন্দাবনধামে হরিচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করতঃ প্রেমফল প্রসব করে। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তক উত্তোলন করে, তবে তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। লোভ, পূজা, স্বর্গকামনা, মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগণকে ছেদন না করিলে, মূল-শাখা বৃদ্ধি হয় না। মালী হইয়া এই লতা অবলম্বনপূর্ব্বক জীব প্রেমফল আস্বাদন করে। ইক্ষুরস ঘনীভূত হইলে যেমন তাহা হইতে মিছরি উৎপন্ন হয়, তেমনই সাধনভক্তি হইতে রতি, রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব,—এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক মাধুর্য্যরসে সকল রস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সেবাপরাধ, নামাপরাধ,—সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও যদি মনুষ্য হরিচরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তাহা হইলে সকল অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু যে নরাধম হরির নিকটও অপরাধী, সেও যদি কখন হরিনামের আশ্রিত হয় তাহা হইলে নাম-মাহাত্ম্যে ঐ অপরাধ হইতেও নিস্তার পায়।

সেবাপরাধ যথা :—শিবিকা আরোহণ বা পাদুকাসহ ভগবদ্‌গৃহে গমন; উৎসবের অকরণ; প্রণাম না করা; অশৌচে ভগবান বন্দন; একহস্তদ্বারা প্রণাম; সম্মুখে প্রদক্ষিণ, মূর্ত্তির অগ্রে শয়ন বা পাদ-প্রসারণ; পরস্পর কথোপকথন; বিবাদ, কাহাকেও নিগ্রহ; উচ্চভাষণ; অধোবায়ু পরিত্যাগ; অনিবেদিত ভক্ষণ; মূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন; অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন; বাদ্য না করিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন; পূজাকালে মৌনভঙ্গ; রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ ইত্যাদি।

নামাপরাধ যথা :—বিষ্ণুনাম হইতে শিবনামাদির পৃথক ভাব; গুরু-অবজ্ঞা, বেদনিন্দা, শ্রদ্ধাবিহীনকে নাম উপদেশ, নামে অপ্রীতি, নামার্থ কল্পনা, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবনিন্দা, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, শাস্ত্রনিন্দা—ইত্যাদি সকল নামাপরাধ।

"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং সম।
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রীয়াং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরিঃ॥"

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভিমান-ত্যাগ ও অন্যের সম্মান-সম্বর্দ্ধন করত হরিনাম কীর্ত্তন করিবে অর্থাৎ—

(a) Let not adversity and temptations bend thyself.
(b) Durst yourself of stiffening pride and hardening selfishness

(c) Do not seek your own glory, but the glory of your fellow brothers, and thus purified, take the name of God.

হে মহাপ্রভু, হে বিশ্বম্ভরদেব, হে প্রেমসিন্ধু, হে দীনবন্ধু, হে ভক্তচিন্তামণি, হে ভগবান, আমাদের হৃদয়নাথ হও, যেন তোমারই চরণে রতিমতি থাকে। তোমাকে বারবার ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে প্রণাম করি, ভব-বন্ধন মোচন করিয়া দাও, আর কি বলিব।

গীত।

এসহে গৌরহরি, ডাকে এই নরাধম জনে।
ঘিরেছে সপ্তরথী, নাই সারথী, হারাই বুঝি এ জীবনে॥
কেউ বা ভীষ্ম, কেউ বা কর্ণ, কেউ বা দ্রোণ, কেউ বিকর্ণ,
কেউ বা অশ্বত্থমার বর্ণ, দেখে ভয় পেয়েছি মনে।
যেন অভিমন্যু-বধের জন্য, সসৈন্য দুর্যোধন রণে॥
সাজিয়েছে অপূর্ব্ব ব্যূহ, যেন দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ,
দেখি নাই এমন ব্যূহ, এই যে মর্ত্ত্য-ভুবনে।
ব্যূহ ভেদ করিতে, এ জগতে, সাধ্য নাই সে পার্থ বিনে॥
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব, বাণের গুরু গুরুদেব,
কে করে পরাভব, সমকক্ষ আর দেখিনে।
আমি নিজে একা, কেউ নাই সখা, বাণে বাণ কাটি কেমনে॥
ন্যায়-যুদ্ধেতে পার্‌বে না, মনেতে ক'রে ধারণা,
তাই একত্র কয় জনা, প্রস্তুত হয় বাণ-বরিষণে।
আমি নিজে অসমর্থ, হয় অনর্থ, বাণ ব্যর্থ হয় যে বাণে॥
দীনাতিদীনের নিবেদন, ভারত-যুদ্ধেতে যেমন,
সারথী হয়ে তখন, রেখেছিলে পাণ্ডবগণে।
ওহে তেম্নি ক'রে, আজ আমারে, রাখ হরি শ্রীচরণে॥

গৌর-সর্ব্বস্ব
দীনাতিদীন শ্রীআনন্দগোপাল সেন।
কৃষ্ণনগর।

রূপানুরাগ।

কলসী ভরিতে নয়ন ভরিল

গোরারূপ তরঙ্গে।

ঘাট পথ বাট হেরি গোরাময়

আইনু ঘড়া ভেঙ্গে॥

নেত্রমণি-মেঘে বিদ্যুৎ লাগিয়া

চমকি চমকি উঠে।

শয়নে স্বপনে গোরারূপ-খানি

বুকেতে পশিয়া লুটে॥

জানিনু সই সুধায়ও অনল মাখা।

সেরূপ-অনলে ঝাল-পালা প্রাণ

(আমার) দায় হলো ধরে থাকা॥

সর্ব্বস্ব লুট নিল মোর গোরা

গোরায় সঁপিনু সব।

সখি, শোন শোন, অই যেন শুনি

মধুর মৃদঙ্গরব॥

শ্রীকালিহর দাস বসু ভক্তিসাগর।

ভাগ্যকুল, ঢাকা।

পাগল মানুষের কথা।

(পুণ্যবানের উদ্দেশে শাসন-বাণী।)

মহাপ্রভুর সেবায় পুণ্যবানগণের অধিকার নাই। নাম-সংকীর্ত্তন করিলে, পুণ্যবানগণের দশবিধ নামাপরাধ এবং বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ হয়। পুণ্যবানের ধর্ম্ম—জপধ্যান, উচ্চ-সংকীর্ত্তন নহে। মহাপ্রভুর সেবা করিতে হইলে ইহাদিগকে জাতি ত্যাগ করিয়া "তৃণাদপি" সুনীচ হইতে হইবে, কেন না, প্রেমের গতি নিম্নে, উচ্চ হইয়া থাকিলে ব্যঙ্গ করা হয়। কলির জীব সকলেই পাপী,

কেহই পুণ্যবান নহে। যাঁহারা পুণ্যবান বলিতেছেন, তাঁহারা বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

পুণ্যবান, পুণ্যদ্বারা ঐশ্বর্য্য-ধাম প্রাপ্ত হন, স্বয়ং ভগবানকে জানিতে পারেন না। মহাপ্রভুর সেবা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে পুণ্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইতে হইবে। মহাপ্রভু পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণ জীবকে উদ্ধার জন্য পরম-সত্য এক প্রকার পথ দেখাইয়াছেন, ইহাতে নানাত্ব বা কোন প্রকার তর্ক নাই। "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকটী সর্ব্ব-বর্ণেরই আচরণীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর "পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ"-

"মোর নাম যেবা লয় তার পাপ হয়।
মোর নাম যেবা লয়, তার পুণ্য ক্ষয়॥"

এই ভাব ভিন্ন, মহাপ্রভুর সেবা পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। কি মহারাজা, কি ব্রাহ্মণ, কি পণ্ডিত, সকলকেই এই আচার পালন করিতে হইবে। প্রেমের গতি যখন নিম্নে, তখন উচ্চে থাকিলে প্রেম পাওয়া যায় না, ইহা নিঃসন্দেহ।

পাগল মানুষের পত্র।

কলিকালের গতি বিপরীত। এই কালে কেহ পুণ্যবান থাকিবেন না, সকলকেই শরণাগত হইয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা দৈবকর্ত্তৃক নিহত হইতে হইবে। আপনারা যাহাকে পুণ্য মনে করিতেছেন, তাহা কেবল দাও মাত্র, উহাতে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় না। যাহাতে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। কলিকালে পতিতজাতি সুখে থাকিবে এবং পুণ্যবানগণ বিধ্বস্ত হইবেন। ভারতের দুই হাজার বৎসরের সাহিত্য দর্শন করুন। আপনাদের ধর্ম্মের উপর কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, যদি সত্বর ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার না হয়, তাহা হইলে পুণ্যবান উৎসন্ন হইবেন। যাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ-সেবা আছে, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রবৃত্তিমার্গে সাধন সকাম; ইহাতে ধনং দেহি, পুত্রং দেহি। নিবৃত্তিমার্গে নিষ্কাম ভাব, প্রয়োজন—প্রেম। নিবৃত্তিমার্গ ব্যতীত মহাপ্রভুকে জানিবার উপায় নাই। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে কোটি কোটি গৃহস্থ নিবৃত্তিমার্গে মহাপ্রভুর করুণা ও প্রেমলাভ করিয়াছেন।

প্রেমের সাধন, গৃহীরই হইতে পারে, সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ।—

"যুক্ত-বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥"

আমি আপনাদিগকে প্রেমদান করিবার জন্য অতিথি; একবার উন্মুখ

হইলেই বিশ্ব, প্রেমে প্লাবিত হইতে পারে। আমিও আপনাদের ন্যায় গৃহী, সন্ন্যাসীর বিচার আমি চাই না, কেবল চাই মহাপাপী। মূর্খ, চণ্ডাল, কুষ্ঠ, অন্ধ, খঞ্জ, পতিত সকলেই প্রেম পাইবার সমান অধিকারী। যিনি যত নিম্ন হইবেন, তিনি তত প্রেম পাইবেন। বড় হইতে হইলে ছোট হইতে হয়।

"বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহু দূর।"

আমার কথায় যাঁহার বিশ্বাস হইবে, তিনিই ধন্য হইবেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, প্রবৃত্তি মার্গীয়, উহাতে সংসারে যাতায়াত ঘুচে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া অচ্যুত গোত্র এবং দাস প্রভু সম্বন্ধ না হইলে, কোনরূপ নাম-সংকীর্ত্তন করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও, আবশ্যক ধন পুত্রাদি, মহাপ্রভু দিবেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে দেশ কাল বিচার নাই। অকৈতব নিষ্কাম হরিনাম সংকীর্ত্তন করুন, সত্য-পথে থাকিয়া শাস্ত্র-মত সত্য-কার্য্য করুন, আপনাদের ও আনুসঙ্গে জগতের মঙ্গল হইবে, আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সর্ব্বজীবের কল্যাণই আমার প্রার্থনা।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ভেদ নাই, সকলেরই এক প্রকার লক্ষ্য, এক প্রকার ধর্ম্ম, তবে, প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ এই তিন দশা ভেদ আছে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা প্রবর্ত্ত দশা, বহিরঙ্গ-সাধন; সকল জাতির সমান অধিকার, কার্য্য অনুসারে জাতিভেদ হইয়াছে, তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না, নিজ নিজ জাতিতে বিবাহাদি করুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু সকল জাতির ধর্ম্ম এক প্রকার।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম
তবেহ কিনা বিবেচে অন্য পতিবায়।"

ইহা স্বয়ং ভগবানের আজ্ঞা, পুণ্যবান নাম করিলে মহাপ্রভুকে অবজ্ঞা করা হয়। পুণ্যবান সগুণ, সগুণ জীব কোন প্রকারে নির্গুণ স্বরূপ-ভাবনা করিতে পারেন না, উহা নরলোকের অতীত, বাক্যমনের অগোচর,—"যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয় আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন।" শ্রীভগবান না জানাইলে কেহ জানিতে পারেন না। —যাহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বিশ্বাস নাই, তাঁহার মহাপ্রভু, সেবা বা নাম সংকীর্ত্তনে অধিকার নাই। মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কোন অবতার, নাম সংকীর্ত্তন প্রকাশ করেন নাই।

অন্তরঙ্গ-সাধন যাহা আছে, তাহা বাক্যমনের অতীত, সাধুসঙ্গে অনুভূত, উহা অত্যন্ত নিগূঢ়, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীল রামরায়ের ন্যায় অন্তরঙ্গ

ভক্ত ভিন্ন কেহ জানিতে পারেন না। পুরুষই হউন আর স্ত্রীলোকই হউন, আমাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে বর্ত্তমান রাসলীলা হৃদয়ে দর্শন করিয়া সদানন্দে বিভোর হইতে পারেন।

"গোপীভাব দর্পণ, তার আগে ক্ষণেক্ষণ, নব নব কৃষ্ণের মাধুর্য্য"—স্ফুরণ হয়; নিত্যলীলা সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান; অনুমানে মহাপ্রভুর সেবা করিবার উপায় নাই। বেদবিধির পারে পঞ্চমবেদ; বিধিশাস্ত্র লইয়া কোটি যুগ তর্ক করিলেও ব্রজেন্দ্র নন্দনকে বুঝিতে পারিবেন না।

ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় পুণ্যবানগণের অধিকার নাই। পূর্ব্ব মহান্তগণের প্রকাশিত সেবা, তাঁহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য আচ্ছন্ন করায় উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণগণ, বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রেম-সেবা করিতেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

আপনাদের শাস্ত্র লইয়া বিচার করুন; সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য তিনে এক করুন, তাহা হইলেই সমুদয় সংশয়চ্ছেদ হইবে এবং আপনাদের বিশেষ মঙ্গলই হইবে। আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনাদের সহিত সমুদয় শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রস্তুত। আমি গোপনে বা চুরি করিয়া বলি নাই। একটিবার সম্মুখ যুদ্ধ হইলেই আপনাদের ধর্ম্মের মীমাংসা হইবে; নতুবা ভ্রম-সংশোধন হইবে না; অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রমে সেই হরিনাম করিতেছেন; অথচ একটিবার মুখ ঘুরাইলেই অমৃত-বর্ষণ হয়, তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রেমের এইরূপই কুটীল গতি, সমুদায়ই বিপরীত।

আমি আপনাদিগকে যোগ্যাযোগ্য বিচার করি নাই;—"অযাচিত বিতরহি দুর্ল্লভ প্রেমফল।" ইহাতে, মনুষ্যমাত্রেরই এবং পশুপক্ষী, স্থাবর জঙ্গমের সমান অধিকার। সকলেরই এক পথ। প্রেমরাজ্য অতি সুন্দর রাজ্য; একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলেই পান। কাঁধে কুঠার করিয়া বন হাতড়াইলে উদ্দেশ পাইবেন না।

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্র লইয়া বিচারপূর্ব্বক কলিযুগের যুগধর্ম্ম স্থাপন করুন; মনুষ্য জন্ম সার্থক জ্ঞান করিবেন। নতুবা কোন প্রকারে বুঝিতে পারিবেন না—

"প্রাপ্ত-রত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,"

পরিণামে ভীষণ যাতনা ভোগ করিবেন। শ্রী:—

"সোণামুখী গরীবভাণ্ডার"॥

রাঙ্গা পা দুখানি।*

—০:০—

(লাল টুক্‌টুক্)

ভক্ত কহে,—কহ কবি, শুনিতে কৌতুক,—
কোন বস্তু সর্ব্বোত্তম—"লাল টুক্‌টুক্?"

কবি কহে—
উষার অরুণ-ভাতি, চারু দরশন।
নিরখি' সকলে হয়, আনন্দে মগন॥
নির্ম্মল আনন্দ আসে, ভরি উঠে বুক্।
এ বড় সুন্দর দৃশ্য,—"লাল টুক্‌টুক্।"

ভক্ত কহে,—
ইহা নহে; কহ কবি, শুনিতে উৎসুক্।
কোন্ বস্তু সর্ব্বোত্তম? "লাল টুক্‌টুক্॥"

কবি কহে,—
সরোবরে বিকশিত, রক্ত শতদল।
মধ্যাহ্ন কিরণে, কিবা। করে ঝলমল॥
যাহার দর্শনে,—ভাবে, বিভোর ভাবুক্।
সে বড় সুন্দর দৃশ্য,—"লাল টুক্‌টুক্॥"

ভক্ত কহে,—
তাহা নহে, কহ কবি শুনি পাই সুখ্।
কোন্ বস্তু সর্ব্বোত্তম? "লাল টুক্‌টুক্।"

কবি কহে,—
ভক্তজন মনোলোভা, রক্ত-জবা ফুল্।
মন্দার নহে যার সহ তুল্॥

---

* আমার প্রেমময় দাদা শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয়, এ দীনের রচিত "লাল টুকটুক" শীর্ষক একটী কবিতা পাঠে এবং "রাঙ্গা পা'দুখা'নি"র স্মরণে, তাঁহার সরল ও পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছাস স্বরূপ, এই অতি উপাদেয় কবিতাটি লিখিয়া আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

অতীব আনন্দ-সহকারে এই কবিতাটি, "আনন্দে" প্রকাশিত হইল।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
সোণামুখী—গরীব-ভাণ্ডার।

হেরিলে হরিয়া লয়, মরমের দুখ্‌।
সে বড় সুন্দর দৃশ্য "লাল টুক্‌টুক্‌॥"

ভক্ত কহে,—
ইহা নহে; কহ কবি, আর একটুক্‌।
কোন্‌ বস্তু সর্ব্বোত্তম ?—"লাল টুক্‌টুক্‌ ?"

কবি কহে,—
কামিনী কপালে শোভে সিন্দুরের বিন্দু।
রক্তিমা রঞ্জিত যথা, পূর্ণিমার ইন্দু॥
সাধু জনে নিরখিয়া মনে পায় সুখ।
এ বড় সুন্দর দৃশ্য, "লাল টুক্‌টুক্‌॥"

ভক্ত কহে,—
ইহাতে কি জুড়াইবে রসিকের বুক্‌ ?
কোন বস্তু সর্ব্বোত্তম—"লাল টুক্‌টুক্‌ ?"

কবি কহে,—
গৌরীপুত্র গণেশের বরণ হিঙ্গুল।
সবে কহে, যে বরণ জগতে অতুল॥
সুর-নরে অগ্রে যার পূজায় উন্মুখ।
ঠাকুর গণেশ বড় "লাল টুক্‌টুক্‌॥"

ভক্ত কহে,—
ইহাতেও উঠিবে না রসিকের মুখ্‌।
কোন্‌ বস্তু সর্ব্বোত্তম—"লাল টুক্‌টুক্‌ ?"

কবি কহে,—
ভক্তের বাঞ্ছিত ধন, "রাঙ্গা পা'দুখানি।"
রসিক উন্মত্ত যার, পরশ বাখানি॥
যাহার স্মরণে নাশ, রোগ শোক দুখ।
সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম,—"লাল টুক্‌টুক্‌॥"

ভক্ত কহে,—
এই সত্য এই সত্য আর কিছু নয়।
যাহার স্মরণে হয়, শুদ্ধ প্রেমোদয়॥
শুনিয়া রসিক ভক্ত, আনন্দে অধীর।
দর দর দু'নয়নে, বহে প্রেমনীর॥

"রাঙ্গ পা' দুখানি" বিনে আর কিছু নাই।
কাঙ্গাল বিজয় বলে যুগে যুগে চাই ॥

দীন—শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।
ময়মনসিংহ।

দর্শনে ঈশ্বর-সিদ্ধান্ত।

——:০:——

হিন্দু-দর্শন ছয়খানি।* যথা—সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত। এখন যেমন জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন চলিতেছে, প্রাচীনকালে এইরূপ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা চলিয়াছিল। এই আলোচনার ফলই ষড়্দর্শন। এ ব্যাপারে সাংখ্যকার "কপিল"কেই অনেকে অগ্রণী মনে করেন। আবার কেহ কেহ বৈশেষিকেরও পক্ষ সমর্থন করেন। প্রথম মতের আদর বেশী। সে যাই হউক,—মোটের পর বলা যায়, প্রায় তুল্য ছয়টী মস্তিষ্ক হইতেই ষড়্দর্শন প্রসূত হইয়াছিল।

যাঁহারা সংসারে সহস্র কাজে ব্যস্ত আছেন, দশ সের জিনিস হাতে উঠাইয়া লইতে শ্রম বোধ করেন না, কিন্তু দুই দণ্ড গ্রন্থপত্র উৎঘাটন করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন, তাঁহাদের অবগতির জন্য এখানে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুইচার কথা কহিব। তত্ত্বজ্ঞ পাঠক,—আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

ঐ শ্রেণীর সংসারাসক্ত ব্যক্তিরা দর্শনের আসে পাশে না গেলেও, দর্শন সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, সেই অপ্রত্যক্ষ বস্তুটী (ঈশ্বর) দর্শনের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিলেই, ঈশ্বর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। বাস্তবিক ইহা আমাদের কল্পিত কথা নয়, এরূপ স্থূল বুদ্ধির লোক অনেক আছেন যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রটাকে ঈশ্বর দর্শনের Telescope অর্থাৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বোধ করেন। এমনও দেখা যায়, একজন পাঠার্থী যদি বলে যে "আমি দর্শন অধ্যয়ন করি," শুনিয়া তাঁহারা কতই আনন্দ প্রকাশ করেন!

---

* ছোটখাট আরও দর্শন থাকিলেও ছয়খানিই প্রসিদ্ধ।

সাধুবাদের তো কথাই নাই, পাইলে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ করেন! আমরা দুঃখের সহিত ঐ সকল সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শনকারেরা অকাট্য যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আদৌ ঈশ্বর সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহারা তত লালায়িতই হয়েন নাই। দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে আত্মতত্ত্ব-নির্ণয়। আমি কে? এই কথাটী জানিবার জন্য, দর্শন যে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারাবাহিক স্তর নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। কিন্তু প্রসঙ্গস্থলে, অদৃষ্ট বা কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ তাঁহারা দেখিলেন যে দৈহিক সংস্রবের দিক দিয়া কষ্টের আর নিবৃত্তি নাই। যাহাই সুখ বলিয়া ধরা যায়, তাহাই দুঃখের দাগ্ রাখিয়া চলিয়া যায়! তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে সংসার দুঃখময়। আবার শরীরে আঘাত পাইলেই কি, মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেই কি, তাহা অনুভব করিবার সময় তাঁহারা যেন বুঝিলেন, দেহ মনের অতীত কি একটা পদার্থ তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে। ঐ পদার্থ টাকেই তাঁহারা আত্মা বা "আমি" স্থির করিয়া লইলেন। সংসার দুঃখপূর্ণ, আর 'আমি' দেহাতিরিক্ত পদার্থ, এই দুই তত্ত্ব যখন তাঁহাদের বুদ্ধি গোচর হইল, তখন তাঁহারা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার ফল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিরূপে ধরা দিয়া তাঁহাদিগকে দার্শনিক গবেষণার শেষ-সীমায় পৌঁছাইয়া দিল। এইখানেই তাঁহাদের সকল উদ্যম পর্য্যবসিত হইল। সংসার দুঃখময়, আমি দেহ-মন হইতে স্বতন্ত্র, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি,—এই তিনটী কথা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহারা যে অত্যদ্ভুত চিন্তা প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পৃথিবীর লোকে চক্ষু-স্থির হইয়া গিয়াছে! ভারতের সেই সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার দর্শন-সম্পদ থাকা পর্য্যন্ত, অন্যাপেক্ষা আপনাকে তাহার দরিদ্র মনে করিবার কারণ নাই।

এখন দেখাইতে চাই যে, দর্শন সেই অব্যক্ত বস্তুটীর (ঈশ্বরের) দিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শনকার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এমন কি ঈশ্বর আছেন কি নাই, এবিষয়ে স্পষ্ট উক্তি কোন দর্শনেই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ঈশ্বরশব্দটী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। সাংখ্যকার 'কপিল' একটু সৎসাহস দেখাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ";—অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ। একথা যাঁহারা সরলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন,—

'কপিল' ঈশ্বর নাই এমন কথা বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন 'ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়া উঠা যায় না'। যাঁহারা বক্রপথে গিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন 'কপিল' ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন। বৈশেষিক 'কণাদ' বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের সময় বলিয়াছেন, "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" অর্থাৎ তাঁর বাক্য বলিয়া বেদ প্রামাণ্য। তাঁর—কার? এইখানে কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, কেহ কেহ একথার প্রতিবাদও করেন। ফল কথা "পেটে খিদে মুখে লাজের" মত মহর্ষি 'কণাদ' এই প্রচ্ছন্ন-নীতিরই প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন! ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম প্রথম "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ" এই সুর উঠাইয়া ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, সেই কর্ত্তা হইলেন অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল। তবে কর্ম্মফলকে ঈশ্বরের অধীন রাখিয়া ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের একটু মর্য্যাদা বাড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বীজানুসারে ফলের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ জীবের সম্পূর্ণ অদৃষ্ট সাপেক্ষ। ঈশ্বর প্রদাতা মাত্র। যাহা হউক ইহাও সৌভাগ্য যে ন্যায়ের উদ্দাম-বন্যায় ঈশ্বর সমূলে উৎপাটিত হয়েন নাই। কোন্ ঠেসা হইয়া থাকিলেও, ন্যায়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 'পতঞ্জলি' ঠাকুর তাঁহার পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর এই কথাটী স্পষ্ট উচ্চারণ করেন নাই। তবে সাধারণ পুরুষ (আত্মা) ছাড়া তিনি একটী বিশেষ পুরুষের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যোৎপন্ন ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত যিনি সম্বন্ধশূন্য, তিনিই 'পতঞ্জলির' বিশেষ পুরুষ। এই বিশেষ পুরুষ নির্দ্দেশ দ্বারাই 'পতঞ্জলি' ঈশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মীমাংসক 'জৈমিনি' বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উপাসক ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া বেদ-মন্ত্রকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া গিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানবাদীদের নিকট 'জৈমিনি' নাস্তিক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। তবু বেদের নিত্যত্ব স্বীকারের জন্য এবং 'ব্রহ্মাপীতি-চেৎ" এই সূত্রটী প্রণয়নের জন্য, মীমাংসাকে হিন্দুদর্শনের পঙক্তিতেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখন বেদান্তের কথা বলিব। বেদান্তের আত্মজ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। আত্মাকে বুঝিলেই জীব ব্রহ্মকে বুঝিবে, তাহা না বুঝা পর্য্যন্ত জীবের সংসার-দুঃখ উদ্‌যাপন হইবে না। মুখ্যতঃ এই আত্মবিবেক জন্মাইবার জন্য, বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করা হইয়াছে। বেদান্ত চরম জ্ঞানমার্গ।

উহাতে বুঝিবার কথা অনেকই আছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে, বেদান্তের ব্রহ্মে যেন একটু বিশেষ ধর্ম্মই নিহিত রহিয়াছে। সেই ধর্ম্ম বলেই বেদান্তের দিক দিয়া শৈব ও বৈষ্ণব মতের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বৈতই হউক, অদ্বৈতই হউক, বা দ্বৈতাদ্বৈত মূলকই হউক, বেদান্ত ঈশ্বর-সিদ্ধান্তে কাহাকেও বাধা প্রদান করেন না। তবে সংসারী-মানব স্বীয় বিবেক বুদ্ধি প্রভাবে সোম সূর্য্য শোভিত, জল স্থল সমন্বিত পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া, যেরূপ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করে, সেরূপ সগুণ-ঈশ্বরের বেদান্তে কোন স্পষ্ট সমাধান লক্ষিত হয় না। অতএব আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি তাদৃশ ঈশ্বর-সিদ্ধান্তে ষড়্‌দর্শন অত্যন্ত কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একদিন এই অনুশোচনা মূলে লিখিয়াছিলাম ঃ—

'শ্রুতি'তে প্রথম প্রতীত তুমি
"অবাঙ মনসোগোচর,"
'উপনিষদে' প্রচারে পুনঃ
তুমি বিরাট ঈশ্বর!
কহে 'দর্শন' বিমল হর্ষে—
কর্ষণ করিয়ে ক্ষেত্র,
নির্গুণ পরম আত্মা তুমি
নাহিক শ্রুতি ও নেত্র!
পশ্চাতে দেখি 'পুরাণে' বাখানে
তোমার সাকার ক্রম,
সচ্চিদানন্দ রস বিগ্রহ
ত্বংহি পুরুষোত্তম!!

যুগলাবাহন।

(১)

এস এস এস সোনার গৌরাঙ্গ!
এস নদীয়ার মাঝেতে।
নদীয়ানাগর, নব নটবর,
ত্রিলোক মোহন সাজেতে॥
তোমার বিহনে নদীয়াবাসীর,
কি দশা হ'য়েছে আকুল অধীর,
(ওগো) নদীয়ানগরে, ঘরে ঘরে ঘরে,
প্রদীপ জ্বলে না সাঁঝেতে।
এস এস এস নদীয়ার প্রাণ!
এস নদীয়ার মাঝাতে॥

(২)

এস এস এস সোনার ঠাকুর!
সোনার সংসারে এস হে।
সোনার কমল, প্রিয়ারে লইয়ে,
শচীর অঙ্গনে বসো হে!
এস নদীয়ার পরিপূর্ণ-শশি!
আর কতদিন রহিবে সন্ন্যাসী,
হাহাকার করে নদীয়া-নিবাসী,
পুড়ে ম'ল তব বিরহে।
এস এস এস সোনার নিমাঞি!
সোনার সংসারে এস হে!

(৩)

এস এস এস শচীর তুলাল!
শচীমা'র বুক জুড়া'য়ে।
বামে বিষ্ণুপ্রিয়া, যুগল হইয়া,
মাধুরী ছড়ায়ে॥

প্রাণের পরাণ নিজ জন ফেলে,
আর কতদিন র'বে নীলাচলে,
হরি হরি বলে এস বাহু তুলে,
নাচিয়ে, জগত নাচায়ে।
এস এস এস শচীমা'র প্রাণ!
শচীমা'র বুক জুড়ায়ে॥

(৪)

এস এস এস—এস মা আমার!
নাথ-বামে বসো সরলে!
আঁধার নদীয়া উজল হউক,
নেহারি' নদীয়া-যুগলে॥
উজলি শচীর সোনার অঙ্গন,
আবার আবার বসো মা দু'জন,
হেরি ত্রিভুবন শীতল হউক,
লুটায়ে চরণ শীতলে।
কৃষ্ণদাসী-প্রাণ! গৌর! এস হে!
নদীয়ায় বসো যুগলে॥

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।
শ্রীবৃন্দাবন, কেশীঘাট।

নিঠুরালি।

(২)

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিবেন, একথা শুনিয়াই ভক্তদের অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাকেও বিদায় লইতে বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি নর-লীলাতেও যোগমায়ার সাহায্য ব্যতিরেকে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, লোক পরম্পরায় এই কথা শুনিয়া শচীদেবীর কি অবস্থা হইল, তাহা কলির ব্যাস বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন:—

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল, না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥
না যাইও না যাইও বাপ, আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীব আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া॥

*　　　　*　　　　*

*　　　　*　　　　*

পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ, তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম-শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥

বাপ, আমি অনেক শোক পাইয়াছি। আমার প্রাণ অতি কঠিন। তাই এ সকল শোকে দেহ পরিত্যাগ করে নাই। তোমার মুখ দেখিয়া আমি সকল শোক ভুলিয়াছি। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। তুমি কেবল আমার ভবনের আনন্দ নহ, তুমি নদীয়ানন্দ। তুমি অনাথিনীকে ত্যাগ করিও না।

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
　　অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়।
সভা লয়ে কর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন,
　　নিত্যানন্দ আছেন সহায়।

প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি
বচনেতে অমিয়া বরষে।
বিনি দীপে ঘর মোর তোমার অঙ্গেতে উজোর
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বৈসে॥
প্রেম-শোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে বসি
রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সুখদাতা সদানন্দ
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥

এই মত বিলাপ করয়ে শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥
বিবর্ণ হইল শচী অস্থিচর্ম্ম সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখে জননীর জীবন নাহি রহে।
নিভৃতে বসিয়া তাঁরে গোপ্য কথা কহে॥

প্রভু বলিতেছেন, মা, তুমি তোমার মন স্থির কর! আমি চিরকাল তোমার পুত্র। তুমি পৃশ্নি, অদিতি, দেবহূতি, কৌশল্যা ও দেবকীরূপে আমার জননী ছিলে।

এই মতে তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব সর্ব্বথা॥

এই সব তত্ত্ব কথা কহিয়াও প্রভু মাকে ছলিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসে যাইবার দিন প্রভু দেখিলেন মাতা দুয়ারে বসিয়া আছেন। তখন

জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান্ কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর॥
"বিস্তর ক'রিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলে ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার॥

তোমার সাদ্গুণ্য যে তাহার প্রতিকার।
আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শাস্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান্ ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে কাত॥
দশ দিন অন্তরে কি এখানে বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব ব্যবহার॥"

কারুণ্য পারাবার প্রভু এত করিয়াও মাকে বুঝাইতে পারিলেন না। প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া তাঁহাতে আর তিনি নাই। বুঝিবার কর্ত্তা যে মন, তাহাও স্থির নাই, সংজ্ঞাও নাই। প্রভু দেখিলেন মা'র হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার ব্যতীত এ সব প্রবোধের কোন মূল্য নাই। সুতরাং

বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
"তোমার সকল ভার, আমার আমার॥"

প্রভু স্পর্শদ্বারা মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের ন্যায়, মাতার চৈতন্যোৎপাদন করিলেন, তথাপি—

যত কিছু বোলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কাঁদে অঝুর নয়নে॥

শ্রীবাস আসিয়া এই অবস্থা দর্শন করিলেন।

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"আই কেনে রহিয়াছে বাহির দুয়ার॥"
জড় প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥

তার পর, যখন ভক্তগণ শুনিলেন যে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন সমগ্র নদীয়াতে যে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহা বৃন্দাবন দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া॥

কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥
কিবা মোর ধনজন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥
মাথায় দিয়া হাত বুকে করে নির্ঘাত
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সভা না বলিয়া
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কাঁদে মুকুন্দ মুরারি
শ্রীপর গঙ্গাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত তাঁরা কাঁদে অবিরত
শ্রীআচার্য্য, কাঁদে হরিদাস ॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ সবে পায় মহাশোক
কাঁদে সব মাথে হাত দিয়া ॥
নাগরিয়া যত ভক্ত তারা কাঁদে অবিরত
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে নয়নের জলে ভাসে
নিমাইরে না দেখিমু আর ॥

ইহার পর প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন বলিয়া, কেশবভারতীর নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন কাটোয়ার জনগণ বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহাশোক ॥
কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজ তার পোহাইল কি কাল-রজনী ॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি ॥
আমা সবাকার প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিবে কি মতে?

এই মতে নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
সর্ব্বলোক পড়িলেন চৈতন্যের ফাঁদে॥

এইরূপে সমস্ত কণ্টকনগরী, শোকের বন্যায় প্লাবিত করিয়া প্রভু শিরোমুণ্ডন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥
ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমেতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কাঁদিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহ বলে কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কাঁদে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥

একে একে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে হইলে, স্থান বা সময়ে কুলাইবে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রভু আমার বড়ই কঠিন, এই সন্দেহ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতই ভক্তের মনে আসিতে পারে।

লীলারসের এই সব নিষ্ঠুর লীলার আলোচনা করিয়াই উদ্ধবের নিকট গোপীগণ বলিয়াছেন :—

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিধ্যতে লুব্ধ ধর্ম্মা
স্ত্রিয় মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাম যান্নাম্,
বলিমপি বলিসত্ত্বা, চেষ্টয়দ্ধাঙ্ক্ষ বদ্ য
স্তদল মপিত সখ্যৈর্দুস্ত্যজ্যস্তৎ কথার্থঃ।

ভাঃ ১০।৪৭।১৭

অকারণ ক্রূর যিনি রাম অবতারে,
করিলেন বালি বধ কিরাত স্বরূপ।
কামাভিলাষিণী 'শূর্পনখা' রাক্ষসীরে,
সীতা পরতন্ত্র হয়ে করিলা বিরূপ॥

বলিদত্ত বলি খে'য়ে সেই শঠাচার।
বাঁধিলা বলিকে, তাঁর সখ্যে নমস্কার !!

ভাগবতের এই শ্লোকেরই অনুকরণ করিয়া এক প্রাচীন কবি গাহিয়াছেন—

সর্ব্বস্বদং বলের্ম্মদং হরসিচ্ছলেন
প্রাণাধিকাং বিদেহজাং বিপিনে জহাসি,
উৎপাদ্য যাদব কুলং স্বয়মেব হংসি
কস্ত্বাং স্মরেৎ যদি পুনঃ কালভয়ং নচাস্তে !
সর্ব্বস্বদ বলিরাজে করিলে ছলন।
প্রাণাধিকা সীতারে করিলা বিসর্জ্জন ॥
আপন যাদব কুল নিজে কর ক্ষয়।
কে তোমা স্মরিবে হরি বিনে কালভয় ?

লীলায় যাঁহারা শ্রীভগবানকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রেমিক ও ভক্ত। যাহার যে জিনিষ নাই, সে যেমন সেই জিনিষ হারাইতে পারে না, তেমনি যিনি তাঁহাকে পান নাই, তিনি তাঁহাকে নিঠুর বলিতে পারেন না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি কেহই অভিমান পোষণ করিতে পারে না। ভক্তগণ অভিমান করিয়াই তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন এবং কেবল তাঁহাদেরই নিষ্ঠুর বলিবার অধিকার আছে। নতুবা তুমি আমি যাহারা তাঁহার অজস্র করুণাধারা নিরন্তর ভোগ করিতেছি, আমরা কখনই তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারি না। পরন্তু দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় বলিতে হয়—

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজন্
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন,
তে তে গতা বিষ্ণু পুরীং প্রয়াতাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ।
হে রাজন্ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যের নাথ।
চক্রধারী যাহাদিগে করেন নিপাত ॥
তাঁহারাও বিষ্ণুপুরে করিছে প্রয়াণ।
শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধও দেখ বরের সমান ॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

এষাং ঘোষ নিবাসিনাং মুত ভবান্ কিং দেব রাতে তিন,
শ্চেতো বিশ্ব ফলাৎফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি।

সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেব্য পিতা,
যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয় স্তৃৎ কৃতে॥
দ্বেষকারী পূতনাদি রাক্ষসের কুল।
পেয়েছে তোমাকে দেব সর্ব্বধর্ম্ম মূল॥
তোমা হ'তে আর কোন্ শ্রেষ্ঠফল আছে।
বিলাইবে যাহা গোপগোপিনীর কাছে॥
তাহারাও ধর্ম্ম অর্থ দেহ প্রাণ মন।
তোমাতেই করিয়াছে চির সমর্পণ॥

ফলতঃ ভগবানের দয়ার কথা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাতো দিতেছেনই, প্রয়োজনের অতিরিক্তও বহুতর জিনিষ দিয়াছেন। এত দিবার পরও যখন আমরা অত্যাচার করিতেছি, তখন তিনি অম্লান বদনে ক্ষমা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

একদা কোন মুনির আশ্রমে এক অশীতিপর বৃদ্ধ অতিথি হয়েন। বৃদ্ধকে ক্ষুৎপিপাসাতুর ও ক্লান্ত দেখিয়া, মুনি সত্বর ও সযত্নে তাহার শ্রমাপনোদনের ব্যবস্থা করতঃ, বন্য ফলমূল ভোজন করিতে দিলেন। বৃদ্ধ উহা প্রাপ্তি মাত্র ভগবানকে নিবেদন না করিয়াই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধের এই অনাচার দর্শনে মুনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে গলহস্ত দিয়া আশ্রম হইতে বহিস্কৃত করিতে উদ্যত হইলেন। অতিথি সর্ব্বদেবময়। তিনি যদি বিফল মনোরথ হইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যান তবে আশ্রমীর মহাপাপ হয়। কারণ শাস্ত্রে আছে :—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে
সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা, পুণ্য মাদায় গচ্ছতি।

যে ভবন হ'তে, ভগ্নো মনোরথে,
অতিথি চলিয়া যায়।
নিয়ে পুণ্য ভার, গমন তাঁহার,
গৃহী তাঁর পাপ পান॥

মুনিবরের চিরাচরিত পুণ্যরাশি, মূহুর্ত্তের ক্রোধে নষ্ট হইতে দেখিয়া, ভগবান আবির্ভূত হইয়া, মুনিকে তাহার অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। মুনি বলিলেন "প্রভো, এ ব্যক্তি ঘোর অনাচারী। নিবেদন

না করার অপরাধ, ইহার ক্ষমা যোগ্য নহে। প্রভু স্মিত বক্তে, বনভূমি আলোকিত করিয়া কহিলেন যে, "আমি আজ ৮০ বৎসর যাবত ইহাকে ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, আর তুমি একদিন পার না?

আমাদের কথা বিবেচনা করিতে গেল; প্রভু, ৮০ বৎসর কেন, তুমি আমাদিগকে ৮০ লক্ষ জন্ম ক্ষমা করিয়া আসিতেছ! যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই! তোমাকে কেহ নিষ্ঠুর বলিতে পারেন কি?

প্রভু আমার জগতের রাজা কিন্তু প্রেমের ভিখারী। তবে তাঁহার অন্ত-রঙ্গ ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে অভিমান করিয়া যে, তাঁহাকে নিষ্ঠুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহা প্রেমের উৎকর্ষতা প্রদর্শন মাত্র। উহা তোমার আমার মুখে সাজে না।

প্রভু গো! তোমাতে নিষ্ঠুরতার অপবাদ যে দেওয়া যায় না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমি তন্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, শিক্ষা জানি না, দীক্ষা জানি না, সাধন জানি না, প্রেম জানি না, ভক্তি জানি না, জ্ঞান জানি না, কর্ম্ম জানি না, কেমন করিয়া ডাকিলে যে তুমি সাড়া দিবে, সে ডাকও আমি জানি না। আশী লক্ষ যোনিতে জরা মরণ ও জনন যাতনা ভোগ করিয়া আসিতেছি। এই অনন্ত জীবন যাত্রার সীমাহীন পথে, বিষয় আতপের বিষময় জ্বালায় তাপিত হইয়া তোমারই দুটি শীতল চরণ ছায়া যাচাঞা করিতেছি। প্রভু, আর নিঠুরালী করিও না। তোমার নিজ দাসকে চরণ ছায়া দান কর। *

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ, বি, এল।
রাজসাহী।

---

* রাজসাহী বৈষ্ণব-সভায় পঠিত।

প্রার্থনা।

(চির-জীবনের আশ)।

"গৌরাঙ্গ" বলিয়া, পরাণ ত্যজিব,
চির-জীবনের আশ।
মিটাবে কি তাহা, গৌর ভগবান্!
পুরাবে কি অভিলাষ॥

গৌর হে!

কোন আশা নাই, কিছুই না চাই,
চাই এই বর-দান।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, কান্দিতে কান্দিতে,
যায় যেন মম প্রাণ॥
মানব জনম, বিফলে কাটানু,
না লইনু তব নাম।
(আমি) বিষয়ের বিষে, মজিয়ে সতত,
করি শুধু অভিমান॥

গৌর হে!

(তোমায়) দিনান্তে বারেক, ডাকিতে পারি না,
অকপটে হৃদি খুলে।
জীবনে হ'ল না, প্রেমের উদয়,
অঙ্কুর নাহি যে মূলে॥
কি হ'বে আমার, বল দয়াময়।
দিন গেল মোর বৃথা।
যত দিন যায়, ততই বাড়িছে,
আমার মরম ব্যথা॥
কাহাকে বা বলি, কেহ না শুনিবে,
কোথা গেলে বাঁচে প্রাণ।
(তাই) মরিতে বাসনা, হ'য়েছে আমার,
গেয়ে তব নাম গান।

জীবনে হ'ল না মরিলে হ'বে কি ?
নামে রুচি তব নাথ !
গৌর-ভকত ! সকলে কর গো,
(মোর) মাথায় চরণাঘাত ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, জীবন ত্যজিব,
এ বড় উচ্চ আশা।
হ'বে কি কপালে, এ হেন সুদিন,
হরি যে কর মনাশা ॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

কেশীঘাট, শ্রীধামবৃন্দাবন।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আনন্দ।

ব্রহ্ম।

———০:*:০———

তোমার মহিমা মলিন না হবে
থাকিতে চন্দ্র সূর্য্য,
তোমার নামে অবনী কাঁপায়ে
ধ্বনিবে সতত তূর্য্য!
তোমার প্রেমের সুষমা লইয়া
ফুটিবে যতেক পুষ্প,
তোমার তরে বিতত রহিবে
সৈকতে শ্যামল শষ্প!
তোমার উদ্দেশে ধাইবে তটিনী
উচ্ছ্বাস করিয়ে ব্যক্ত,
তোমার ধ্যানে পুলক ভুঞ্জিবে
ভুবনে অযুত ভক্ত!
তোমার স্মৃতিতে ব্যাপ্ত থাকিবে
বিশ্বের প্রতি মর্ম্ম,
সত্য জ্ঞানানন্দ তুমি
ত্বং হি অদ্বৈত ব্রহ্ম!

ভক্ত ভাইয়া দৈবকীনন্দন

—o‡*‡o—

মধু লইয়াই মধুকরের সম্পর্ক। বনে হউক, উপবনে হউক, উদ্যানে হউক, প্রান্তরে হউক, পুকুরে হউক, তড়াগে হউক—যেখানে ফুলের গন্ধ পাইবে, মধুকর পাগল হইয়া সেইখানেই ছুটিবে। আর পাঁচফুলের মধু লইয়া বিচিত্র মধুচক্র রচনা করিবে। মকরন্দ পানে নিজে ধন্য হইবে, জগজ্জীবকেও কৃতার্থ করিবে।

সুদূর বোম্বাই প্রদেশস্থ ভক্ত-মধুকর শ্রীল নাভাজী মহারাজ নানাস্থান হইতে পঞ্চরস ভক্তিপুষ্প সংগ্রহ করিয়া, অতি অপূর্ব্ব মধুচক্র—"ভক্তমাল"-গ্রন্থ রচনা করিয়া, নিজে আনন্দে ভরপুর হইয়াছেন, আর সেই অফুরন্ত মধুভাণ্ডার পাইয়া, ভক্ত-ভৃঙ্গাবলী অদ্যাপিও আনন্দে মধুপান করিতেছেন! আর ভক্ত-গুণগানে জগৎ মুখরিত করিতেছেন! তাপদগ্ধ জগজ্জীব সেই ভক্তিরসামৃত-পানে কৃতার্থ হইতেছে! 'শ্রীভক্তমালের' মঙ্গলাচরণেই ভক্তমহিমা চূড়ান্তরূপে কীর্ত্তন করিয়া, নাভাজী মহারাজ বলিতেছেন :—

ভক্ত, ভক্তি, ভগবন্ত, গুরু—চতুর নাম বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন ক'রে নাশে বিঘন অনেক॥

ওগো, এক দেহীরই চারি নাম,—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান ও গুরু। অতএব ভক্তচরণ আশ্রয় কর, সব বিঘ্ন ভয় ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। সম্প্রতি আমরা সেই ভক্তেরই আশ্রয় লইলাম।

আধুনিক সুবৃহৎ মানচিত্রে যাঁহার স্থান হয় নাই, কোন ভূগোল ইতিহাসেও যাঁহার নাম খুঁজিয়া মিলে না, কি জন্য জানি না, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সুদুর বোম্বাই প্রাদেশের সেই প্রাদেশিক ভাষায় বিলিখিত, অধুনা কীটদষ্ট-গ্রন্থে আমাদের "জামালপুরে"র নাম উজ্জ্বল অক্ষরে বিরাজিত রহিয়াছে। বাস্তবিক যাহা থাকিলে—লৌকিক জগতে জয়ঢক্কা নিনাদিত হয়, 'জামালপুরে'র তাহা কখনও ছিল না, এখনও নাই। 'জামালপুর' ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত:, কলিকাতার ৩৫ মাইল পূর্ব্বে একটী অতি ক্ষুদ্র পল্লী। প্রাকৃত ধন, মান, সম্পদের সহিত ইহার বড় একটা সম্পর্ক কখনও ছিল না; আবার এখানে কালিদাস ভবভূতি কখনও ভ্রমেও ভ্রমণ করিতে আসেন নাই। তবে কি জন্য সাত-সমুদ্র, তের-নদী পার হইয়া এই ঐশ্বর্য্যবিহীন স্থানটী ভক্ত-কবির—ভক্তি-

গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া, অমরত্ব লাভ করিল? বুঝিয়াছি—যাঁহার অপার্থিব সৌরভ, দেশকাল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়,—স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল এক করিয়া ফেলে, সেই অপ্রাকৃত ভক্তিদেবীর বিহারভূমি এই পত্র-পুষ্প-পরিশোভিত, বিহগকুল-কূজিত, যমুনা-কলনাদিত ক্ষুদ্র জনপদ! বুঝিয়াছি ভক্তিদেবীর এই মধুর মালঞ্চের একটী বনকুসুমের সৌগন্ধ দিগ্‌দিগন্ত সুরভিত করিয়া, সেই দূরদেশে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল। যিনি ভক্তের নিত্য পাঠ্য—"বৈষ্ণব-বন্দনা" রচনা করিয়াছেন, সেই পরম ভাগবত 'ভাইয়া দৈবকীনন্দনে'র শ্রীপাট এই 'জামালপুর।' এইখানেই যে সেই ভক্তপ্রবর দৈবকীনন্দনের প্রাণধন শ্রীনন্দদুলাল চাঁদ, অনুপমরূপমাধুরী বিস্তার করিয়া অদ্যাপিও ভক্ত-মন-নেত্রের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন! "অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়। সুঠাম দেখিলে চিত্তে আনন্দ জন্মায়।" শ্রীমান্ যুগলকিশোরের লীলাভূমি বলিয়া, জামালপুরের নাম 'কিশোরনগর' হইয়াছে। বুঝিয়াছি এই ভক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া সুদূর প্রদেশের ভক্ত-মধুকর এই নাম ঐশ্বর্য্যবিহীন, নগণ্য স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন :—

দেবকী নন্দন নাম ভাইয়া করি মানি।
নিবাস জামালপুর আঢ্য মহাধনী॥ ভক্তমাল।

পাঠককে ইংরাজ-রাজত্ব ছাড়িয়া, একবার মুসলমান-রাজত্বে যাইতে হইবে। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গদেশে এরূপ জেলা বিভাগ হয় নাই। পরগণা বিভাগ ছিল, এবং জমিদারগণ একরূপ বঙ্গদেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা মালেক ছিলেন। জমিদারগুলিকে ঠিক রাখিবার জন্য এবং অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য, স্থানে স্থানে মুসলমানরাজের ফৌজাদি লইয়া, কিল্লাদার বা ফৌজদার থাকিতেন। দৈবকীনন্দন, নবাবের এই ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কাটোয়ায়। অদ্যাপি কাটোয়াগড়ের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ 'কাটোয়া বাজার' মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এতদ্দেশে কিরূপ ধর্ম্মসাধন প্রণালী ছিল, তাহা এই মহাবিজ্ঞ উচ্চপদস্থ দৈবকীনন্দনের জীবনী হইতেই কতক অনুমান করা যায়। দৈবকী-নন্দন ঘোর 'বামাচারী শক্তি উপাসক। মদ্য মাংস দিয়া পঞ্চ মকার সাধন করিতেন।

কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে॥ ভক্তমাল।

সে সাধনার সহিত দীনতার কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং ঐশ্বর্য্যবিকাশ ও মনের গরম প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। তখনকার আমলে দৈবকীনন্দন দিন্ দুনিয়ার মালেক ছিলেন। কাজেই তাঁহার ভজনের আসবাব সরঞ্জামের কোন অভাব ছিল না। তান্ত্রিক কালীসাধক, গঙ্গাগর্ভে শিক্ষিত 'কালীগজ' নামাইয়া, তাহার সুবৃহৎ স্বর্ণালঙ্কৃত দন্তোপরি, রত্নসিংহাসন পাতিয়া, মহা আড়ম্বরে কালী-সাধন করিতেন। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিলেও দৈবকীনন্দন কিন্তু অকপট মাতৃভক্ত ছিলেন। কাতর প্রাণে মহামায়াকে ডাকিতেন এবং তৎসময়ের প্রচলিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন। মদ্য মাংসের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইত। যোগিনীচক্র বসিত, চক্রাকারে সাধকগণের মধ্যে পানপাত্র অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইত। ভাবগ্রাহী ভগবান, অনাচারের মধ্যেও সরলতার পুরস্কার দিয়া থাকেন। ক্ষেমঙ্করী কৃপাময়ী দেবী মহেশ্বরী, ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাই দৈবকীনন্দনের পুত্রকলত্র এক কালে কালকবলে কবলিত হইল। প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনাবুঝি এইরূপে নিবৃত্তিমার্গের পথ উন্মুক্ত করিতে লাগিল। এই প্রাকৃত বিপদই দৈবকী-নন্দনের ভাগ্য-প্রসন্নতার কারণ হইল। দৈবকীনন্দন প্রথমে আর দারপরিগ্রহ করিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে? বিশেষতঃ সহধর্ম্মিণী না হইলে ধর্ম্মযাজন হইবে কিরূপে? তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিণত বয়সে দৈবকীনন্দন 'হরিপ্রিয়া' নাম্নী অষ্টমবর্ষীয়া জনৈক বালিকার পাণীপীড়ন করিলেন। কোন্ দুর্জ্ঞেয় সূত্র অবলম্বন করিয়া, আমাদের ভাগ্যচক্র বিঘূর্ণিত হয়, তাহা আমরা কি বুঝিব! সাধু-শাস্ত্র যে কামিনী-সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যে যোষিৎসঙ্গ ভববন্ধনের মূলীভূত কারণ, সেই স্ত্রীসঙ্গই আমাদের দৈবকীনন্দনের সর্ব্বসিদ্ধি লাভের হেতু হইল। তাই 'ভক্তমালে' গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহা মোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হৈতে হৈল ভক্তির উদয়॥"

হরিপ্রিয়া শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী 'কৃষ্ণ-প্রিয়া'র আশ্রয়ে থাকিয়া লালিতাপালিতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীরূপনারায়ণ বসুর পত্নী। তিনি নিজেও বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। তৎসময়ে বৈষ্ণবতা কেবল আমাদের ন্যায় বচনে আবদ্ধ ছিল না সমাজের সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতনকে উপেক্ষা করিয়া, বৈষ্ণবেরা

ঘরে বাহিরে সবিশেষ নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মযাজন করিতেন। বালিকা হরিপ্রিয়ার কোমল হৃদয়ে. গুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তিমতী ভগিনীর নৈষ্ঠিক সদাচার বদ্ধমূল হইয়াছিল। ভগিনী-গৃহে থাকিয়াই ভাগ্যবতী মনের সাধে কৃষ্ণ-ভজন করিতেন, এবং ভগ্নির বৈষ্ণব সেবার আনুকুল্য করিতেন। লীলাময়ের লীলা অত্যদ্ভুত। দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, বিজাতীয় বস্তুর মিলন করিয়াছিলেন। প্রবীণে নবীনে, শাক্তে বৈষ্ণবে, সদাচারে বামাচারে এই অপূর্ব্ব সমাবেশ প্রথমতঃ উভয় পক্ষের ক্লেশকর হইল। কিন্তু পরিণামে ইহা অপূর্ব্ব অমৃতফল প্রসব করিল। নব পরিণীতা বালিকা হরিপ্রিয়া স্বামিগৃহে রক্তমাংসের ছড়াছড়ি দেখিয়া একেবারে মরিয়া গেলেন। স্বামিগৃহ তাঁহার নিকট যমপুরী বোধ হইতে লাগিল। তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। অসহায়া বালিকা ঘোর বিপদে পতিত হইয়া কায়মনোবাক্যে গোবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল, তবু বালিকা জলগ্রহণ করিলেন না। তাঁহার সদাচারনিষ্ঠ কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত মৃত্যু পণ করিল, তবু সদাচার ভ্রষ্ট হইতে কিছুতেই রাজি হইল না। শাশুড়ী, ননদীগণ বিশেষ পীড়াপীড়ি করায়, শেষে বালিকার মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন গুরুগঞ্জনা ও তিরস্কারের প্রবাহ ছুটিল। তাহাতেও হরিপ্রিয়ার নৈষ্ঠিকচিত্ত কিছুতেই টলিল না। তিনি তিরস্কারকে অঙ্গের ভূষণ করিলেন এবং সঙ্গিনী দাসীর সাহায্যে স্বহস্তে পাক করিয়া ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া, তবে সে প্রসাদ পাইলেন। দৈবকীনন্দন পত্নীর এতাদৃশী ভজননিষ্ঠা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন; পরন্তু তাঁহার কৃষ্ণভজনের কোন, প্রতিকুলতা না করিয়া, অনুকুলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দুই জনের মধ্যে একটা আপোষ হইল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে আপন আপন ভজন পথে সতেজে চলিতে লাগিলেন। হরিপ্রিয়া আপন প্রভুর নিকট স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। শুনিয়াছি চন্দন তরুর হাওয়া লাগিলে অন্য বৃক্ষও চন্দনত্ব লাভ করে। পরমা বৈষ্ণবী হরিপ্রিয়ার, সংসর্গে দৈবকীনন্দনের চিত্তে ভক্তির ভাব জাগিতে লাগিল, সেই মধুর ব্রজরসে লোভ জন্মিল। না হইবে কেন? কৃষ্ণভক্তের দর্শন স্পর্শন ও আলাপনে, চণ্ডালের মনও পবিত্র হইয়া যায়, দৈবকীনন্দন ত অকপট মাতৃভক্ত।

দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপিচ পুক্কশম্॥

কিন্তু দৈবকীনন্দন মায়ের চরণে মাথা বেঁচিয়াছেন। তাই তাঁহার মনে মধুর ব্রজোপাসনার লালসা জন্মিলেও তিনি মায়ের চরণ ছাড়িলেন না, বরং আরও দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। ভাবিলেন, মা আমার আদ্যাশক্তি, তিনিই অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। কাত্যায়নী আর ছাড়াইতে পারিলেন না; একদিন স্বপ্নাবেশে দর্শন দিয়া বলিলেন "হে ভক্ত, তুমি অকপটে আমার ভজনা করিয়াছ, আমি প্রসন্না হইয়া তোমাকে শ্রেয় ও প্রেমের পথ দেখাইয়া দিতেছি শুন :—

কৃষ্ণ বিনা ব্রজপ্রেম দিতে নারে শক্তি।
কৃষ্ণ-ভজন সর্ব্বসার এই শাস্ত্র উক্তি॥
অতএব কৃষ্ণ ভজ সর্ব্ব সিদ্ধি হবে।
আমার তাহাতে অতি সন্তোষ জন্মিবে॥

আবার প্রসন্না হইয়া বলিলেন :—

অতি প্রাতে গঙ্গাতীরে যাঁহারে মিলিবে।
ভব কর্ণধার তিনি নিশ্চয় জানিবে॥
যে বিগ্রহ পাইবে সেহ তোমার প্রাণধন।
এত কহি দেবী তবে হৈলা অদর্শন॥

এই সময়ে ফৌজদার দৈবকীনন্দন তাঁহার 'গরিপার' (নৈহাটী ষ্টেশনের সন্নিকট) বাটিতে বাস করিতেন। মায়ের আদেশ পাইয়াই দৈবকীনন্দন অতি প্রত্যূষেই আবিষ্টের ন্যায় গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিলেন। যেমন গঙ্গাগর্ভে নামিবেন, অমনি সম্মুখে দেখিলেন মাল্যচন্দনরঞ্জিত সুদীর্ঘ বপু এক কাঞ্চন পুরুষ। দৈবকীনন্দন দণ্ডের ন্যায় সেই অপূর্ব্ব পুরুষের শ্রীচরণে পতিত হইলেন। আর্ত্তস্বরে বলিলেন 'প্রভো, আমায় কৃপা করিতে হইবে।' সর্ব্বজন-সমাদৃত, মহাসম্ভ্রান্ত সাধকপ্রবর দৈবকীনন্দনকে তদবস্থ দেখিয়া, মহাপুরুষ বিস্মিত হইলেন; প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সে কি! আপনি যে মহামাতৃপূজক।" পূর্ব্ববৎ আবিষ্ট স্বরে উত্তর হইল "আমি প্রত্যাদিষ্ট।" তখন সেই গঙ্গাতীরেই দৈবকীনন্দন যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মায়ের কৃপায় সেই গঙ্গাগর্ভেই অপরূপ মদনমোহন-মূর্ত্তিলাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেন।

গরিপার বাড়ীতে সে স্থাপনা হইল॥
গরিপার বাটী নিয়া সেবা প্রকটিল।
শ্রীনন্দ-দুলাল নাম তাঁহার হইল॥

বিভিন্নমুখী স্রোতস্বিনী দুইটী, এতদিনে সম্মিলিতা হইয়া, আনন্দ-তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে কৃষ্ণসাগর-সঙ্গমে ছুটিল! আজ হরিপ্রিয়ার আনন্দের সীমা নাই। এতদিনে কল্পতরু শ্রীহরি তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রী একপ্রাণ হইয়া যুগলচরণে দেহ মন সমর্পণ করিলেন। উভয়ে সাধ মিটাইয়া কৃষ্ণভজন ও বৈষ্ণবসেবা করিতে লাগিলেন।

সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণব-সেবন।
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্য কথন॥ ভক্তমাল।

শ্রীনন্দদুলালের অপূর্ব্ব সুঠাম মূর্ত্তি, তাহাতে শিঙার করিলে যে কিরূপ মন-নেত্রাকর্ষক হন, তাহা আর বলিবার নহে। পাঠককে, প্রসঙ্গ পাইয়া, একটী টাট্‌কা প্রত্যক্ষ ঘটনা শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গত বর্ষে আষাঢ় মাসের শেষভাগে শ্রীনন্দদুলাল দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতসন্তান শ্রীল কমলাপতি গোস্বামী, 'ভক্তি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও আরো দুই একটী ভক্ত-মহাজন বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই জামালপুরে উপস্থিত হন। তাঁহারা অপূর্ব্ব সুঠাম শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে ভক্তি-রসাপ্লুত হৃদয়ে পরমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তনাদি করেন। একদিন পরম নৈষ্ঠিক গোস্বামী প্রভু এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেরাই ঠাকুরকে অপূর্ব্ব বেশে শিঙার করাইলেন। এখানকার সেবা পূজাদি সমস্ত ব্রজের অনুগত। ব্রজরাজনন্দনের রাজবেশ নাই। রাখালিয়া বেশ।

শ্যামসুন্দর শিখী-পুচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন॥

প্রভুর ভুবন-ভুলান রূপ ভক্তের হাতে আজ আরো মোহনীয় হইয়া উঠিল। শেষে গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছা হইল নাসিকায় নোলক পরাইবেন। পল্লীগ্রামে তখন নোলক কোথায় মিলিবে? কিন্তু গোস্বামী প্রভুর সুতীব্র বাসনা কিছুতেই থামিল না। শেষে 'মুক্তা' আছে শুনিয়া, সেই মুক্তা পরাইবার চেষ্টা হইল। যেমন ঠাকুরের পোষাকের বাক্স খুলিয়া মুক্তা বাহির করিবেন, অমনি সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাক্সের ডালা তুলিতেই সর্ব্বোপরি একটী ক্ষুদ্র নোলক রহিয়াছে! আনন্দে ভক্তগণ আত্মহারা হইলেন, গোস্বামী প্রভু অধীর হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া শ্রীনন্দদুলাল নোলক পরিয়া যেন মিটিমিটি হাসিতে লাগিলেন। পরদিনই কিন্তু নোলক হারাইয়া গেল। অপূর্ব্ব ঘটনা!

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ভক্তসেবক ৺ কৃষ্ণহরি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে এখন আমার ভগ্নী বাস করেন। এইখানে একটি অতি সুমিষ্ট আমের গাছ আছে। গত বৎসর সেই গাছে কয়েকটি আম হইয়াছিল। কিন্তু আষাঢ়ের শেষভাগে, এই ভক্তসমাগমের বহু পূর্ব্বেই, সব ফুরাইয়া যায়। হটাৎ কোন ভক্তের মনে হইল, আহা, এই গাছের আম পাইলে প্রভুর ভোগ দেওয়া যাইত, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইতেন। ছোট গাছ,—তখনই ৪।৫টি বালক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিছুই পাইল না। পরের দিন প্রাতে "জয় নন্দদুলালকি জয়" ধ্বনি উঠিল। দুইটি সুপরিপক্ক আম ঠিক ঐ গাছতলার রাস্তার উপর পড়িয়া আছে! প্রভু-সেবায় ও ভক্ত-সেবায় লাগিল দেখিয়া, সকলেই বিস্মিত হইলেন। পাঠক হয় ত ইহা ক্ষুদ্র দৈব ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু ভক্তিজগতে বিশ্বাসীর চক্ষে দৈব বলিয়া কিছুই নাই, সবই সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিধানে নিয়ন্ত্রিত। ঘটনা ক্ষুদ্র হইলেও ভগবৎ কৃপার মহিমা ক্ষুদ্র নহে।

যাহা হউক পাঠকের নাসিকাকুঞ্চন নিবারণার্থ আর একটি সত্য ঘটনা বলিয়া সম্প্রতি বিদায় লইব। পাঠক কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন; পরে না হয় credulous বলিয়া গালি দিবেন।

প্রায় সতের বৎসর হইতে চলিল, এক সময়ে, শ্রীনন্দদুলালের শ্রীমন্দির মেরামত হইতে থাকা সময়ে, তিনি একখানি চালা ঘরে থাকিতেন। অকস্মাৎ ঝড় হইয়া কাঠাল বৃক্ষের একটী ডাল পড়িয়া, ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বনাশ হইল, শ্রীবিগ্রহের বাম হস্তের তিনটি স্থান ভঙ্গ হইয়াছে দেখা গেল। গ্রাম শুদ্ধ লোক শোকাভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ভক্ত-সেবাইতগণ আহার নিদ্রা ছাড়িয়া 'ধন্না' দিয়া পড়িয়া রহিলেন। একদিন, দুইদিন, তিন দিন কাটিয়া গেল, গ্রামশুদ্ধ লোক অনাহারে কান্না কাটি করিতে লাগিলেন; "অঙ্গহীন ঠাকুর রাখিতে নাই," যমুনায় দিতে হইবে। কিন্তু সেবকেরা যে নন্দদুলালগত প্রাণ, তাঁহারা সেই কথা মনেই তুলিতে পারিলেন না। কে একজন অন্যলোক ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলেন, তাই শুনিয়া ২।৩ জন সেবক যমুনা জলে প্রভুর সঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। (শেষে আমরা ঐ লোকটীর মুখ শাদা হইতে দেখিয়াছি।) সেই রাত্রেই ভক্ত ৺ হরি নারায়ণ বসুর স্বপ্নাদেশ হইল "তোরা আর কাঁদিস না, ছেলের হাত ভাঙ্গিলে কি, ছেলে জলে ফে'লে দেয়? কাল আমার হাত ভাল হইয়া যাইবে।"

পরের দিন মাথায় পাগ বাঁধা এক অজানিত পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া কি করিলেন জানি না, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ যেমন ছিল, তেমনই হইল, ভক্তদের দেহে প্রাণ আসিল। সেই ভগ্নস্থান এমনই মিশিয়াছে যে প্রত্যহ স্নান পূজা হইতেছে কোন গোলই নাই, কেবল এই কৃপার সাক্ষ্য স্বরূপ একটু তাহাতে দাগ আছে মাত্র। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষীভূত অলৌকিক লীলা, ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে, তাই ইহা "আনন্দে" বিজ্ঞাপিত করিলাম। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত-গণও এখন অলৌকিক বিশ্বাস করিতেছেন। করিবেন না কেন? যিনি সর্ব্বেশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, সবই করিতে পারেন। "অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।" বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীও আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

অলৌকিক কার্য্যে যে জন না করে বিশ্বাস।
তার ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ॥

ভাই পাঠক! আমরা ভক্ত-মহিমা গাইতে গাইতে, ভগবানের লীলারস-সাগরে আসিয়া পড়িয়াছি। আগামীবারে সেই সুর ধরিব। এখন ভক্ত দৈবকী-নন্দনের সুরে সুর মিলাইয়া বলুন ঃ—

জয় জয় রাধারাণী, জয় নন্দলালা।
শ্যামসুন্দর জয়, জয় ব্রজবালা॥

শ্রীবামাচরণ বসু।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাশীমবাজার।

———

যমুনায়।

—০ঃ*ঃ০—

যমুনার নীলজল নাচিয়া নাচিয়া
মৃদুকলরবে চলে' যায়।
আজু কি আনন্দ-সুধা পরিপূর্ণ হিয়া,
নাহিতে এসেছি যমুনায়॥
এই ত যমুনা—সেই দ্বাপরের নদী,
সেই স্নিগ্ধ মনোরম তীর।
যেথায় খেলিত মোর প্রাণ-কৃষ্ণ-নিধি,
সাথে ব্রজশিশু বল-বীর॥
এইখানে ছোট দুটি রাঙ্গা রাঙ্গা পায়,
হাঁটিয়া যাইত নীলমণি।
ব্রজবালা-সাথে ঝাঁপ দিত যমুনায়,
নূপুর বাজিত রিণিঝিনি॥
এই যমুনার জলে শ্যাম-অঙ্গ ধুয়ে,
বহিয়া গিয়াছে কলরবে।
শ্যাম মাখা শ্যাম জলে দেহ ডুবাইয়ে,
অভাগিনী সুশীতল হবে॥

*　　*　　*　　*

আহা মরি! মরি! ব্রজবালকের দল,
ছুটিয়া আসিছে নাহিবারে
তীব্রবেগে ঝাঁপদিয়ে যমুনার জল,
তোলপাড় করে একেবারে॥
কি শোভা! মরি রে মরি! মোর নন্দলাল,
এমনি কি যমুনার জলে।
ছুটিয়া আসিত লয়ে যত ব্রজবাল,
ঝাঁপ দিতে উচ্চ কোলাহলে॥
আজু কত কথা জাগে পরাণে আমার,
নাই নাই বলিবার ভাষা।

আজি আমি যমুনায়, কি বলিব আর,
পূর্ণ চিরসাধনার আশা ॥

*　　*　　*　　*

লহরে লহরে আসে যমুনালহরী,
আমারে লইতে তুলে কোলে।
যাই যাই হে গোবিন্দ! হরি হরি হরি,
যাই ভেসে যমুনার জলে ॥
হে যমুনে পদে রেখো এ চির কিঙ্করী,
কৃষ্ণদাসী এসেছে জুড়াতে।
ব্রজরজে দেহ থুয়ে বলে হরি হরি,
শোবে ওই পুলিন-চিতাতে ॥

সুশীলাসুন্দরী দেবী।
কেশীঘাট, শ্রীবৃন্দাবন।

সাঙ্গোপাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অদ্বৈত প্রভু সাক্ষাৎ সদাশিব—এই পাপময় কলির দুর্ব্বল জীবের নিস্তারের উপায় নাই দেখিয়া, জগজ্জননী যোগমায়ার সহিত যুক্তিমতে যোগাসনে বসিয়া ইনি সপ্তশত বৎসর মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। ইহার এই ঘোর তপস্যাতে কারণশায়ী মহাবিষ্ণু ইহার সাক্ষাৎকার হইলেন এবং তাঁহারা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া অর্থাৎ মহাবিষ্ণু ও মহাদেব একত্র তনুতে অনাদি-ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মত, অদ্বৈতাচার্য্যরূপে লাভাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া মাঘী সপ্তমীতে ধরাতলে প্রকট হইয়াছিলেন, যথা—

"কলি ঘোর পাপময় দেখি পঞ্চানন।
কৈছে যাব নিস্তারিমু ভাবে মনে মন ॥
তবে বহু বিচারিলা যোগমায়া সহ।
হরি বিনু জীব নিস্তারিতে নাহি কেহ ॥

এত কহি সদাশিব সদানন্দ চিত।
কারণ-সমুদ্র-তীরে হৈলা উপনীত ॥
যোগাসনে মহাযোগী যোগ আরম্ভিল।
যোগে সপ্তশত বৎসর অতীত হইল ॥
এই ঘোর তপস্যাতে হঞা তুষ্ট মন।
জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু দিলা দরশন ॥
সাক্ষাৎকারে পঞ্চানন দেখি নারায়ণে।
মহাবিধ স্তুতি কৈল না যায় কথনে ॥
মহাবিষ্ণু কহে তুহু নহ আর কেহ।
তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ ॥
এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন।
দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন ॥
অত্যাশ্চর্য্য হৈল এক শুন সর্ব্বজন।
শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ উজ্জ্বল বরণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু ছাড়য়ে হুঙ্কার।
দৈববাণী হৈল তখন অতি চমৎকার ॥
শুন মহাবিষ্ণু তুমি এহেন মূর্ত্তিতে।
অবতীর্ণ হও আগে লাভার গর্ব্ভেতে ॥
পাছে মুঞি অবতীর্ণ হইমু নদীয়ায়।
শচী জগন্নাথ ঘরে দেখিবা আমায় ॥
বলরাম আদি করি যত ভক্তগণ।
জীব উদ্ধারিতে সবে লভিবে জনম ॥
এত শুনি মহাবিষ্ণু শিবাভিন্ন হঞা।
শান্তিপুরে লাভা গর্ভে প্রবেশিল গিয়া ॥"

(শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ।)

তৎপর—

"প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥

লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

করুণ হৃদয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এইরূপ চিন্তা করিয়া জল তুলসীর দ্বারা শুদ্ধভাবে সর্ব্বদা আরাধনা ও হুঙ্কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধরাতলে অবতীর্ণ করাইলেন।

ভাইরে—

"অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকলি আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
আচার্য্য গোঁসাইয়ের গুণ মহিমা অপার।
জীব কীট কোথায় পাইবেক তার পার॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের—

"অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥"

আর যিনি দেবর্ষি নারদ, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তাখ্যরূপ শ্রীবাসরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

যথা—

"শ্রীবাস পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদোমুনিঃ।"

ইনি বীণার তানে হরিগুণগানে বিভোর হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন—

অধর্ম্ম বাড়িল, আর ধর্ম্ম হইল ক্ষীণ।
স্বধর্ম্ম ত্যজিল বর্ণ আশ্রম-বিহীন॥
দংশিল সকল লোকে কলিকাল-সর্পে।
নিরন্তর দগ্ধ মুগ্ধ মায়া দর্পে॥
শিশ্নোদর পর সভে জগত ভরিয়া।
মূর্চ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া অমিয়া সেচনে॥
এ আমি আমার বলি মরে অকারণে।
কে আমি কে আপনা কিছুই না জানে॥

পরদুঃখকাতর দেবর্ষি নারদ জীবের দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ইচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হঙ সর্ব্বথায়।
কলিতে আনিব তবে প্রভু যদুরায়॥
আনিব সকল দেবগণ তাঁর সঙ্গে।
অস্ত্র পারিষদ আদি করি সঙ্গোপাঙ্গে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত ঋষিমুনি।
পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

এই মত প্রতিজ্ঞা করিয়া মহামুনি নারদ দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগবান শ্রীগোবিন্দ চরণে নিবেদন করিলেন—

"তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুণলোভে বুলোঁ সকল সংসার॥
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া॥
অহঙ্কারে মুগ্ধ মূর্চ্ছিত সর্ব্ব লোক।
কৃষ্ণহীন জীব দেখি এই মোর শোক॥
লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায়॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভকতবৎসল হরি, ভক্তচূড়ামণি মহামুনির এই কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন—

"ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকট হইব কলিযুগে ॥
ভকতজনের সঙ্গে ভকতি করিব।
নবদ্বীপে শচী-গেহে জনম লভিব ॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম।
সুমেরু সুন্দর তনু অতি অনুপম ॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌর-তনু হৈল।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িল ॥
কোটী ইন্দু জিনি জ্যোতি কোটি রবিতেজে।
কোটী কাম জিনি লীলা গৌরবর রাজে ॥
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরহরি ॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

ভগবান কৃষ্ণ তৎপর নিজ তেজ সম্বরণ করতঃ দেবর্ষিকে বলিলেন—"নারদ ! আর ভয় নাই—কলির দুর্ব্বল জীবের দুঃখ অপনোদনার্থে আমি স্বয়ং এই গৌররূপে সাঙ্গোপাঙ্গে ধাম নবদ্বীপে প্রকাশ হইব। যাও নারদ, তুমি সত্বর এই শুভ সংবাদ দেবলোকে ঘোষণা কর এবং সমস্ত দেবতাগণকে মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হইতে অনুরোধ করগে। যথা—

"ঠাকুর কহয়ে শুন মুনি মহাভাগ।
অব্যাহত গতি তোমার সর্ব্বত্র সোহাগ ॥
ঘোষণা বলহ শিব ব্রহ্মা আদিলোকে।
গৌর অবতার মুঞি হব কলিযুগে ॥
গুণনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নিজ ভক্তি প্রেমরস মুর্খে প্রচারিব ॥
শত শত শাখা ভক্তি পথে নাহি সীমা।
একমুখে ইহলোকে প্রচারিবে প্রেমা ॥
নিজ নিজ ভক্তগণ আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥

ঐছন শ্রীমুখ বাণী শুনিয়া নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদ পরসাদ ॥
চলিল নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
এই মনঃকথা রসে পরবশ হঞা ॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।)

(ক্রমশঃ)

দীন—শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহপাত্র ভক্তিতত্ত্ববিশারদ।

আক্ষেপ।

—:*:—

দিঠি দিঠি ভাতল
পুণমিক চাঁদিমা,
উড়ুগণ আগমন ভেল।
কলী-ছল-নাদিনী
নব উপঢৌকন,
সাগরে-নাগরে দেল ॥
শ্যামল বনভূমি
"ধীরসমীর" চুমি
ধীরসমীর অব্ ধাওয়ে।
কুঞ্জ সুরঞ্জিত
অলিদল গুঞ্জনে
মধুসখা মৃদুমধু্ গাওয়ে ॥
সো মধুযামিনী
ব্রজবর-নায়র
কালীয়া মূরলীক বাওরে।
সোঁই নিসান শুনি
ব্রজকুল-কামিনী
ছিপি-ছিপি যো পথে যাওয়ে।

মম মূঢ়-মানস
ইহ-পর নাশল
অভিবহে সো পথ ভুলি।
অভি নাহি মাখল
ব্রজবধগণ পদ
পূষ্ঠ সো পাবন ধলী॥

শ্রীগোপেন্দভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
কালনা (বৰ্দ্ধমান)

নিমাই ও মুরারি।

——:*:——

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে শচীর দুলাল নিমাই পাঁচ বছরের শিশু। একেত তাহার বালসুলভ-সুললিত দেহের কমনীয়তা, তদুপরি আবার বালক নিমাইর ভুবনমোহন গৌর অঙ্গচ্ছটা, যেন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহাকে দেখিলেই যেন একটী রাঁসের পুতুলী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে বলিয়া বোধহয়। সে শরীর-সৌন্দর্য্যের লাবণ্যময়ী প্রতিভা, যেন গাত্র বাহিয়া খসিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর আবার গৌরাঙ্গজ্যোতি ঝকমক করিতেছে। দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন ঢেউ তুলিয়া কত কবিত কাঞ্চনধারা, তাহার দেহলতার উপর আনন্দে খেলিতে খেলিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। হায়! রূপ-লহরী, বালকের সুচিক্কণ বস্ত্র হইতে যেন উঁকি মারিয়া পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু কি যেন মনে ভাবিয়া পড়িতে পারিতেছে না। হায়! বিধাতা যেন সমস্ত জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সার (Extract) একীকরণ ও সমীকরণ করিয়া এই বালকের দেহযষ্টি নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছেন। ফলতঃ এইরূপ সুন্দর শিশু মানবকুলে জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব। অহো! তাহার রসভরা ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটীর বালক-স্বভাবসুলভ বঙ্কিম চাহনীতে সকলকে কত বিমোহিত করিতেছে! বালকের সেই ঈষৎ হাসিতে যেন কত স্নিগ্ধ ইন্দুকিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে!!

পাঠক হয়ত মনে ভাবিবেন এই সুন্দর শিশুটী না জানি কতই শিষ্ট, শান্ত ও সুশীল। যদি এইরূপ ভাবেন তবে একান্তই ভুল করিবেন। বরং ইহার বিরুদ্ধ

দিকে কল্পনা নিবেশ করিলে এই শিশু চরিত্র যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। নিমাইর মত চঞ্চল শিশু জগতে আর দ্বিতীয়টি সম্ভব হয় না। তাহার দুরন্তপনায় নদীয়াবাসী সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আজ অমুক-বাড়ীর ঠাকুর গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, কাল হয়তঃ পূজোপকরণ নিজে খাইয়া খল খল করিয়া হাসিতেছে। অন্যদিন আবার কাহারও পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া কৌতুক করিতেছে। প্রত্যহ তাহার দুরন্তপনা সম্বন্ধে মায়ের নিকট পাড়া-প্রতিবাসীদের কত অভিযোগ আসিত। যতই বয়স বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তাহার দুরন্তপনা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গাঘাটে বালিকাদের উপরই এই দৌরাত্ম্য বেশী ছিল। যদিও বয়সের কথা স্মরণ করিয়া কখন কখন অভিযোগের গুরুত্ব কমিয়া যাইত সত্য, কিন্তু নিমাইচাঁদের দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শচীর এই পাগলছেলেকে সুশান্ত করিবার জন্য কত তন্ত্রমন্ত্র ঔষধ কবচই ব্যবস্থা হইল তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু নিমাইর পাগলামী দিন দিন বাড়ে বই কমে না। এই পাগলছেলে যেন একদিন জগৎকে পাগল করিবার জন্যই পাগলামীর এই গৃহাভিনয় (রিয়ারসেল বা তালিম) করিতেছে। সম্প্রতি এক প্রবীণ ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসককে এই পাগল ছেলে যেরূপে পাগল করিয়াছিল, জীব-ব্রহ্মে অভেদ, এই ভুল ভে'ঙ্গে দিয়ে যেরূপে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, সে ঘটনাটি পাঠক মহাশয়দিগের নিকট বিবৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

একদিন মুরারি গুপ্ত অধ্যাপকের নিকট যোগবাশিষ্ঠের "সোঽহং" তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয় হাত ঘুরাইয়া জীবে ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান, 'সেই আমি' 'সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের স্বরূপ,' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। আর মুরারি গুপ্ত শিরশ্চালনা দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতেছেন। এই মুরারি গুপ্তের বাড়ী শ্রীহট্ট, তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করেন এবং মধ্যে মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন। চিকিৎসা ব্যবসাতে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। মুরারি গুপ্ত যোগ-বাশিষ্ঠ পড়িতেছেন এমন সময় শচীর সেই পাগল ছেলে হঠাৎ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। তাহার দিকে যে লক্ষ্য করিল সে দেখিল, নিমাই সেই "সোঽহং" তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিল এবং মুরারির সেই শিরশ্চালন হস্তান্দোলনাদির অনুকৃতিসহ নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর একদিন স্বগৃহে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে মুরারি গুপ্ত ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় সেই পাগল ছেলে নিমাই হাসিতে হাসিতে সেইখানে

উপস্থিত হইল এবং বিদ্যুৎগতিতে মুরারি গুপ্তের ভোজনপাত্রে প্রস্রাব করিয়া দিল। ইহাতে সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা 'হায় হায়' করিতে লাগিল। মুরারি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নাহার পরিত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া পাগল নিমাই মুরারির দিকে রক্তচক্ষুতে চাহিয়া, আজ অপূর্ব্ববাণী প্রয়োগ করিতে লাগিল, যথা :— "কবিরাজ! স্মরণ কর, সেই দিনকার 'সোঽহং তত্ত্ব,' 'জীবে ব্রহ্মে ভেদ নাই',— সেই কথা পুনরায় স্মরণ কর। রাগ কর কেন? তুমি না বলিয়াছিলে 'জীবে ব্রহ্মে ভেদ নাই'? 'সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়'? তবে তোমার অন্নব্রহ্মের মধ্যে আমার প্রস্রাব ব্রহ্ম পতিত হওয়াতে উহা পরিত্যাগ করিলে কেন? বুঝিলাম উহা কেবল তোমার মুখের কথা। পুথিগত বিদ্যার নিষ্ফল বাক্‌পটুতা। তাহা না হইলে সেই দিন তুমি যোগবাশিষ্ঠ পড়িবার সময় 'সেই আমি,' 'জীবে ব্রহ্মে ভেদ নাই' 'সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম,' এত বড় বড় কথা মাথা নাড়িয়া, হাত ঘুরাইয়া বলিলে, আজ তার বিপরীত ভাব দেখি কেন? বাপু হে! এ চিকিৎসা নয়, জ্বর বিকারে গ্রহণীর ঔষধ দিলে চলিবে না, এ পোটলা পুটুলী বাঁধার কার্য্য নয়, এ বিষম পথ। মহতের কৃপা না হইলে—কেবল পুথিগত বিদ্যার জোরে, শ্লোক আওড়াইলে এ পথ ধরা যায় না। যথা :—

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥

সুতরাং তোমার এ কার্য্য নয়। মুখে ও অন্তরে সমান না হইলে, বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান না হইলে, সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন না হইলে, কেবল মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ ঝুলাইলে, সার্দ্ধ চতুরঙ্গুলি-দীর্ঘ রক্তচন্দনের ফোটা কপালে দিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না। মনে মুখে বাহ্যাভ্যন্তরে এক হওয়া চাই। তোমার এই ব্যবহারে আজ আমি এই বালকও মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিশেষতঃ তুমি এই অন্নপ্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাপরাধ সঞ্চয় করিয়াছ। তুমি এই নিবেদিত প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া কতদূর গুরুতর পাপের কার্য্য করিয়াছ তাহা বুঝিতে পার? উঃ! আজ তুমি গুরুর ঘরের ধন সামান্য ঘৃণার দায়ে ফেলিয়া দিলে! আজ তুমি সেবাবাদী মহাপরাধী, সুতরাং তোমার এ অপরাধের কিরূপে মোচন হইবে, আমি ভাবিয়া কুল পাইতেছি না।" পঞ্চবর্ষীয় নিমাই কি যেন অলৌকিক শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দিব্যজ্ঞানীর মত কথা বলিতেছে। আর সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নীরবে তাহা শ্রবণ করিতেছে। নিমাই বলিতেছে, "কবিরাজ! 'সোঽহং' বাক্যের অর্থ কি—তাই? জীব কি কখনও ভগবান্ হইতে পারে? জীবে

ভগবান্ আরোপ করা জীবের বাতুলতা মাত্র। শ্রীভগবান্ পূর্ণ, জীব তাহার কলা বা অংশ মাত্র। তিনি সচ্চিদানন্দময় অখণ্ড বস্তু, জীব খণ্ড বস্তু। সুতরাং অখণ্ড বস্তু কিরূপে খণ্ড বস্তু হইতে পারে? অতএব শ্রীভগবান্ আর জীব একই বস্তু হইতে পারে না। তবে 'সোঽহং' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য ও আনন্দাংশে জীব ও শ্রীভগবানে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন পূর্ণ চৈতন্যময় ও আনন্দময়, জীবও তাঁহার অংশ বলিয়া সেই অংশানুপাতে চৈতন্যময় ও আনন্দময়। তবে প্রভেদ এই যে শ্রীভগবান্ স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট। প্রকাণ্ড উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলাশয়ের সহিত মৎস্যের যে সম্বন্ধ, শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেই সম্বন্ধ। আপনাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ভাবা জীবের পাগলামী মাত্র।"

নিমাই যেন এই দার্শনিক কথাগুলি একটী প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিতের ন্যায় অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, আর মুরারি ও অন্যান্য উপস্থিত জনমণ্ডলী সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখারবিন্দের দিকে চাহিয়া আছেন! কাহারও মুখে কোনও একটী কথা ফুটিতেছে না। কি যেন আকর্ষণে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া, অনিমেষলোচনে বালকের বাক্যসুধা তাঁহারা পান করিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কোলাহলময় পুরীতে যেন একটী নিস্তব্ধতার বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে নিমাই 'সোঽহং' তত্ত্বের অর্থ বুঝাইল যে, "সেই পরম পুরুষের সহিত অহং অর্থাৎ জীবের মিলন হইলে, অর্থাৎ জীব সোঽহং ভাবে উপনীত হইলে 'সঃ' এবং 'অহং' এই দুইটী কথা থাকে। এবং দুইটী বস্তুর অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকিয়া যায়। কাজেই 'সোঽহং' অভেদে মিশিয়া যাওয়া নহে। আমিই শ্রীভগবান্ এরূপ নহে। সোঽহং তত্ত্বের অর্থ শ্রীভগবান ও জীব উভয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলন, একেবারে মিলন না।* প্রেমরসে

* মিলন ও মিশন এক কথা নহে। যেমন চাউল ও দাইলের সংযোগের নাম মিলন। এ মিলনে উভয়ের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, কেবল পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়াইয়া তোলে,—আর মিশন যেমন চূণ আর হরিদ্রা একত্রিত হইলে উভয়ে স্বধর্ম্ম হারাইয়া ফেলে, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ার নাম মিশন। ইহাকেই রাসায়নিক পণ্ডিতেরা chemical combination বা রাসায়নিক সংযোগ বলেন। এ সংযোগে বা মিশনে বস্তুর অস্তিত্ব নষ্ট হয়। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। ইহা chemical action বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গুণ, নতুবা মিশন অর্থাৎ সংযোগ হয় না। এ স্থলে সোঽহং ভাব যদি একেবারে শ্রীভগবানের সহিত জীবের মিশন হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্মানুসারে উভয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। উভয়েই স্বধর্ম্ম হারাইয়া চূণ ও হলুদের মিশনের মত কিম্বা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগের মত, অন্য একটা পৃথক ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুতে পরিণত হইয়া

জীবের আত্মবিস্মৃতি কিন্তু আত্মবিনাশ নহে। যাহা মিশিয়া যায়, যাহা লয় হয়, তাহা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা বিনাশশীল তাহার নিত্যত্ব কিরূপে আসে? অনিত্য বস্তু আবার কিরূপে ভগবান্ হয়? আমরা নিজেরা অনিত্য হইয়া আর এক অনিত্যের ভাবনা বা উপাসনা করি কেন? যদি তাহাই হয় তবে 'সোঽহং' তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তাই থাকে না, 'সোঽহং' তত্ত্বের কোন নিত্যত্ব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। 'সেই আমি' যখন অনিত্য হইলাম, তখন 'সেই আমি' অর্থাৎ 'সোঽহং' ভাবনার আবশ্যক কি? বস্তুতঃ 'সোঽহং' তত্ত্ব 'সেই আমি'। আমি ভগবান অর্থাৎ কালে আমিই শ্রীভগবান হইয়া যাইব, এইরূপ বুঝা আর অশ্বডিম্ব নামক বস্তুর জ্ঞান একই।"

বালকের গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়েরা 'সোঽহং' তত্ত্বের যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, আজ বালক নিমাইয়ের মুখে তাহার বিপরীত অথচ যুক্তিপূর্ণ সমীচীন অর্থ-সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলেই মনে করিলেন, এই বালকের কথাই ঠিক বোধ হয়, এই চঞ্চলরূপী বালক কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হইবেন। নতুবা প্রভুই যেন ইহার মধ্য দিয়া আমাদের নিকট এইরূপ বলাইতেছেন। এই বলিয়া সকলে বালককে কোলে লইতে যেই হাত বাড়াইল, সেই মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রশান্ত ভাব লুকাইয়া নিমাই পূর্ব্ববৎ অশান্ত ভাবই ধারণ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পাগলামীর মাত্রা চড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে সবেগে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। মুরারি বালকের সেই অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং সেই ব্যাখ্যাতেই আস্থা স্থাপন করিয়া ঐ দিন হইতে যোগবাশিষ্ঠ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র যতই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, ততই বালক নিমাই যে কি অপরূপ বস্তু তাহা

পড়ে। কিন্তু শ্রীভগবান ও জীবের ভিতর এমন একটা প্রবাহ নাই, যদ্দ্বারা উভয়ে অভেদে মিশিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সৃষ্টির রূপ মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বজায় থাকে না। যদি তাহা হইত, তবে উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিত না। আর এখানে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলে, তিনি কিরূপে অবিনাশী নিত্য বস্তু হইবেন? 'সঃ' এবং 'অহং' এই দুই বস্তুর মিশনেই বা সেই পূর্ণ সোঽহং বর্ত্তমান থাকে কিরূপে? বলিয়াছি ত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সংযোগে উভয়ের অস্তিত্ব থাকে না, সংযোগফলে জল একটী পৃথক বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সঃ এবং অহং মিশিয়া আর যে কোন হওয়ার আকার নাই? অতএব সোঽহং তত্ত্বের অর্থ অভেদে মিশিয়া যাওয়া নহে, শ্রীভগবান ও জীবে প্রেমের মিলন মাত্র। প্রভুর কথায় এ অধমের এইরূপ তাৎপর্য্যই মনে উদয় হইতেছে। সাধু গুরু বৈষ্ণব মহোদয়গণ ধৃষ্টকে ক্ষমা করিবেন।—লেখক।

তাহার অন্তরমধ্যে জাগরিত হইতে লাগিল। উত্তর কালে তিনি একজন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। কৃপাময় পাঠক! এই মুরারিরই কিন্তু সংস্কৃতভাষায় লিখিত মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বিষয়ক গ্রন্থ "মুরারি গুপ্তের কড়চা" নামে ভক্তি-সাহিত্যে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। নিতান্ত বিনীত ভাবে ভাগ্যবান মুরারির সৌভাগ্যদিনের ইতিহাস আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আজকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।
ডুবলা চাঁদ, 'ভক্তি কুটির', নোয়াখালী।

চৈতন্যচন্দ্রালোক।

—:*:—

শুভ আবির্ভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুমধুর চৈতন্যলীলা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারিতেছি না। যত পড়ি' ততই ভাব ও মাধুর্য্যের নূতন নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, আমাদের হৃদয় অপ্রাকৃত আনন্দরসে পরিপ্লুত করিতে থাকে! সে আনন্দ একা ভোগ না করিয়া আরও দশজনকে উপভোগ করাইবার জন্যই এই "চৈতন্যচন্দ্রালোকের" অবতারণা। আমরা অকৃতকার্য্য হই—ক্ষতি কি? বৈষ্ণবজগতের মঙ্গলামঙ্গলদর্শী পূজ্যপাদ বৈষ্ণবমহোদয়গণের কৃপা তো সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি আছে? আমাদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিলে তাঁহারা নিজগুণেই তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। আমরা যাহা না বুঝি, তাহা পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শুদ্ধ এই ভরসাতেই মনে মনে ভগবান চৈতন্যদেবকে স্মরণ করিয়া তদীয় লীলারসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধু গুরু বৈষ্ণবমহাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদে আর' না হউক, কেবল গৌরচরণ অনুধ্যান হইলেই আমাদের ইহ জন্মের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইবে।

"হেনই সময়ে সর্ব্ব জগৎ জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥"

আমাদের বিশ্বাস এই পর্য্যন্তই ঠাকুর মহোদয়ের বাহ্য অনুভূতি ছিল। তারপর যে আনন্দবিকার লক্ষিত হয়, তাহা এ জগতের নয়, অন্তর্জ্জগতের আলেখ্য, যথা :—

রাহু কবল ইন্দু, পরকাশ নাম সিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বাদ্ধবানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥

ইহা কণ্ঠ-নির্ঘোষ বলিয়া কে মনে করিবে? আমরা যে এত অধম, আমাদেরও গৌরচন্দ্র-জন্মবর্ণনাধ্যায়ের এই স্থানটায় পাঠোপক্রমকালে, স্বাভাবিক স্বর আর থাকে না। কে যেন আনন্দ মুষ্টিতে কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরে। অহো, সেই আনন্দস্পর্শে নয়নে দরদর ধারা বিগলিত হইয়া সত্য সত্যই আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত করে। এ অবস্থায় ঠাকুর মহোদয়ের উহা যে সামান্য মুখের ভাষা তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? বাস্তবিক তিনি জীবলোকের মঙ্গলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে গিয়া এইখানে আর তিনি ছিলেন না, একেবারে চিন্ময় চৈতন্যে আত্মনিমজ্জন করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় সুমধুর ব্রজরসে পরিসিক্ত হইয়া পবিত্র ব্রজবুলী তাঁহার অন্তস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে! অহো, কি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্কেত ধ্বনি! কি স্বর্গীয় অনাবিলতা!! কি সরস প্রাঞ্জলতা!!!

ঠাকুর তন্ময়ভাবে বলিতেছেন, "জীব রে! আর তোদের ভয় নাই। আজ চন্দ্রগ্রহণকালে এ জগতে এক নামসিন্ধুর উদয় হইয়াছে। যেমন বানের জলে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই নামসিন্ধু হইতে প্রেমের বান উত্থিত হইয়া, একদিন তোদের পাপতাপ দুঃখদুর্গতিরাশি দূরে সরাইয়া নিবে। আর জানিস্ কি? আজ এই প্রভুচন্দ্রের প্রকাশে এক এলোকে নয়, চতুর্দ্দশ ভুবনেই 'জয় জয়' ঘোষণা পড়িয়া গিয়াছে।"

ঠাকুর এইরূপ সংক্ষেপে সুকৌশলে জগন্মঙ্গল বার্ত্তার উপসংহার করিয়া, অতি দ্রুতবেগে শ্রীমন্দিরের দ্বার সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। অহো, এখন তিনি একেবারেই প্রেমের শিশু! যথা :—

"হে মাই! হে মাই! দেখত গৌরাঙ্গচন্দ্র।"

ঠাকুর ঠিক যেন শিশুর আব্দার টুকু প্রাণে পোষণ করিয়া বলিতেছেন "মা মা! তোর গৌরাঙ্গচন্দ্রকে তুই দ্যাখ্‌ত?" এ শিশু তো—সে প্রাকৃত শিশু নয়, তাই

এ কথাটুকু সর্ব্বাংশে শিশু-সুলভ হইয়া উঠে নাই। সাধারণ শিশুর ন্যায় তিনি 'দেখাত' বলিয়া আখুট করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ, তিনি ত্রিলোকারাধ্যা দেব-মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। সুতরাং 'দেখা' এই তুচ্ছার্থ-বোধক অনুজ্ঞা বা 'ফরমাস' তিনি কখনই করিতে পারেন না। তাই গদগদস্বরে কহিতেছেন "মা মা! তোর গৌরাঙ্গচন্দ্রকে তুই দ্যাখ্‌ত?" অর্থাৎ তোর গৌরাঙ্গচন্দ্রকে তুই দ্যাখ, ঐ সুযোগে আমারও দেখা হইবে। বস্তুতঃ এই ধ্যান যোগেব দেখায় তিনি বঞ্চিত হইলেন না, বরং নদীয়ার লোককেও তাঁহাব ন্যায় কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া, হর্ষবিচ্ছুরিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন :—

নদীযাক লোক শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ।
দুন্দুভি বাজে শত শঙ্খ গাজে,
বাজয়ে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিত্যানন্দ ঠাকুব,
বৃন্দাবন দাস রস-গান॥

আর্য্য রমণীর কুন্তল সজ্জা।

আমরা এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসক হইয়াছি। পাশ্চাত্য বিদ্যামন্দিরে শিক্ষালাভ করিয়া আমরা এখন ভারতীয় পুরাতন সভ্যতাকে অর্দ্ধচন্দ্র দান করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভাল কি মন্দ সে বিচার নাই, আমরা এখন পোষাকে পরিচ্ছদে, চালে চলনে, চাহনে বলনে, যতদূর সম্ভব পাশ্চাত্য রুচির আঁশ্রয় লইয়াছি। বাঙ্গালীর খাঁটী পোষাক কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য বোধহয় আর কয়দিন পরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা হয়ত বিপুল গবেষণার পর বলিয়া উঠিবেন, বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ আদৌ বস্ত্রই পরিধান করিতেন না। কৌতুকের কথা নয়, বস্তুতই আমাদের এখন এই দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। এ সময় যে কেহ কেহ হাঁড়ি, পাতিল, শিল, নুড়ার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা এক হিসাবে মন্দ করিতেছেন না। চক্ষে দেখিয়া লেখা,

আর আন্দাজে লেখা, এ দুটার কখনই এক মূল্য হইতে পারে না। এই আন্দাজে লেখার ফলেই, শৈবের শিব অনার্য্যের দেবতা, আর বৈষ্ণবের বিষ্ণু (কৃষ্ণ) কৃষক সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। আরও যে কে কি হইবেন, তার নিশ্চয় নাই। যাই হউক আজ এই শুভ অবসরে আমরা ভারতীয় আর্য্য রমণীদিগের কুন্তল সজ্জার ইতিহাসটুকু 'আনন্দে' লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি।

কুন্তল ভারতললনাদিগের বড়ই একটী শোভার ও আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। দীর্ঘ-কেশ ধারণ তাহারা নারীজীবনের, একটী কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। আমার স্বর্গগতা পত্নীকে অন্তিমশয্যায় চুল কাটিতে বলিয়াছিলাম, সে কাঁদিয়া দুই চক্ষু ফুলাইয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস, মাথার চুল, সিঁথির সিঁদূর, হাতের নোয়া, এই তিনটি বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকিলে, এ লোকেই কি, আর সে লোকেই কি, তাহারা ভাগ্যবতী বলিয়া গণ্যা হইতে পারে। বুঝি এই গর্ব্বেই স্ফীত হইয়া, একদিন হিন্দুরমণীগণ দীর্ঘ বেণী দুলাইতে দুলাইতে পতিসঙ্গে চিতারোহণ করিতেন। সুতরাং এ হেন পবিত্র বস্তুর ইতিহাস 'আনন্দে' আলোচিত হইতে আপত্তি কি ?

যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, পাশ্চাত্যভাবের যেরূপ বিচিত্রহিল্লোল উঠিয়াছে,—চুল আর বেশীদিন থাকে কি না সন্দেহ। চুল গেলে কিন্তু ভারতীয় কাব্যশালার একটী প্রধান সৌন্দর্য্যই লোপ পাইবে। আহা, এই চুলের উপমা সংগ্রহের জন্য, অদ্ভুতকর্ম্মা কবিরা কত নাগলোক, মেঘলোক, ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন ! এখন এই চুল গেলে "সাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে" আর 'লুকাইবে কি' ? ফলে সৌন্দর্য্যপিপাসুর প্রাণে সর্পাঘাৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে !

চুল যায় কেন ? আমরা ত দেখি চুলের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য চারিদিকে যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন চলিতেছে। নিত্য নব নব আবিষ্কৃত কেশ তৈলের সুগন্ধে বাজার আমোদিত হইতেছে। তাই আবার প্রত্যহ হাজার হাজার শিশি গৃহে—ভবনে নীত হইয়া সীমন্তিনীকুলের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের বাহার বাড়াইয়া তুলিতেছে। চুল আরাধনায় যত কুসুমগন্ধ ছড়ান হইতেছে, দেবারাধনায় তত ধুপ গুগ্গুল খরচ হইতেছে না ! এ অবস্থায় চুল যায় কেন ?

পাঠক ! যাইবার সময় হইলে কাহাকেও ধরিয়া রাখা যায় না। এ তো চুল, এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া জাতিকুলও ত মানুষের ভাসিয়া যাইতেছে ? কি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে, কে বলিবে ? তবে একটী কথা খুব সাহসের সহিত বলা যায়, "আজ যেইখানে দেখি আনন্দকানন, কাল সেই স্থানে দেখি ভীষণ শ্মশান" ! সংসারে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই। অতএব এই

অনিত্যধামে, চুল যে অমর বর লইয়া আসিয়াছে, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না ; সুতরাং চুলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত।

আর্য্য রমণীগণ কবে যে এই চুলের বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিরাকরণ করিবার উপায় নাই, তবে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ঐ বোঝা তাহাদের মস্তকে উঠিয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কোষে 'সীমন্তিনী' বলিয়া স্ত্রীদিগের একটী সংজ্ঞার নির্দ্দেশ আছে। সীমন্ত—অর্থ—সিঁথি, সিঁথি যার আছে সে সীমন্তিনী। দীর্ঘ চুল ছাড়া ছোটখাটো চুলে জমকাল সিঁথি উঠিতে পারে না। আর যদি সাধারণ সিঁথিও সীমন্তিনী শব্দের লক্ষ্য হইত, তবে পুরুষ পর্য্যায়েও "সীমন্তী" শব্দ থাকিত। তা যখন নাই, তখন সীমন্তিনী শব্দে দীর্ঘ কেশকেই প্রতিপন্ন করিতেছে। যদি বল 'পরবর্ত্তী কোষকারদের অনবধানতায় বিশেষণ বিশেষ্য হইয়া গিয়াছে।' আচ্ছা বেদের ন্যায় প্রাচীন তো আর কিছুই নাই ? সেই বেদোক্ত দশসংস্কারের একটী সংস্কারকে সীমন্তোন্নয়ন বলে। আদি গর্ভে, চতুর্থ মাসে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সেই বৈদিককাল হইতেই আর্য্য রমণীগণ কুন্তলশোভা বিস্তার করিয়া আসিতেছেন।

পুরাণে তো স্পষ্টই উল্লেখ আছে। যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

উৎপত্যাচ প্রগৃহ্যোচ্চৈ দেবীং গগনমাস্থিতঃ।

অর্থাৎ 'শুম্ভ দেবীকে গ্রহণ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আকাশে উঠিল।' যে শুম্ভ,—

তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্।

অর্থাৎ 'সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন কর' বলিয়া স্বীয় সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ করিয়াছিল, সেই শুম্ভ দেবীকে গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্ব-সঙ্কল্প নিশ্চয়ই পালন করিয়াছিল। তবে মার্কণ্ডেয় ঠাকুর মাতৃ-অবমাননার কথাটুকু গোপন রাখিবার জন্যই মোটা মোটা "দেবীকে গ্রহণ" করিয়া বলিয়াছেন।

যথা—রামায়ণে :—

বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্দ্ধজেষু করেণ সঃ।

ঊর্ব্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা॥

অর্থাৎ—"রাবণ বামহস্তে কমললোচনা সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। যথা মহাভারতে :—

"দুঃশাসন রোষভরে গমন করিতে করিতে বেগে তাহার (কৃষ্ণার)

পশ্চাদনুসরণ করিল, পরে সেই নরেন্দ্রমহিষীর নীলবর্ণ তরঙ্গিত কেশদাম ধারণ করিল।

বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ।

স্ত্রীলোকের দীর্ঘকেশের অনুকূলে এই প্রমাণগুলি বহুদিন হইতেই জনসমাজে প্রচলিত আছে, এখন প্রচলিত নাই এইরূপ একটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু এক কথা, 'আপাণ্ডু গণ্ড পতিতা তাল কুন্তলালী' হইয়া ইহারা যে কেবল 'সুয়রাণী দুয়রাণী' সাজিয়া সুখে জীবনাতিবাহিত করিতেছেন, তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে দুঃখকেও বরণ করিয়া লইতেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে, রামায়ণে মহাভারতে, চণ্ডী, সীতা ও পাঞ্চালীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা তো দেখাই গেল; এখন ব্রহ্মপুরাণের কথা বলি। ব্রহ্মপুরাণে দেখিতে পাই,—বিশ্বকর্ম্ম-দুহিতা শ্রীমতী সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। তিনি সূর্য্যের তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন আপনার অনুরূপা ছায়া নাম্নী এক রমণী সৃষ্টি করিলেন। সেই সদ্যোজাত রমণী তখন সংজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?" সংজ্ঞা বলিলেন "আমি এখনই এই গৃহ হইতে প্রস্থান করিতেছি, তুমি আমার স্থলবর্ত্তিনী হইয়া, আমার পুত্রকন্যাগুলিকে যত্নের সহিত লালন-পালন করিবে; আর পত্নীরূপে সূর্য্যকে ভজনা করিবে। কিন্তু সাবধান তুমি যে আমি নও স্বতন্ত্র একজন, একথা সূর্য্যকে বলিবে না।" ছায়া উত্তর করিল :—

আকচগ্রহণাদ্দেবি আশাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি নমস্তভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখং॥

অর্থাৎ কথা রইল যে "সূর্য্য যে পর্য্যন্ত আমার চুলের মুঠিটী ধারণ না করিবেন ও যে পর্য্যন্ত আমাকে শাপ দিতে উদ্যত না হইবেন, সে পর্য্যন্ত এ কথা আমি কহিব না।"

পাঠক! দেখিলেন কি বিপদ্? এই বিপদ্ কিন্তু সেই স্মরণাতীককাল হইতেই সীমন্তিনীদের পাছে পাছে ফিরিতেছে। উচ্চনীচ, ভদ্রাভদ্র, বিচার নাই, সর্ব্বস্তরেই সময় সময় ঐরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে! তবে পাঠিকা কুলের সান্ত্বনার নিমিত্ত একথা আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান "নারীবশ মানবের" যুগে তাহাদের সেই ঋষ্টি কাটিয়া গিয়াছে। কুন্তল সজ্জার ইতিহাস আমরা এইখানেই শেষ করিলাম।

স্মৃতিপঞ্চাননের স্মৃতি।*

——০ঃ*ঃ০——

যে কার্য্যে যতটুকু চেষ্টা থাকে সেই কার্য্যে ততটুকু ফল পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "কৃতি-জন্যা ভবেচ্চেষ্টা।" চেষ্টাটাই সফলতা লাভের সদুপায়। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। উহা ইহজন্মের শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে। যদি বল পূর্ব্বজন্ম মানি কেন? ন্যায় ইহার সুন্দর যুক্তি দিয়া গিয়াছেন। নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক কেন হয়? ন্যায় বলিতেছেন—"পূর্ব্বাভ্যস্ত-সংস্কারানুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ।" ঐরূপ আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রবৃত্তিও জীবের পূর্ব্বাভ্যাসমূলক। উহার জন্য কাহারও শিক্ষা পাইতে হয় না। শিক্ষা পাইতে হয় মনুষ্যত্ব-সাধনের জন্য। মনুষ্যত্ব-সাধন ছাড়া মানুষ মানুষ হয় না। ঐ আহার, নিদ্রা, মৈথুন আর হিংসাহিংসী লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাহাতে তাহাকে পশু হইতে পৃথক্ ভাবা যায় না। সেই মনুষ্যত্ব-সাধন শিক্ষা-সাপেক্ষ, শিক্ষা চেষ্টা সাপেক্ষ। শিক্ষাপ্রণালী বহুবিধ। লৌকিক, ব্যবহারিক, শাস্ত্রিক কত রকমের শিক্ষাই সংসারে রহিয়াছে। মনুষ্যত্বলাভের জন্য ঐ সব রকম শিক্ষারই প্রয়োজন। লৌকিক, ব্যবহারিক তো চাই-ই, শাস্ত্রিক শিক্ষাও না হইলে চলে না। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্, পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্।" এই সব শিক্ষা ছাড়া, আর একটী শিক্ষা আছে, তাহাকে কৃতী লোকের স্মৃতি অনুধ্যান বলে। আজ আমরা সেই শুভ উদ্দেশ্যেই এখানে মিলিত হইয়াছি। যদিও এইটা শোকসভা, কিন্তু এই শোক প্রকাশ আমাদের বিফলে যাইবে না। স্মৃতি পঞ্চানন মহোদয়ের স্মৃতি অনুধ্যানে আমাদের অনেক শিখিবার কথা আছে।

তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাড়ীতে 'দুধভাত' খাইয়া, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নহে,—বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। আজ হয়ত রেল, ষ্টীমারের সাহায্যে ইহাপেক্ষা দূরদেশেও লোক যাইতেছে। কিন্তু যখন রেল ষ্টীমার ছিল না, "মধুপুরের" বিখ্যাত জঙ্গলের মধ্য দিয়া কেহ দক্ষিণমুখী হইতে সহজে সম্মত হইত না, তখন বিদ্যারাধনার জন্য স্মৃতি পঞ্চাননের ঐ রূপ আত্মোৎসর্গ প্রশংসার কথা নহে কি? বস্তুতঃ এই অদম্য উৎসাহের ফলে তিনি সুন্দর

* পণ্ডিত ৺ব্রজকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের শোক-সভায় পঠিত।

পাণ্ডিত্যও লাভ করিয়াছিলেন। ছিলেন তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত—কিন্তু কিছু কিছু সকল শাস্ত্রেই তাঁহার গতি ছিল। যে শাস্ত্রের পণ্ডিতই হউক না কেন, স্মৃতি পঞ্চানন মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ইহা কম কথা নয়। এইরূপ একটী প্রয়োজনীয় বস্তু হারাইয়া আমরা যথার্থই আজ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। আর এমন লোক না হইলে এ অভাব পূর্ণ হইবার নহে। অথচ সংসারের নিয়ম এই যেমনটী যায় তেমনটী আর হয় না। এ অবস্থায় স্মৃতি পঞ্চাননের স্থান যে আর পূর্ণ হয় সম্ভব কি ?

সকল সৎকার্য্যের অগ্রণীই স্মৃতি পঞ্চানন ছিলেন। এই গ্রামের আদি সভা "সদ্ভাব সম্বর্দ্ধিনী।" তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্মৃতি পঞ্চানন।

এই গ্রামের লোক যৎকালে 'সংবাদপত্র' কি, জানিত না, তৎকালে স্মৃতি পঞ্চানন 'সোমপ্রকাশ' 'নববিভাকর' লইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এই গ্রামের আদি 'সংবাদপত্র' পাঠক স্মৃতি পঞ্চানন।

এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে এখন পর্য্যন্তও কেহ বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলন করেন না। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্মৃতি পঞ্চানন 'লৌহিত্য জ্ঞানদীপিকা' নাম্নী পুস্তিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করেন। এই গ্রামের আদি বাঙ্গালা সাহিত্যিক স্মৃতি পঞ্চানন।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠানুরক্তি একটী মহৎ গুণের মধ্যে। স্মৃতি পঞ্চানন সে গুণেরও আদর্শ ছিলেন। তিনি সারাটি জীবন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুগত হইয়া চলিয়াছেন। এরূপ কয়জনে পারে ? শেষ জীবনে ভাগবাটওরা লইয়াও দুইজনের মধ্যে 'কাজিয়া কচায়ন' ঘটে নাই। প্রীতিভাবেই তাহা সম্পন্ন করেন।

স্মৃতি পঞ্চানন স্বার্থপর ছিলেন না, প্রতারক ছিলেন না, বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, অপক্রোধী ছিলেন না। বিনয়ী, বিনম্র, অমায়িক, সাধুচরিত্র ছিলেন। সকলের সহিতই হাসিখুসী মুখে কথা কহিতে ভালবাসিতেন। 'দেমাক্' করিতে জানিতেন না। শিশুটিও তাঁহাকে খেলার সাথী মনে করিত। তাহার শিশু পৌত্র 'মধু' একদিনও তাঁহাকে 'তুই' ছাড়া আপনি বলিত না। অথচ বাড়ীর আর কাহাকেও তার 'আপনি' বলিতে আপত্তি নাই। এই একটী কথাতেই স্মৃতি পঞ্চানন চরিত্রের মাধুর্য্য অনুভব করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্মৃতি পঞ্চাননের স্বদেশভক্তির পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। স্বগ্রামে ও অন্যান্য গ্রামে যতগুলি সভা হইয়াছিল সবগুলিতেই

তিনি নিরূপত্তে যোগ দিয়াছেন। উৎসাহে তিনি যুবকদলকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। এরূপ উৎসাহশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধিক দৃষ্ট হয় না।

শীর্ণকায় সংক্রান্তি পুরুষ হইয়াও সেই মুসলমান বিপ্লবের সময় তিনি যে দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা বহুদিন স্মরণ থাকিবে। সেই রক্তচন্দনের ফোটা কপালে, রুদ্রাক্ষমালা গলে, উন্মুক্ত কৃপাণ করে, ব্রহ্মতেজোদীপ্ত মূর্ত্তিটী দেখিয়া জয়দেবের সেই—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত 'কল্কি' শরীর
জয় জগদীশ হরে!"

স্তোত্রটী মনে পড়িয়াছিল। বাস্তবিক ভালকাজের দিকে যাইতে স্মৃতি পঞ্চানন ইতস্ততঃ করিতেন না। লাভালাভ জানিতেন না। এমন জড়ভাবাপন্ন লোক অনেক আছেন, তাহাদিগকে ঠেলিয়া ধাক্কাইয়াও তাহাদের অভ্যস্ত কাজের অতিরিক্ত এক কাজে লাগান যায় না। স্মৃতিপঞ্চানন সেই ধাতের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন "পাগ্‌লা না' ডুবাবে? আমি প্রস্তুত" ধরণের লোক।

তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে চারিজনের নাম উল্লেখযোগ্য। যথা—মথুরানাথ স্মৃতিভূষণ, কালীকমল স্মৃতিরত্ন, রামেশ্বর কৃতিরত্ন, কৃষ্ণদাস সাংখ্যরত্ন। আর এক জন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল সে বাঁচিয়া নাই। আমার মত পোড়ারমুখো ছাত্র অনেকই তাঁর বাঁচিয়া আছে। ইহাদের নামকীর্ত্তনে স্মৃতিপঞ্চাননের স্মৃতি উজ্জ্বল হইবে না। তবে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এর অনুরোধে তাঁহার অপকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্য হইতে একটীকে বাছিয়া লইলাম। তিনি "চান্দুরা"র লোকনাথ গোস্বামী। পড়িতেন তিনি সন্ধিবৃত্তি, কিন্তু সংস্কৃত লিখিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। একদিন তিনি তাহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"চন্দ্রদ্বীপনিবাসীনং লোকনাথস্য নিবেদনং
মম ভ্রাতৃমাতৃজনকায়াং সর্ব্বত্র সর্ব্বমঙ্গলং।
ত্বং মঙ্গলং ন জানাসি নিতান্তয়া ব্যস্ত মনং
যত ধূমধামায়শ্চ সর্ব্বত্র ভাই, ভুলনত্বং॥"

আপনারা হাসিতেছেন, আমি মনে করি ইনি পড়িলে মানুষ হইতেন। পরিশেষে নিবেদন এই যে স্মৃতিপঞ্চাননের সুদীর্ঘ জীবনী 'আনন্দে' বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে।

স্নেহ প্রতিমা।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশার মোহিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হতোদ্যম রামজীবন যখন "গুরু গুরু" বলিয়া এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল, আর মনে মনে কোপিতা পত্নীর সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছিল, তখন কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা ভার্য্যা রামমণি তাহারই পার্শ্বে পাশ ফিরিয়া ঘন ঘন নাক ডাকাইতেছিল।

এই তো সংসারের নিয়ম! যখন দয়ার একান্ত আবশ্যক হয় তখন দাতার হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে! যখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে তখন সম্মুখে মরু ধূ ধূ করিতে থাকে! যখন বিষ নীচে থাকে তখন 'তাগা' বাঁধিবার সূত্রের অভাব ঘটে!

পাঠক! এক কথায় এই দম্পতিযুগলের আভ্যন্তরিক অবস্থা আপনারা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। কাহার কি চরিত্র, তাহারও মোটামুটি আভাস আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি ইহাদের গৃহস্থালীর অস্ফুট চিত্রটিও মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক আমরা যখন রামজীবন ও রামমণিকে প্রথমই আনিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তখন ইহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের সুবিধা ক্রমে আমরাই করিয়া দিতেছি।

রামজীবন রায় গোপীনাথপুরের একজন বনিয়াদী বংশের সন্তান। পৈতৃক বিপুল অবস্থার সহিত যখন ছাড়াছাড়ি ঘটে, তখন রামজীবনের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র। সংসারে এক খুল্লতাত ছাড়া আর তার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। গর্ভস্থ অবস্থায় পিতৃবিয়োগ, ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ পরে মাতৃবিয়োগ, ৩ বৎসর বয়সের সময় ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটে। ভাইটী রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ছিল। পিতৃব্য শিবপ্রসাদ অকৃতদার ও অকপট শিবভক্ত ছিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত রুদ্রেশ্বরের সেবায় আত্মমন উৎসর্গ করেন। শিবপ্রসাদ রুদ্রেশ্বরের মন্দির ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। যেন রুদ্রেশ্বরের মন্দির ও অঙ্গন ছাড়া আর কোন স্থান তাহার ভাল লাগিত না। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন এত শৈশবে এরূপ ভগবন্নিষ্ঠা কাহারই জন্মিতে পারে না। আরও আশ্চর্য্য এই যে শিবপ্রসাদ সমবয়সী বালকদিগের সঙ্গেও বড় বেশী মিলামিশা করিতেন না। সেই রুদ্রেশ্বরের বাটীতেই অষ্ট প্রহর থাকিতেন। স্বতন্ত্র পরিচারক থাকিতেও রুদ্রেশ্বরের পরিচর্য্যা তিনি নিজে করিতেন। ভোরে উঠিয়া ফুল বিল্বপত্র নির্ব্বাচন,

চন্দন পেশন, নৈবেদ্য করণ, এ গুলি একমাত্র তাহারই অধিকারভুক্ত ছিল। পরে যথাকালে কুলগুরু হইতে শিবপূজা লইয়া শিবপ্রসাদ বৃদ্ধ পূজারীকে রুদ্রেশ্বরের পূজা হইতে অব্যাহতি দান করিলেন। অবশ্য তার বৃত্তি লোপ করিলেন না, সে প্রত্যহ যথানিয়মেই চাউল, কলা, দক্ষিণা পাইয়া আপনাকে একজন ভাগ্যবন্ত পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

রামজীবনের পিতা উমাপ্রসাদ শিবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদকে একমাত্র সহোদর জ্ঞানে, অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শিবপ্রসাদকে তিনি সংসারের দিকে কত টানিলেন, সংসারী জীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কত বুঝাইলেন, শেষে নিজে পরাস্ত হইয়া সমবয়স্ক যুবকদের দ্বারা কত মায়াজাল বিস্তার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শিবপ্রসাদকে স্ববশে আনিতে পারিলেন না। এত প্রলোভনেও ষোড়শবর্ষীয় যুবকের মন সংসারের দিকে হেলিল না। কুলদেব রুদ্রেশ্বরের চরণেই অনড়—অচল হইয়া রহিল। উমাপ্রসাদ নিরুপায় হইয়া পৈতৃক বিষয় আশয় সম্বন্ধে এক নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া রাখিলেন। শিবপ্রসাদও তাহাতে নীরবে দস্তখত করিলেন। এই নিয়মপত্র সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই তিন বৎসরের পুত্র হরিজীবন, আর রামজীবনকে তাহার মাতৃগর্ভে রাখিয়া উমাপ্রসাদ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুই মাস পরে রামজীবনকে প্রসব করিয়া পত্নী হরিপ্রিয়াও উমাপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। এই দুর্ঘটনায় সাধু শিবপ্রসাদ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন না যে সেই রুদ্রেশ্বরের সেবা ছাড়া সংসারের অন্য অবান্তর কাজে তাহার হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। অনাথ শিশুর লালনপালন, বিষয় আশয় রক্ষণের দিক হইতে যখন শিবপ্রসাদের ডাক পড়িল, তখন তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। আজন্ম বৈরাগ্য লব্ধ শান্তির দেশে যেন অশান্তির তুমুল তুফান ছুটিল। মুহুর্মুহুঃ 'শিব শিব' ধ্বনিতে রুদ্রেশ্বরের মন্দির বিকট শব্দায়মান হইতে লাগিল। প্রবাদ এই যে সহসা এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া ভক্ত শিবপ্রসাদের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিলেন। সেই অপূর্ব্ব ঘটনার চিত্রই পাঠকগণের সমক্ষে অগ্রে উপস্থিত করিব।

ক্রমশঃ।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

আনন্দ।

আগমনী।

—:*:—

(টপ্পা)

গিরিরাজ, আর তো সহেনা ব্যাজ
আস্‌বে না কি আমার উমাধন ?
শুনি লোকে ক'য়ে থাকে
মিথ্যা হয় না ভোরের স্বপন।
এই আসে এই আসে ক'রে
আশাতে প্রাণ আছি ধ'রে
আসেত সে সম্বৎসরে
তিন দিনের কারণ,
আমার বক্ষের আগুন বক্ষে থাকে
হয় না চ'ক্ষের জল নিবারণ।

(ঝুমুর)

আঁধার ঘর ক'রে উজর হে গিরিবর,
ঐ—বুঝি—উমা আমার এ'ল।
আমি তারে লইগে কোলে
তোরা একটু উলু দেলো।
না জানি পথে পথে
কত রোদ লাগ্‌ছে রথে
উমা নবনী হ'তে—
অতিশয় কোমল,
এই লাগিয়ে উমার কারণ
আমার ভাব্‌তে ভাবতে জীবন গেল।

এস মা।

—:*:—

কোন্ অতীতের কোলে পাতি' কুশের আস্তরণ
কবে ক'রেছিল কে 'হ্রীংদুর্গে' উচ্চারণ !
বর্ষা-অপগমের চিহ্ন থাকিতে অৰ্দ্ধেক
শরৎ ঋতুর হ'য়েছিল স্বর্ণ অভিষেক।
কবে বা সে হৈমসন্ধ্যা এ'সেছিল নে'মে
দুঃখের স্মৃতি শোকের গীতি অম্‌নি গেল থে'মে।
কবে শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা করিয়া বাদন
বিল্বমূলে ক'রেছিল তোমার আবাহন !
সহসা সে সূক্ষ্ম সত্তা এম্‌নি গেলে ভুলি
সোণার কিরণ ছড়া'য়ে চে'লে পলাশ নয়ন মেলি !
দশদ্দিকে মা দশটি হস্ত ক'রে প্রসারণ
দেবকে দিলে অভয়বর, দনুজকে দি'লে রণ !
আজো দেখি সেই আমন্ত্রণ দিয়ে ভুবনবাসী
বৎসরান্তে দূর করে মা, দুরিত যন্ত্রণারাশি !
আজো দেখি মূর্ত্তিখানির মনের মতন গ'ড়ে
স্বাহা, স্বধা, বষটকারে তোমায় অর্চ্চা করে !
আজো দেখি আশ্বিন আসে ভাদ্র যখন যায়
তোমার আসা-পথ পানে মা, ঘন ঘন চায় !
আয় তবে মা, শরৎ পুনঃ দ্বারেতে অতিথি
সেই এ'সেছে শুক্লপক্ষ,—সেই এসেছে তিথি !
সেই ফুটেছে পদ্ম-কুমুদ, সেই ছু'টেছে ঘ্রাণ
সেই উঠেছে ঘরে ঘরে—আগমনীর তান !
আয় জননী জগন্ময়ী ত্রিপুরাসুন্দরী
চিত্ত পুরে থাক্‌লে তোরে চিন্‌তে ত না পারি !
* * * *
কৃপা করে দীনের ঘরে আয় শারদা আয়
দুটু রক্তজবা ফুল রাখি রাঙা পায় !

———

মেনকার স্নেহ।

———০:*:০———

কন্যা তো অনেকেরই হয়, যথাকালে তাহাকে পাত্রস্থও অনেকেই করে, কিন্তু গিরিরাজার গৃহে এমন কন্যাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কন্যা এমন পাত্রেই সমর্পিতা হইয়াছিলেন যে একদিনের জন্যও গিরির গৃহ-গঞ্জনার শেষ হইল না, এক দিনের জন্যও গিরি নিশ্চিন্তে দুই গ্রাস অন্ন মুখে দিতে পারিলেন না, কি এক মুহূর্ত্তের জন্য গিরি—গিরিরাণীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না! মেয়ের পিতা হইয়া গিরির ন্যায় লাঞ্ছনা বোধ হয় কাহারও ভোগ করিতে হয় নাই।

গিরিরাণীর উমাগত প্রাণ। তাঁহার উমার মতন সুন্দরী কন্যা ভুবনেই জন্ম গ্রহণ করে না। মরি মরি, কি মুখ, কি চোখ, তদুপরি কি কাঁচা সোণার রঙ গো! উমা ঢল ঢল নয়নে যখনই চায়, প্রাণের শত জ্বালা-পোড়া তখনই জুড়াইয়া যায়! উমা হেলিয়া দুলিয়া যখনই কাছে আসে, গিরিরাণীর প্রাণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভাসে! উমা 'মা মা বলিয়া যখনই ডাকে, গিরিরাণীর কি আর কোন সুখ অপ্রাপ্ত থাকে? এহেন কন্যারত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়া গিরিরাণী আপনাকে ধন্য মনে না করিবেন কেন? আর বাৎসল্যের স্রোতেই বা গা ভাসাইবেন না কেন? তবে এই স্নেহ-সমুদ্র হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে তাহা পড়িয়াছে ভুবনবাসীর ভাগ্যে,—গিরির ভাগ্যে পড়িয়াছে হলাহল!

গিরির অপরাধ অপাত্রে কন্যা সমর্পণ। রাজকন্যার রাজপুত্রই বর হইয়া থাকে, কিন্তু একথা গিরি একবারও ভাবিলেন না, একটা "ন অন্ন ন বস্ত্র নচ বারিপাত্র" গোছের পাত্রের হাতে উমাধনকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। তার পর সেটা মানুষের মতন চাল চরিত্রের লোক হইলেও বা গিরিরাণী কতক দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিতেন। না—তার পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, শিরে জটা, শরীরে ভস্ম, ভাঙ্-ধুতুরা সেবনে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন, বাহন হইয়াছে বৃষ, সঙ্গী হইয়াছে ভূত প্রেত, গতিবিধির স্থান হইয়াছে শ্মশান! এহেন অদ্ভুত চরিত্রের জামাতৃলাভ করিয়া গিরিরাণী মোটেই সুখী হইতে পারিলেন না এবং তাহার সোণার পুতুলীকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া গিরি যে কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আছেন ইহাও পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাই যে হইতে উমা শিবের গৃহে গিয়াছেন, সেই হইতে মেনকা গিরির উপর খড়্গ হস্ত হইয়া বসিয়াছেন।

শিবের মহত্ত্ব শিবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সাফাই গাহিতে গিরি অবশ্য ত্রুটি করেন নাই। তাহার প্রাণাধিকা উমাকে তিনি যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় সৎপাত্র ত্রৈলোক্যেই সম্ভব হইয়া উঠে না, ত্যাগের প্রকট-মূর্ত্তি, পরম উদারাশয়, আশুতোষ শিব যে উমার উপযুক্ত পতিই হইয়াছেন একথা মেনকাকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া কহিলেন, কিন্তু গিরির এই আত্মপ্রসাদের মর্ম্ম মেনকা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাই উমাকে কৈলাসে পাঠাইয়া মেনকা 'উমা উমা' করিয়া অস্থির হইলেন, আর "গিরি, উমাকে আন্‌তে যাবে না" "গিরি, উমাকে আন্‌তে যাবে না" বলিয়া গিরিকেও অস্থির করিয়া তুলিলেন।

গিরি মহাশঙ্কটে পড়িলেন। খাইতে উমা, বস্‌তে উমা, শুইতে উমা আর কত শুনা যায়? অথচ তিনি জানেন মেনাকার এই আকুলতার কোন মূল নাই। তাহার আর কি ঐশ্বর্য্য—ধনাধিপ কুবেরের ঐশ্বর্য্যই শিবের চরণ তলে গড়া-গড়ি যাইতেছে। জয়া বিজয়ার ন্যায় সহচরী, নন্দীভৃঙ্গীর ন্যায় ভৃত্য উমাকে সতত যত্ন শুশ্রূষা করিতেছে। এক কথায়, সেই শিবধামে শিব-সীমন্তিনী উমার পরম সুখেই দিনাতিবাহিত হইতেছে। এই অবস্থায় ঘন ঘন উমার তত্ত্ব লওয়ার, কি উমাকে স্বগৃহে আনিয়া দীর্ঘকাল রাখার কারণ গিরি কিছুই খুঁজিয়া পান না। কিন্তু মেনকার ভ্রান্তধারণার ফলে তাহার উপর যে তাড়না উপস্থিত হইয়াছে তাহার চোটে গিরি আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন না।

এদিকে শিবের গৃহে উমাই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বলিতে কি যে হইতে উমা কৈলাসে গিয়াছেন সেই হইতে শিবের একটা গৃহযোত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে শিব গৃহের কোনই ধার ধারিতেন না। নিরন্তর শ্মশানেই থাকিতেন। কারণ তাঁহাতে অনিমাদি অষ্টগুণ অধিষ্ঠিত থাকায় যোগ ছাড়া কোন চিন্তাই সূচিত হইত না। শ্মশান ছাড়া অন্যস্থান তাঁহার ভাল লাগিত না। উমা গিয়াই শিবকে যোগনিদ্রা হইতে জাগাইলেন, ত্যাগের পথ হইতে ভোগের পথে আনিলেন, সুন্দর-ঘরকন্না পাতিয়া সন্ন্যাসীকে সংসারী সাজাইলেন। এখন শিব উমার গুণে উমার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছেন যে উমাবিরহ একদণ্ডও সহ্য করিতে পারেন না, উমা একটু চক্ষের অন্তরাল হইলে ভুবন শূন্যময় দেখেন। উমা পতি-সোহাগিনী হইয়াছেন দেখিয়া গিরির আনন্দের সীমা নাই। তাই উমারে স্বগৃহে আনিয়া শিবের কষ্ট উৎপাদন করিতে চান্ না। উমা বৎসরে একবার আসেন, তিন দিন আনন্দ দান করেন, তাহাই গিরি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু মেনকা ভাবেন সংসার-বিরাগী জামতার হস্তে পড়িয়া তাঁহার উমা

না জানি কত কষ্টই করিতেছে! কত না জানি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে! উমার কমলনয়নে কত না জানি জলধারা বহিতেছে! উমার কপোল বহিয়া কত না জানি ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে! তাহার আদর না পাইয়া উমা না জানি কতই শীর্ণ হইয়া যাইতেছে! তাই তিনি উমাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করেন, গিরিকে উমা আনিতে কৈলাসে যাইতে বলেন, গিরি এই অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দেন না, ইহাতেই গিরিগৃহে উমাঘটিত কলহের বিরাম বিচ্ছেদ ঘটে না!

বাস্তবিক কন্যাবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্যই মেনকা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। মেনকার ন্যায় কন্যাকে কেহ ভাল বাসেও নাই, বাসিবেও না। আমরা দেখি প্রাণোপমা দুহিতাকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া সংসারের বহু রমণীই গৃহকাজে মনোনিবেশ করেন, তাহারা দেখুন উমাবিরহে মেনকার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে! আহার নাই, নিদ্রা নাই, উমার কারণ গিরিরাণী আজ সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আর "গিরি, উমাকে আন্‌তে যাবে না" "গিরি, উমাকে আন্‌তে যাবে না" এই বাক্যই সার করিয়াছেন। মাতৃগণ! যদি কন্যা স্নেহের মাধুর্য্য অনুভব করিতে চাও তবে মেনকার দিকে একটু লক্ষ্য কর।

প্রার্থনা সঙ্গীত।

(সখী-সংবাদের সুর।)

(চিতান।)

কর্ম্মদোষে জন্ম নিলেম, ভবেতে এ'সে।
মিছে মায়া মদে, ঘোর বিপদে, ফেলা'লো শেষে
মাগো, আছি কেবল 'আমি'র উদ্দেশে।

(লহর।)

মাগো, শিখেছি এক 'আমি'র বড়াই
সেই 'আমি'র ত মূল কিছু নাই
শুধুই গোল করা,
মাগো, 'আমি' আসল আমি হ'লে
সেই 'আমি' কি ঘুচ্‌ত ম'লে
মিছে 'আমি' 'আমি' ব'লে
ভুলেতে গেছে পড়া !
'আমি'র তত্ত্ব একদিন'ত ক'রে দেখ্‌লাম না,
আমায় কেবল 'আমি' জে'নে
কর্‌ছি ভবে বেচা কেনা।

(মিল।)

ভুল ভেঙ্গেদে ভবদারা, 'আমি'র একটা পাইয়া যাই সীমা !

(অন্তরা।)

জন্মিলাম যে 'আমি' ল'য়ে, সেই 'আমি' গেল গত হ'য়ে
শেষ কালে কি না,
পাইয়াছে যৌবনের 'আমি' বার্দ্ধক্যের সীমা !
এই 'আমি'রও দিন দুই চারি থাক্‌ব 'আমি' অধিকারী
'আমি' যখন যাবে ছাড়ি সেই 'আমি'র সঙ্গী দেখি না !

(মিল।)

"ভুল ভেঙ্গেদে" ইত্যাদি।

(খাদ।)

আমি গেলে 'আমি'র আর ত অর্থই থাক্‌বে না।

(লহর।)

যখন দেখবে লোকে 'আমি'র ভিতর
'আমি' একটা হয় অন্যতর
'আমি'র কেউ সে না,

তখন 'আমি'র দশা চিন্তা করি
বল্‌বে সবে "হরি—হরি"
বল্‌ দেখিগো ও শঙ্করী,
এই 'আমি'—'আমি' কি না ?
" 'আমি'র তত্ত্ব" ইত্যাদি।

(ঝুমুর।)

মিছে 'আমি' 'আমি' করা।
একদিন আমি গেলেই 'আমি' মড়া।
আমি যে এই 'আমি' ছাড়া
যায় ত না মা বুঝ্‌তে পারা
'আমি'র এম্‌নি ধারা,
পরলেই 'আমি'র কলে, 'আমি' ক'রে তোলে
মহেশ বলে 'আমি' ঘুচাও ত্বরা !

আবাহন।

সারাটি বরষ গণিয়া দিবস
র'য়েছি তোমার আশে,
আয় অম্বে আয় জগদম্বে
দীন সন্তান পাশে !
আসিবে বলিয়া ফুটেছে কুসুম
কানন ভরিয়া হাসি,
আসিবে বলিয়া তারকার সাথে
গগনে পাগল শশী !
হাসিছে কমল সরসী সলিলে
অমল আনন খুলি,

বন্দনা তোমার গাইছে বিহগ
পঞ্চমে রাগিণী তুলি!
ঘরে ঘরে কিবা আনন্দ লহরী
নবীন আবেগ ভরা,
নবীন আবেগে বালক বালিকা
নাচিয়া হাসিয়া সারা!
ভুলে গেছে বঙ্গ রোগ তাপ শোক
মু'ছে যে আঁখির জল
ম্যালেরিয়া জীর্ণ শীর্ণ কলেবর
বাঁধিয়াছে নব বল।
ঋণ ভার গ্রস্থ অসচ্ছল গৃহ
তথাপি পুলকে ভাসি'—
ঋণ পরে ঋণ করিয়ে আবার
গলায় লইতেছে ফাঁসি।
তবু আত্মহারা ও মা সারাৎসারা
নূতন বসন তরে,
আয় গো জননী, বাছা ব'লে তাদের
তুলিয়া লও মা ক্রোড়ে।
পুড়ে' গেছে মা, হৃদয় তাদের
অভাব অনল চুমি,
রাবণের চিতা জ্বলিছে হৃদয়ে
কেমনে বর্ণিব আমি?
কন্যা তোমার ইন্দিরা বাণী
ধন-বিদ্যার খনি,
পুত্র তোমার কার্ত্তিক গণেশ
সিদ্ধি বীরত্বের মণি।
বাহন তোমার দুর্জ্জয় কেশরী
দিব্য অস্ত্রদশ করে,
এহেন মায়ের সন্তান হইয়া
আমরা মরি গো ডরে!

দয়ার আধার তুমি দয়াময়ী
কিসের ভাবনা আর
জননী যাহার রাজরাজেশ্বরী
কিসের অভাব তার ?
এস বঙ্গবাসি, এস ভাই সব
শোক তাপ জ্বালা ভুলি,
জয় জয় দুর্গে দুবাহু তুলিয়া
নাচিয়া নাচিয়া বলি।
বরষের পর মায়ের চরণ
আয়রে পূজার তরে,
শ্রদ্ধা কুসুম ভক্তি চন্দনে
রেখে দাও স্তরে স্তরে।
যত দুঃখ শোক যাইবে ভুলিয়া
হেরিয়া মায়ের মুখ,
মায়ের স্নেহে অমৃত লহরী
ভরিয়া উঠিবে বুক।
যতেক বেদনা যতেক অভাব
কমল-করেতে মুছি,
বদনে চুম্বন দানিবেন মাতা
স্নেহের সলিলে তিতি।
আমরা মায়ের মা আমাদের
হেন মাতা কার আছে ?
এ দীন সন্তান করি আবাহন
যুগল চরণ যাচে।

শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ড কাব্যকণ্ঠ

ভক্তি ও মুক্তি

——০:*:০——

মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কারণে কৈল বেদ আর পুরাণ॥ (চরিতামৃত)

মায়া কবলিত কলিহত জীবের মধ্যে অনেকেই মোহঘোরে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপাতমধুর পরিণাম বিরস ঐহিক সুখের পশ্চাতে আবিষ্টের ন্যায় প্রধাবিত হইয়াছেন। যাঁহারা কুহকিনীর মায়াজালে আবদ্ধ নিজেদের মহাশঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সিংহ-শার্দ্দূল-সেবিত পিঞ্জর মধ্যে আপনাদিগকে পতিত দেখিয়া মুক্তি পাইবার জন্য পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করিলেন। নাগপাশাবদ্ধ বিষানলে জর্জ্জরিত জীবের ন্যায় যখন তাঁহারা ছটফট আরম্ভ করিলেন, তখন উপনিষদ মেঘমন্দ্রস্বরে ডাকিয়া হাকিয়া বলিলেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত" হে মুগ্ধ জীব, হতাশ হইও না উঠ, পুরুষার্থ সঞ্চয় কর।

অমনি অন্যদিক হইতে বেদান্ত গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তত্ত্বমসি" হে ভ্রান্ত জীব, চক্ষু মেলিয়া দেখ, তুমি সেই তুমি সেই। সঙ্গে সঙ্গে সুরে সুর মিলাইয়া শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদের ধ্বজা উড়াইয়া প্রচার করিলেন, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম, দেহের আমিই ব্রহ্ম'। তখন "সোহহং" "সোহহং" রবে ভারত মুখরিত হইয়া উঠিল। বিকারের রোগী যেমন এক বিকার কাটাইয়া আর এক বিকারের মুখে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 'সোহহং' বাদের প্রাবল্যে জীব সেব্য-সেবক সম্বন্ধ ভুলিয়া গেল। দাস প্রভু সাজিয়া বসিল! বেগতিক দেখিয়া ভক্তি দেবী তাঁহার প্রিয় নিকেতন ভারত রাজ্য হইতে সরিয়া পড়িলেন। 'ভজ্' ধাতু হইতে ভক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছেন। ভজ্ ধাতুর অর্থ হইতেছে সেবা। (ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।) যখন সকলেই প্রভু তখন সেবা করিবে কে? ভক্তিদেবীর পরিত্যক্ত রাজ্য তখন ভুক্তি মুক্তি আসিয়া বাঁটিয়া লইলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ জীবের সম্মুখে অতি দুষ্পাচ্য মন্দখাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সকলেই উহা উদর ভরিয়া খাইল। যাঁহারা সবল ছিলেন তাঁহারা কোন প্রকারে সামলাইলেন, আর অধিকাংশই বিষম ব্যাধি ক্লিষ্ট হইয়া যমযন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা জ্ঞানযোগে শান্ত রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অধিকাংশই 'সোহহং' হইতে যাইয়া সং সাজিয়া বসিলেন। মূর্ত্তিমান অহঙ্কার সাজিয়া ধর্ম্মকর্ম্মকে, এমন কি ভগবদ্বিগ্রহকেও

বিদায় দিয়া 'অহম্' সর্ব্বস্ব হইয়া বসিলেন। এই শুষ্ক জ্ঞানের উষ্ণ নিশ্বাসে সমগ্র দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল! সমস্ত সমাজ যার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাই এই দুর্দ্দৈব সময়ে পরম দয়াল শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির বিজয় শুভ্রপতাকা লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইল। প্রথমেই বৈষ্ণব মহাজন তীব্রস্বরে বলিলেন "জীবের পুরুষার্থ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নহে। উহা পুরুষার্থ ত নয়ই, বরং উহা মহা কৈতব, জীবের বন্ধনের হেতু,"

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥ (চরিতামৃত)

তৎপর আরও বিশেষ করিয়া কহিলেন,

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরে বলিলেন,

কৃষ্ণ প্রেম পুরুষার্থ সর্ব্বানন্দ ধাম।

শুদ্ধা ভক্তি হইতে সেই প্রেম লাভ হয়। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তিই এক মাত্র অভিধেয় বা পাইবার উপায়। শ্রীধর স্বামীপাদ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "প্রশব্দেন মোক্ষাভি সন্ধিরপি নিরস্তঃ। স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব বলিয়াছেন" ভুক্তি, মুক্তি, বাঞ্ছা ভক্তি লতার উপশাখা, তাহা সর্ব্বাগ্রে ছেদন করা আবশ্যক;

শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধোগজে।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে॥

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ। ভা ২।১০।৬

আবার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী একটু বেশী মাত্রা চড়াইয়া বলিয়াছেন,

ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে;
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভোগ বাসনারূপ ও মুক্তি কামনারূপ পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ সেখানে ভক্তি সুখ কিরূপে উদয় হইবে?

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,

হরি ভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা শ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

সর্ব্বপ্রকার মুক্তি, সিদ্ধি, ভুক্তি হরিভক্তি মহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ দাসী। যে মুক্তি, যে সাযুজ্য মুক্তি বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবের চরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে; যে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবার জন্য যোগীঋষিগণ কোটিকল্প সাধন করিতেছেন, কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন, তাহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে এরূপ অনাদৃত লাঞ্ছিত, এমন কি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে কি জন্য? "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়" মুক্তির প্রতি এ প্রকার সুতীব্র অনাদর দেখিয়া আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া, অনাবিল বৈষ্ণবধর্ম্মে দোষারোপ করেন। আমরা করযোড়ে তাঁহাদিগকে উভয় ধর্ম্ম মতের আলোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। স্থূল বুদ্ধি আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ইহাও একটী অন্যতম কারণ। এই কৈতবান্ধকার দূর করা যেন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। জীব নিজ স্বরূপ কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। ইহাপেক্ষা চরম দুর্গতি আর কি হইতে পারে? আবার শাস্ত্র তাহাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাপেক্ষা সর্ব্বনাশের বিষয়ই বা আর কি আছে? ইহা শাস্ত্রের ঠিক দোষ নহে; আমাদের যোগ্যতা দেখিয়া শাস্ত্রও আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে আসল বস্তুর নিকটে লইয়া যাইতে চাহেন। ইহাকে বলে "অরুন্ধতী ন্যায়"। আমার ক্ষীণ দুর্ব্বল চক্ষু একেবারেই সেই অতি ক্ষুদ্র "অরুন্ধতী" নক্ষত্র দেখিতে পায় না, তাই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তু দেখাইয়া ক্রমে আসল বস্তু প্রাপ্তি করান। আনন্দ-পিপাসু জীব যখন আনন্দ খুঁজিতে লাগিল, সর্ব্বাগ্রে 'ভুক্তি' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখভোগেই সুখ দেখিতে পাইল। অমনি কামিনী কাঞ্চনের লালসায় জীব পাগল হইয়া উঠিল। ত্রেতাযুগে আমরা ইহার অত্যুজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। কামিনী কাঞ্চনের লালসায় লঙ্কাধিপতি রাবণ স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল। তাৎকালিক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত বহুকাল কঠোর তপোশ্চরণের ফলে ব্রহ্মার বরে, তবে রাবণের ভাগ্যে ঐ ভোগ-বিলাসের জীবন মিলিয়াছিল। স্বর্গই হইল এই সুখভোগের উৎকৃষ্ট স্থান। স্বর্গরাজ সহস্র-চক্ষু ইন্দ্রদেব হইতেছেন ইন্দ্রিয় বিলাসের উজ্জ্বলতম চিত্র। তাঁহার ঐ সহস্র চক্ষুই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। তিনিও বহু ক্লেশে, বহু যাগযজ্ঞ করিয়া তবে এই ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়াছেন। শাস্ত্র শিখাইলেন কামনা করিয়া যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করিলে ঐ সুখধাম স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের তিনটি পুরুষার্থের সিদ্ধিলাভ হইল এইখানে। সুতরাং ইহার জন্য প্রচণ্ড মারামারি, কাটাকাটি, আরম্ভ হইল। চারিদিকে যাগ যজ্ঞ, অশ্বমেধ, নরমেধ

হইতে লাগিল। ভোগরাজ্যে 'নিলাম ডাক' আরম্ভ হইল। 'ডাকাডাকি'র একটা উচ্চ সীমাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইল। একশত অশ্বমেধ করিতে পারিলেই তিনি শতক্রতু ইন্দ্র হইবেন। পরম রমণীয় অমরাবতী, মায় পরম রূপসী, উর্ব্বশী মেনকা, এমন কি ইন্দ্রানি শচীদেবী সমেত তাঁহার হাত হইবে, সাবেক ইন্দ্র বেচারি পদচ্যুত হইবেন। এই ইন্দ্রিয় সুখভোগের মধ্যে কিন্তু এখন একটী রহস্য বাহির হইল। এই ভোগ সুখ নিত্য শাশ্বতিক নহে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত-লোকং প্রবিশন্তি।" তখন যাঁহারা প্রকৃতই সুবুদ্ধিমান তাঁহারা বুঝিলেন ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় প্রকৃত সুখ নাই। উহাতে কামনা বাড়িয়া জীবকে কেবল অনন্ত কাল কামনার পশ্চাতে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কামনা যত বাড়িবে, বন্ধন ততই বেশী হইবে। তাই তাঁহারা ভুক্তির পথ ছাড়িলেন। বুঝিলেন ভোগে সুখ নাই ত্যাগেই সুখ। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়কে কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা দমন করিতে লাগিলেন। 'নেতি নেতি' বিচার করিয়া তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিলেন ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সমস্তই অনিত্য মায়া বিজৃম্ভিত। সময় বুঝিয়া শঙ্করের মায়াবাদ প্রচারিত হইল। জীব বুঝিল আমিও সত্য বস্তু, সুতরাং আমিই ব্রহ্মা। মায়া আমাকে ভেদবুদ্ধি ঘটাইয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভেদাগমে আমি পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করিব। শ্রুতিও দেখাইয়া দিলেন "আনন্দ ব্রহ্মণো-রূপম্" সুতরাং আমি নিত্য অচ্যুত—আনন্দ স্বরূপ। জীবের অসাধ্য কিছুই নাই। মায়া সংসারের সম্যক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া জীব একেবারে সন্ন্যাসী হইল! এইবার ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীব আপনাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বসিল, একেবারে নির্ব্বাণ চাহিল। জীব সব ছাড়িল, থাকিল কেবল মোক্ষ বা নির্ব্বাণ কামনা। ভগবান ত আইনে বাঁধা, বরং ভজনশীল জীবের হাতে। জীব যাহা কামনা করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে, তিনি তাহাই দিতে বাধ্য। গীতায় আমরা তাঁহার শ্রীমুখেই শুনিয়াছি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম"। বাস্তবিক জীব এবার আর একরূপ আনন্দের সংবাদ পাইল, সে আনন্দের নাম ব্রহ্মানন্দ। ইহার অন্য নাম "শান্তি" "নিবৃত্তি" ইত্যাদি। এই আনন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় মায়ার হাতে পড়িয়া, ইন্দ্রিয় সুখভোগে ডুবিয়া, জীব যে ঘোর অশান্তি, অনন্ত দুর্গতি ভোগ করিতেছিল, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীব আশ্বস্ত হইল। যেন জীবকে হিংস্র জন্তুতে বেড়িয়াছিল, জীব কোন প্রকারে সেই যমের মুখ হইতে রক্ষা পাইল, কাজেই জীব "শান্তি" লাভ করিল, তাহার বিপদ "নিবৃত্তি" হইল।

সহৃদয় পাঠক, ক্ষমা করিবেন, আমরা "অভয়ের গল্পটী এইখানে আপনাদিগকে না শুনাইয়া পারিতেছি না। গল্পটী কিন্তু সত্য ঘটনামূলক।

'অভয়' মধুর লোভে সুন্দর বনে গিয়াছিল। সঙ্গে আরও দশ বার জনা সঙ্গী ছিল। ভাই পাঠক, মধু সংগ্রহ বড় সহজ ব্যাপার নহে। মধুমক্ষিকা দেখিলেই তাহার পশ্চাতে ছুটীতে হইবে। সাপ বাঘ কিছুই মানিলে চলিবে না। "মা যশোরেশ্বরী যা কর"—বলিয়া 'অভয়' মৌমাছির পেছনে পেছনে ছুটিয়াছে। মায়ের উপর সটান নির্ভর করিয়া সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া না ছুটিতে পারিলে বুঝি প্রেম-মধু মিলে না! কর্ম্মফেরে 'অভয়, একটী সুন্দর বনের রাজ শার্দ্দুলের (Royal Tiger) চোখে পড়িয়া গেল। অভয়ের আর রক্ষা নাই, অভয়কে বাঘে ধরিল, অভয় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সঙ্গীরা বেগতিক দেখিয়া পলাইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে কোন সাহেব শিকারে গিয়াছিলেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অভয়কে বাঘে কামড়াইয়া আছে। তাঁহার সুকৌশলে চালিত বন্দুকের গুলিতে বাঘ মরিয়া গেল। অভয়ার কৃপায় সাহেবের যত্নে 'অভয়' জীবন পাইল। মূর্চ্ছাপগমে 'অভয়' সম্মুখেই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাঁহাকে বনের দেবতা 'দক্ষিণ রায়' মনে করিয়া অভয় ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং কাতরে করযোড়ে কত স্তুতি করিতে লাগিল। তাহার কথা না বুঝিতে পারিলেও ভাবে ভঙ্গীতে অভয়ের উহা কৃতজ্ঞতা বুঝিয়া "গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি" খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে নিজের 'বোটে' লইয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিলেন। বিপদমুক্ত 'অভয়' পরমা 'নিবৃত্তি' লাভ করিল। তাহার যন্ত্রণারও 'শান্তি' হইল। "তুমি যেমন ছিলে তেমি হইয়াছ, এখন বাড়ী যাও" বলিয়া সাহেব তাহাকে বিদায় করিতে চাহিলেন, সুচতুর অভয় কাঁদিতে লাগিল। সে কহিল, "প্রভু, আপনি দয়াময়, আমায় রক্ষা করিয়াছেন, আমি যেমন ছিলাম তেমি হইয়াছি সত্য কিন্তু আমি শুধু হাতে কিরূপে ঘরে যাইব? আমার স্ত্রীপুত্র কি খাইবে? বনে আসিয়া কিছু রোজগার করিয়া না ফিরিলে আমার আসা যাওয়া যে বৃথা হইল!" হিসাবী অভয়ের কথায় শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি একটু হাসিলেন, এবং তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, অভয় কৃতার্থ হইল।

ভাইরে, আমরা মধুলোভে মায়াদেবীর সুন্দরবনে আসিয়াছি, বাঘের মুখে পড়িয়া পরম সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির কৃপা পাইয়াছি, তবে কি আমরা শুধুই 'নিবৃত্তি' আর 'শান্তি' লইয়া ফিরিব? না যাহাতে মধু মিলে সেই পঞ্চম

পুরুষার্থ প্রেমধন মাগিয়ে লইব? শুনিতে পাই তিনি নাকি সেই দুর্লভ রত্ন বিনা মূল্যে দিতেছেন।

অভয়ের নিকট আমরা 'নিবৃত্তির' পরেও আরো সুখ আছে সংবাদ পাইলাম এবং তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতির কাছে মিলে ইহাও বুঝিলাম। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীও সেই জন্য সুখের তিনটী পর্য্যায়ের কথা বলিয়াছেন—

'সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মং ঐশ্বরঞ্চেতি তৎত্রিবিধা' (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু) সুখ বিবিধ। (১) বৈষয়িক—রূপরসাদি বিষয় হইতে লব্ধ।

(২) ব্রাহ্ম—ব্রহ্মানন্দ।

(৩) ঐশ্বর—শ্রীকৃষ্ণের সেবা সঞ্জাত।

কিন্তু আলোচ্য হইতেছে যে মোক্ষও যখন সুখ তখন তাহা এইরূপ নিন্দনীয় হইল কেন? ইহার উত্তরে বৈষ্ণব মহাজনেরা বলিতেছেন "ভুক্তিকামীরা যেরূপ আত্মহা, মুক্তি প্রার্থীরাও তদ্রূপ আত্মহা। বিশেষতঃ মুক্তি কামনাও কামনা,— তাহাতেও সাধককে অশান্ত করে। প্রকৃত পক্ষে জীব স্বকীয় কৃষ্ণ দাস্যে না ফিরিলে তাহার শান্তি বা সুখ নাই। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত। (চরিতামৃত)

যাঁহারা পরম সুস্বাদু সীতাভোগ খাইয়াছেন, তাঁহারা 'দলো' অর্থাৎ ময়লা চিনিকে ভাল বাসিবেন কিরূপে? বিশেষতঃ যাহা আমাকে সেই সেবানন্দ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহাকে আমি 'মহাকৈতব' বলিব না ত কি বলিব? আবার মুক্তি কামনা সাধককে আদৌ ভক্তিরাজ্যে আসিতেই দেয় না। 'ভজ্' হইতে ভক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছেন, ভক্তি ভাগবত সেবা। আমি নিজে ব্রহ্ম হইলে আবার আমি সেবা করিব কাহার? কান্নাকাটী করিব কি জন্য? কৃপাভিক্ষা করিব কৈ? সুতরাং তাদৃশী কামনাকে আমি পিশাচী বলিব না ত কি বলিব? সেই জন্য—

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

মুক্তিকে শ্রীরূপ গোস্বামী পিশাচী বলেন নাই, মুক্তি কামনাকে পিশাচী বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মুক্তি পাইয়াছিলেন কয়জনে, কিন্তু মুক্তি-কামীদের সোঽহং জ্ঞানে দেশ অঙ্গারক হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবে সময়ে মুক্তি কামনার ঢেউ অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। মায়াবাদে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। অতর্কিতভাবে নিরীহ জীবকুল এইরূপ ধ্বংসের স্রোতে বাহিত হইতেছিল। তাই এই মধুর পতিতপাবনী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা! গৃহ-সুখ ছাড়িয়া, নবদ্বীপের কীর্ত্তন-বিলাস তেয়াগিয়া তাই আমাদের গৌরকিশোর

বিষ্ণুপ্রিয়েশকে সন্ন্যাসী সাজিতে হইয়াছিল। বিদ্বৎ-শিরোমণি সার্ব্বভৌমের সহিত সাত দিন সাত রাত্রি শাস্ত্রবিচারে লড়িতে হইয়াছিল। আবার সন্ন্যাসী রাজা প্রকাশানন্দের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল, ফলও সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। চতুর্ব্বর্ণাশ্রমীর উপকর্ত্তা সার্ব্বভৌম মহাপণ্ডিত, যিনি কেবল মুক্তিবাদ পড়াইয়া জীবন কাটাইয়াছেন, তিনি মুক্তির নাম পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া ভক্তির বিজয় কেতন উড়াইয়া বলিলেন,—

মুক্তি শুনিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শুনিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

আবার মায়াবাদী সন্ন্যাসী রাজা প্রকাশানন্দ আত্ম গ্লানিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কিরূপে শেষে প্রেমময় গৌরহরির কৃপাভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার রচিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতই" জ্বলন্ত স্যক্ষ্য দিতেছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎসাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ॥

এতক্ষণে আমাদের বিচার বিতর্কের অবসান হইল। যিনি বিশ্ব-বিশ্রুত মহা বৈদান্তিক, মুক্তি,—নির্ব্বাণ মুক্তিই জীবের চরম পুরুষার্থ ইহাই যিনি তার স্বরে আজীবন প্রচার করিতেছিলেন, সেই সন্ন্যাসীরাজের মুখে আজ কি শুনিতেছি! "(শ্রীচৈতন্যের) যাঁহার করুণাদৃষ্টি বৈভবে ধনী হইয়া জীবগণ (আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন সবিশেষ কৃপাপাত্র) নির্ব্বাণ মুক্তিকে নরকের ন্যায়, স্বর্গকে আকাশ কুসুমের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণকে ভগ্নদন্ত কালসর্পের ন্যায়, জগৎকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরম সুখময় এবং বিরিঞ্চি বাসবকে অতি নগণ্য কীট তুল্য বোধ করেন, সেই গৌরহরিকে আমরা স্তব করি।" শ্রীগৌরাঙ্গহরি বজ্র নিক্ষেপে হিমাচল, বিন্ধ্যাচল গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তবু একেবারে বীজ ঘুচিল না। মুক্তিকামনার এই দুর্ব্বার মোহ এরূপ শিকড় গজাইয়াছিল, সুদীর্ঘকাল বেদান্ত এরূপ আসর জমকাইয়া বসিয়াছিল যে মহাপ্রভুর প্লাবনকারী উত্তাল কীর্ত্তন তরঙ্গে আজও সেই নির্ব্বাণ মুক্তি কামনার আলাপচারি থামিল না।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইল, বৈষ্ণবেরা তবে কি মুক্ত হইতে চাহেন না? তাঁহারা কি অষ্টপাশে জড়াইয়া থাকিতে চাহেন? মহাপ্রভু বাল্যেই পণ্ডিত গদাধরের শ্রীমুখে ইহার উত্তর দিয়াছেন—আত্যান্তিক দুঃখ

নাশকেই মুক্তি বলে; কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তিই আত্যান্তিক দুঃখ। ভক্তিদেবীর কৃপায় জীব স্বকীয় স্বরূপ কৃষ্ণ-দাসত্বে ফিরিয়া আসিলেই মুক্তি হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকে নিজে শ্রীমুখে উপদেশ দিয়াছেন—

অতএব ভক্তি-কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখ ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয় প্রেমের ফল হয়।
ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

ভক্তিদেবীর কৃপায় জীবের কৃষ্ণ-সেবাসুখ ও ভবদুঃখ নাশ সমকালেই জন্মে। শুদ্ধ সত্ত্বজীব কৃষ্ণদাস্যে কিসে অপার আনন্দ অসীম অধিকার লাভ করেন—তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, পাঠক, তাঁহাদের মুখেই শ্রবণ করুন;—

অল্প হেন না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
বহু কোটি জন্মে সে করিল নিজধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
অহর্নিশি দাস্যভাবে সে করে প্রার্থন।
তবে মুক্ত হয়, হয় বাধ বিমোচন॥
সেবক কৃষ্ণের পিতামাতা ভগ্নি ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপে চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥ চৈঃ ভাঃ

এইত গেল অধিকার, এখন আনন্দের কথা শুনুন;—

কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে সেবানন্দ কাছে। শ্রীচরিতামৃত।
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎপরার্দ্ধ গুণীকৃতঃ।
নৈতদ্ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি॥ (ভক্তিরসামৃত)

ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধ গুণ করিলেও ভক্তি সুখসাগরের এক পরমাণুর তুল্য হয় না। কিন্তু এই 'সেবানন্দ' নিতান্ত সহজ প্রাপ্য নহে। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

কালক্রমে শুদ্ধাভক্তির উদয়ে জীবের ভাগ্যে ইহা সম্প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখেই আমরা তাহা পাইয়াছি।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

আবার শাস্ত্রও তাহাই সমর্থন করিতেছেন ;—

জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তি র্ভুক্তি সজ্ঞাদি পুনতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥

জ্ঞানযোগে মুক্তি সুলভ, কর্ম্মযোগে পুণ্যবলে স্বর্গাদি ভুক্তিও সম্ভব, কিন্তু (শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি ভিন্ন) সহস্র সাধনেও শুদ্ধা হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ।

আবার দেখা যাইতেছে যাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহারাও লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া এই সেবানন্দ উপভোগ করিতে আইসেন।

"মুক্তা অপিলীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজে।"

পক্ষান্তরে যাঁহারা ভক্তিসুখের গন্ধমাত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে সাধিয়া দিলেও মুক্তি গ্রহণ করেন না।

"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা।"

সুতরাং ইহা যে ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। বুঝি ইহারই ইঙ্গিত করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে "বেদ উপনিষদে যাহা বিবৃত হয় নাই, কোন যোগে কোন গুরুতর অবতারে নিজেও যাহা দান করেন নাই, সেই অতি দুর্ল্লভ বিশুদ্ধ ভক্তিরত্ন শ্রীচৈতন্যদেব অবিচারে ধান ছিটাইবার ন্যায় ছিটাইলেন,

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপ নিষদ্ভি রপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ ন বিবৃতং যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে,
ক্ষিপন্নাসি রসাম্বুধে! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥

আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞানরূপী শঙ্করাবতার স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বহু গবেষণার পরে শেষে বলিয়াছেন "ভেদাপগমে জীব শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও কখনও পূর্ণব্রহ্ম হইতে পারে না। সমুদ্রের তরঙ্গ—চিরদিন তরঙ্গই—থাকিবে কখনও সমুদ্র হইতে পারে না।

যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামক্রীয়স্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচ ন সমুদ্রো ন তরঙ্গে॥

প্রকারান্তরে সেই দাস্যভাবেরই জয় কীর্ত্তিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাই শিখাইয়াছেন—

বেদ-শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥ (চরিতামৃত)

পরিশেষে আমাদের সানুনয় নিবেদন, আমরা মহামূর্খ, সর্ব্বথা ক্ষমার্হ। বেদ বেদান্ত কিছুই দেখি নাই। দেখিবার অবসরও নাই। সহৃদয় পাঠক, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকিতে পারি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের সার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই বস্তু সার॥

শ্রীবামাচরণ বসু
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাশিমবাজার।

শ্রীনামকীর্ত্তন।

——:*:——

শিষ্য। গুরুদেব, আজ আমি একটী জটীল সন্দেহে পতিত হইয়াছি। আশা করি কৃপা করিয়া আমার সন্দেহ বিদূরিত করিবেন।

গুরু। কি সন্দেহ বৎস?

শিষ্য। সন্দেহ অতিশয় গুরুতর। সেই দিন না ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন, "বাপু তোমরা যে উচ্চৈঃস্বরে চেচাঁইয়া নামকীর্ত্তন করিতেছ, নৃত্য করিতেছ, মাটীতে গড়াগড়ি দিতেছ, ইহার দ্বারা তোমাদের কি ফল হইতেছে? বরং যাঁহার তাহার সঙ্গে মিশামিশি করিয়া আপনার পাপের পথ প্রশস্ত করিতেছ মাত্র। যোগ না করিলে কি জীব কখনও মুক্ত হইতে পারে? অতএব এই সকল ভারিভুরি পরিত্যাগ করিয়া, যদি সাধনা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অষ্টাঙ্গ যোগসাধন কর। দিনরাত্রি আর চেচাঁইও না। আমরা ঘুমাইতেও পারি না। সকলের শান্তিভঙ্গ কর কেন? বেশী বাড়াবাড়ি করিলে সমাজচ্যুত করিব। সমাজ ত আমাদের হাতেই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের এই সমস্ত কথা শুনিয়া, আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য এমন প্রাণারাম হরিনাম করিতে পারিব না? তবে আর এই শোক-তাপপূর্ণ সংসারে কি লইয়া দিন কাটাইব? তাহা হইলে যে প্রাণ শুকাইয়া যাইবে। গুরুদেব! তবে কি নামকীর্ত্তনে কোনও ফল নাই? উহা কি আমরা কেবল একটা বালকের হুড়াহুড়ির মত কাণ্ড করি? নামকীর্ত্তনের মহিমা যদি শাস্ত্রে থাকে, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের এত আপত্তি কেন? ইঁহাদিগের কথায় আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমার এই ঘোরতর সন্দেহ দূর করুন।

গুরু। কি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বৎস, শ্রীনামের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই বলিয়াই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু আজ তোমার মুখে নামের নিন্দা শুনিয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেও গুরুতর আঘাত লাগিল। হায়! জীব কি মায়ামোহে মোহিত? মায়ার তাড়নায় ভুলিয়া ভগবন্নামের পর্য্যন্ত নিন্দা করিতেছে? দেখ বৎস, যাহারা দিনরাত্রি বাজে কথায় দিন কাটায়, তাহারাই আবার ভগবন্নামের নিন্দা করিতেছে, কি গুরুতর পাপের কথা। এই সবই মায়া, বৎস। যাহারা মায়ামোহিত, তাহারাই

নিজেদের ন্যায় সকলকেই মায়ায় আবরিত রাখিতে চেষ্টা করে। ইহা মায়া পিশাচীর ধর্ম্ম। তোমরা ত কৃষ্ণভক্ত জীব। মায়ার অধীন নও। যোগমায়া—তোমাদের সাক্ষাৎ জগজ্জননী রহিয়াছেন। তিনি মায়ার অতীতা, সুতরাং মায়াবাদিগণের কথায় কর্ণপাত কর কেন? ভয়ই বা কর কেন? যোগমায়ার স্মরণ নেও। তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁহার কৃপায় মায়ামেঘ কাটিয়া যাইবে।

শিষ্য। দেব, তথাস্তু। মা যোগমায়া আমার মায়াডুরি কাটিয়া দাও। আমাকে ব্রজের পথ দেখাইয়া দাও। গুরুদেব বলিয়াছেন, তোমার কৃপা হইলে রাধারাণীর কৃপা মিলিবে।

গুরু। হাঁ বৎস, এতক্ষণে ঠিক বুঝিয়াছ? এখন তুমি দিনরাত্রি নাম কর। দেখিবে নামের ফল কি? উহা বক্তৃতার দ্বারা বা লেখার দ্বারা বুঝা বা বুঝান যায় না। প্রাণের জিনিষ, সাধনার বস্তু, সাধনার দ্বারাই প্রাণে অনুভূতি হয়। সাধন কর, প্রাণে আপনিই চিদানন্দরস অনুভূতি হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব, আবার আমার মনে আর এক সন্দেহ আসিয়া উপনীত হইল। (১) নাম করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, সেই নাম কিরূপে করিব? আর (২) সন্ধ্যাদিই বা কোন্ সময়ে করিব? আমার যে নাম ভিন্ন অন্য কোন প্রক্রিয়া কি কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

গুরু। নাম-সঙ্কীর্ত্তন তিন প্রকার,—স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন। মনে মনে নাম স্মরণ করিবে, অর্থাৎ জপিবে। যেমন তোমাকে দৈনিক লক্ষ হরিনাম জপ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছি। আর সময় সময় মনন অর্থাৎ ধ্যান করিবে। আবার সময় সময় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবে। বহু লোকের সঙ্গে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিলে অতিরিক্ত মাত্রায় আনন্দ জন্মে। যখন দেখিবে মনে কোনও নৈরাশ্যের ভাব উপস্থিত হইয়াছে, শান্তি আসিতেছে না, দুশ্চিন্তার এক তীব্রশিখা এ সোনার শরীরকে পোড়াইতেছে, তখনই বুঝিবে প্রাণে শান্তি নাই, আনন্দ নাই। এই আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য, এই আনন্দ স্রোত দেহের বাহিরে ভিতরে প্রবাহিত করিবার নিমিত্তই উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাতে নিরতিশয় আনন্দ জন্মে। সেই আনন্দে সাধক অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘরে বসিয়া নাম জপ ও ধ্যান করিতে পারে। আবার বিষয়-তৃষ্ণায় প্রাণ শুকাইয়া গেলে, এইরূপ ভাবে নামকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ আনয়ন করিতে হয়। নামের ফল পরে বলিব। এখন তোমার দ্বিতীয় কথার উত্তর শুন। বৎস, তুমি সর্ব্বদাই নাম জপ কর। লোকের মাতৃদশায় সন্ধ্যাবন্দনাদি থাকে না। তোমারও এখন

মাতৃদশা উপস্থিত হইয়াছে। মায়া মাতা ত তোমারও মরিয়াছে। তুমি এখন যোগমায়ার কোলে আছ, সুতরাং বৎস, তুমি অশৌচাবস্থায় কিরূপে সন্ধ্যাদি করিবে? অতএব কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম, কলিযুগের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু সেই "হরেকৃষ্ণ হরেরাম" নাম জপ কর। হাসিতে, খাইতে, শুইতে, বসিতে সকল সময়ই যেন ঐ নাম তোমার মনের মধ্যে থাকে। সুতরাং তোমার আর সন্ধ্যা করিবার অবসর কোথায়? আর শুন বৎস, কতকগুলি শুষ্কমন্ত্র টীয়া পাখীর মত উচ্চারণ করিলে কি হইবে? যতক্ষণ বক্ বক্ করিয়া এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, ততক্ষণ এই তারকব্রহ্ম নাম জপ করিও। আচ্ছা বাছা তুমি কি আম চাও, না আমের আঁটী চাও? যদি আমের আঁটী চাও তবে শুষ্ক সন্ধ্যাদি যাবজ্জীবন কর। এইখানেই থাকিবে। উহার বেশী উঠিতে পারিবে না। আর যদি আম চাও, তবে আঁটীও পাইবে, পরন্তু আমের রসাল অংশটুকু খাইয়াও রসাস্বাদন করিতে পারিবে। তবে যদি বিশ্বাস করিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ কর, তবে সবই হইল। আমও খাইলে, আঁটীও পাইলে।

সন্ধ্যাদি কেবল এই সনাতন নামে বিশ্বাস হওয়ার জন্য। সেই শ্রীনামে বিশ্বাস ও আসক্তি জন্মিলে আর সন্ধ্যাদির দরকার কি? যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফল না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পের বৃতি (নাভি) থাকে। ফল হইলে বৃতিগুলি আপনিই ঝরিয়া পড়ে। সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নামে বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যাদির দরকার, পরন্তু নামে আসক্তি জন্মিলে এই সব বাজে জিনিষ ঝড়িয়া পড়ে। অতএব বৎস, নাম কর, নাম ধ্যেয়, নামে প্রেমে ভাস, উজানদিকে চল। নিশ্চয় রাধারাণী কৃপা করিবেন।

শিষ্য। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। নামের মধ্যে কি যোগ'ক্রিয়া নাই? আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

গুরু। নামে যোগের প্রক্রিয়া থাকিবে না কেন বৎস? যোগ কাহাকে বলে? সাংখ্যদর্শনকার বলেন "যোগশ্চ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়. তাহাকে যোগবলে।

শিষ্য। নামে কিরূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, কৃপা করিয়া বলুন?

গুরু। শুন বৎস, লিঙ্গ মূলের নিম্নভাগে, মূলাধারের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্তা আছেন। তাঁহাকে জাগাইতে না পারিলে, জীবের আর সাধন ভজন হয় না। তাঁহাকে জাগাইবার যোগ, তপঃ ধ্যানাদি অনেক পথই আছে। কিন্তু তিনি নামে যেইরূপ সহজে জাগরিতা হন, (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) অন্য

আর কিছুতেই তেমন সহজে উদ্বুদ্ধ হন না। সাধক নাম করিতে করিতে সেই নামের শক্তিতে, মূলাধারের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী নড়িয়া উঠেন। কুণ্ডলিনী যেন মূলাধারের মধ্যে লুপ্ত সর্পের ন্যায় শুইয়া আছেন। সুপ্ত সর্পের লেজের মধ্যে আঘাত করিলে যেমন সর্প জাগরিত হইয়া উঠে, সেইরূপ নাম জপ করিতে করিতে নামের একটা শক্তি (Force) বাড়ে। সেই সমবেত শক্তি (co-operative power) যখন মূলাধারে আঘাত করেন, তখন কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া উঠেন। কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলেই সাধকের আত্মবিদ্যা ফুটিয়া উঠে। অবিদ্যা ভয়ে পলায়ন করে। এই কুণ্ডলিনীর গতি সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধ দিকে। তিনি জাগরিত হইলেই সর্পের মত ফণা ধরিয়া উপর দিকে উঠেন। অমনি তিনি ঊর্দ্ধ গতিতে ভ্রূমধ্যে যেখানে দ্বিদলপদ্ম আছেন, সেইখানে যাইয়া উপনীত হন। তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগতি শক্তিতে দ্বিদলপদ্ম ফুটিয়া উঠেন, যেমন মটর, কলাই, ইচকির বীজ পরিপক্ক হইলে, ফুটিয়া যায়, সেইরূপ দ্বিদলপদ্মে কুণ্ডলিনী আঘাত করিলে, দ্বিদলপদ্ম ফুটিয়া যান। অমনি তাঁহার মধ্য হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি আপনার স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে বাহির হন।

তখন সাধক ভ্রূমধ্যে কুণ্ডলিনীর চিন্ময়জ্যোতিঃ দেখিতে পান। এই জ্যোতিঃ যেন বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় আসে যায়। ক্রমশঃ সাধন ভজন করিলে, এই জ্যোতিঃ চক্ষু বুজিলে কি একটু ধ্যানস্থ হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন উহা স্থায়ী হয়, কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলেই ভ্রূমধ্যে ধ্যানাবস্থায় সর্ব্বদাই এই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। বৎস, হতাশ হইও না। কিছুদিন সাধন ভজন কর। বিদ্যুতের মত মাঝে মাঝে কুণ্ডলিনীর জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। আরও সাধন ভজন করিলে এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই দেখিবে। সাধক এই কুণ্ডলিনীর জ্যোতিঃ দেখিলেই তাঁহার প্রাপ্তি হইল। কিন্তু এখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। প্রাপ্তির পরসিদ্ধি। এই কুণ্ডলিনীর যে জ্যোতিঃ দ্বিদলপদ্মে ফুটিয়া ভ্রূমধ্যে দেখা যায় উহাই ব্রহ্মরূপ। এই ব্রহ্মজ্যোতিকে ইংরাজীতে Hello বলে। যাঁহারা যোগ করেন, তাহাদের এই ব্রহ্মরূপ (Hello) পর্য্যন্তই সাধনা। এই পর্য্যন্ত হইলেই, তাঁহারা আর অগ্রসর হন না। প্রাপ্তিতে তাঁহারা তৃপ্তি বোধ করেন। কিন্তু সাধক ভক্তগণ এই ব্রহ্মরূপ দেখিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা সিদ্ধির চরমসীমা পর্য্যন্ত গমন করেন। যাঁহারা একেশ্বরীবাদী বা নিরাকারবাদী তাঁহাদের গন্তব্য এই ব্রহ্মরূপ (Hello of the God) পর্য্যন্ত। আর এক কথা বৎস, এই দ্বিদলপদ্মে কুণ্ডলিনীর জ্যোতিঃ

ফুটিয়া উঠিলে সাধকের তৃতীয় নয়ন খুলিয়া যায়। দেহ অপ্রাকৃত হয়। তখন তাঁহার শিবত্ব জন্মে। শিব না হইলে জীব কখনও সিদ্ধিরাজ্যে গমন করিতে পারে না।

এখন বৎস, সিদ্ধির কথা শুন,—আপন দেহের অবস্থানের সঙ্গে একবার মিলাইয়া দেখ, যখন সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে সাধক আপন অভীষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, তখন তাঁহার সিদ্ধি হইল। মনে কর তুমি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসক। সেইখানে, সেই তৃতীয় নয়নে "নিত্য যুগলমূর্ত্তি" বিরাজিত আছেন, দেখিতে পাইবে। তখন তুমি সেখানে চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দেখিবে। তখন আর নিরাকার নাই, সাকার, এই সাকারই জীবের উপাস্য, যেমন জল নিরাকার, কিন্তু হিমে তাহা জমিয়া কঠিন হইলে বরফ হয়। তখন তাহার একটা আকার হয়। সেইরূপ ভাবে ঐ কুণ্ডলিনার নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ভক্তদিগের ভক্তি হিমে ঘন হইয়া আকার ধারণ করে; না করিয়া পারে না। সেই সময় সাধক মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পান। যোগীদিগের নিকট তিনি নিরাকার থাকিতে পারেন বটে, (কেন না তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও ততদূর পর্য্যন্ত) কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি আকার ধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এখন দেখা যায় বৎস, এই কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে পারিলেই সমস্ত হয়, সাধনের পথ পরিষ্কৃত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কুণ্ডলিনীকে জাগাইবার নানা পথ আছে। যোগী যোগের দ্বারা—সন্ন্যাসী ধ্যানের দ্বারা, সাধক জপের দ্বারা ইঁহার চৈতন্য করান। কিন্তু এই সকল সাধনা বড় কৃচ্ছ্রসাধ্য ও বহু সময় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ কলির স্বল্পায়ু অন্নগত প্রাণ মানবের পক্ষে এই সমস্ত কঠোর প্রক্রিয়ার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উদ্বোধন করা একজন্মের কথা নহে। বিশেষতঃ পতনই অবশ্যম্ভাবী। কেন না পথ বড় শুষ্ক, রস নাই। দেখিতেছ না চক্ষের উপর কত সন্ন্যাসী শেষে না পারিয়া, অবশেষে চাউল কলা ও গাঁজাই জীবনের সার করিয়াছেন। হায়! ইহারই জন্য কি সংসার ত্যাগ? ইহারই জন্য কি মা, বাপ, স্ত্রী পুত্রাদিকে কাঁদাইয়া সংসার পরিত্যাগ করা? ফলতঃ এই সকল অতিশয় কঠোরও কলিতে সিদ্ধ ও সঙ্গত নহে; বলিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বারংবার শাস্ত্রে নজীর দেখাইয়া গিয়াছেন। তথাপি ভ্রান্ত জীব মায়াবাদের স্রোতে পড়িয়া, সংসার মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, ইত্যাদি মিথ্যা! মিথ্যা! নেতি! নেতি জ্ঞান করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান বটে, কিন্তু পরিশেষে বিরক্তির তাড়নায় আপন কর্ত্তব্য পথ হারাইয়া ফেলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, এই নাম দ্বারা সহজে (এমন কি কোনও কোনও ভক্তের ভাগ্যে একদিনের কীর্ত্তনেও) যে কুণ্ডলিনী জাগরিত হন, এবং তদ্দ্বারা যে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এই সুমঙ্গল পন্থা আপনি প্রচারিয়া আপনি আচরিয়া জীবকে শিখান। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" (চৈ, চ)। কিন্তু হায়! কলির কামাহত জীব মায়ামোহে জড়িত হইয়া, এই সুমঙ্গল পথে গমন করিল না। একবার আনন্দে বাহু তুলিয়া নামকীর্ত্তন করিল না। একবার সংকীর্ত্তনের ধূলায়, ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, আপন জীবন ধন্য করিল না।

মহাপ্রভুই প্রথমতঃ নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা কলির জীবের সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সেই দিন ত দেখিয়াছ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামকীর্ত্তনের সময় এক ভক্ত ভাবাবেশে দশায় পড়িয়া যান। সেই দশাই তাঁহার জীবনের শেষ দশা। ইহাতে কি বুঝিলে? না, একদিনেই কুণ্ডলিনী জাগরিত, হইয়া, দ্বিদলপদ্মে ব্রহ্মজ্যোতি দেখা দিয়াছিল, সেই জ্যোতিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আনন্দে তাঁহার শরীর গদ্‌গদ্ হইতেছিল। এমন ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া, তিনি আত্মহারা হইলেন। তাঁহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। যোগবলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইল। তিনি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। এইত হইল আসল কথা। এইরূপ যোগ, এইরূপ ইচ্ছামৃত্যু কয়জন সাধক, যোগীর ভাগ্যে ঘটিতে পারে? সেই দিন সীতাকুণ্ডের এক ভক্তের লীলাবসানের কথাও এইরূপ। সিদ্ধ চৈতন্য-দাস বাবাজীর সিদ্ধির কথাও তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলতঃ এখন বিচার করিয়া দেখ, যুগযুগান্তর ধ্যান যোগ করিয়া যাহা না হয়, একদিন নামকীর্ত্তনে তাহা হইতে শতাধিক সৌভাগ্য লাভ হয়

শিষ্য। এই নামকীর্ত্তনে কি সকলের এমন ভাব হয়?

গুরু। না বৎস? এই জন্য ইহার নিমিত্ত ঘরে বসিয়া নাম জপ করিতে হয়। কলির গায়ত্রী তারকব্রহ্ম হরের্নাম ঘরে বসিয়া জপিয়া, নামের শক্তি (Power) বাড়াইতে হয়। তখন নাম চৈতন্য হন। সাধকের ভিতরে নামের চৈতন্য শক্তি যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহার দেহের ভিতরেও বাহিরে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। তখন তাঁহার হাব, ভাব, নৃত্যাদি মধুর হইবে। ভাবোদ্দীপক হইবে। তখন তিনি হয় নদীয়া-নাগরী কিংবা ব্রজগোপিনীর অনুগত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এইরূপ প্রকাশ পাইবে।

কারণ ভিতরে ভাব ফুটিলে মানুষ, বাহিরে না নাচিয়া থাকিতে পারে না। উহা ভাবের ধর্ম্ম। ভাব ফুটিলে মানুষের সমস্তই আনন্দময় হইয়া উঠে। যেমন বসন্তকাল আসিলে আপনি কাননে মালতীফুল ফুটে, তেমনি মানুষের মনে ভাবোদয় হইলেই, তাহা বাহিরে ফুটিয়া পড়ে, চাপিয়া রাখিতে পারে না। আগুনের তাপে দুগ্ধ ফেনাইয়া ফুলিয়া উঠে, ভাবের তাপে মানুষ "কভু হাসে, কভু নাচে, কভু কাঁদে, কভু গড়ায়।" অতএব বৎস, আগে কতদিন কঠোর সাধনা কর, নাম জপ। নামের চৈতন্যশক্তি জন্মাও। আপনিই এই ভূমানন্দ, প্রেমানন্দ বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। যোগ হইতে যে নামে সহজে সিদ্ধি লাভ হয়, একবার বিশেষ করিয়া বলুন। আপনাকে বারংবার বিরক্ত করিতেছি, ক্ষমা করিবেন।

গুরু। কলিকালে নামই জীবের পক্ষে পরম কল্যাণকর। উহা সর্ব্বসম্প্রদায় ও সর্ব্বজীবই স্বীকার করেন। এমন কি মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টও বারংবার নামের মাহাত্ম্য বলিয়া গিয়াছেন। তুমি ত বাইবেল পড়িয়াছ, এই শুন বাইবেলে কি লেখা আছে :—

"Where two or three are gathered togather in my name, there am I in the midst of them (Bible). এই স্থলে খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রচারক যিশুখৃষ্টও নামের মহিমা প্রচার করিতেছেন, নামানুরূপ মহাযজ্ঞের বিধান করিতেছেন। তাহার ফলকথা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন "যেখানে দুই কি ততোধিক লোক সমবেত হইয়া আমার নাম করে, কি আমার নামে দোহাই দেয়, আমি সেখানেই উপস্থিত আছি।" ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন :—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্‌ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

ইহাতে দেখিতেছ, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের দুই জন মহাপুরুষের কথা একই। ইহা চিরসত্য সনাতন বলিয়াই এইরূপ। সত্য যাহা, তাহা কোন দিন না কোন দিনই জগতে প্রচারিত হয়। বিশেষতঃ কলিকালে কষ্টসাধ্য যোগাদির বিধি নাই। কারণ কলির কামহত জীব স্বল্পায়ু ও দুর্ব্বল। সুতরাং এই অবস্থায় সকলের কৃচ্ছসাধ্য যোগাদি অবলম্বন করিয়া, শরীর ও মন ঠিক করা দুঃসাধ্য। পরন্তু যোগে যেই সময়ে মন ঠিক না হয়, নামে তাহা হইতে অতি অল্প সময়েই শরীর ও মন সমাধিস্থ হয়। কেননা যোগমার্গ প্রথমতঃ অতিশয়

নীরস এবং প্রথমতঃ তাহাতে একটা প্রেম ও ভগবদ্‌প্রাপ্তির ব্যাকুলতা থাকে না। কেবল নিজের শরীর ঠিক ও কতকগুলি যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা শূন্যে উঠা, গাছের উপর চড়া, জলের উপর হাটা ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য ভাব ব্যক্ত হয়। পরন্তু তাহাতে মাধুর্য্য থাকে না। জলের উপর হাটা, গাছের উপর উঠা, এই সকল ঐশ্বর্য্যভাব হইলেই কি শ্রীভগবানকে পাইতে পারে? ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট জীবের ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য।

তাঁহার মহা ঐশ্বর্য্যের নিকট, জীব সাধনার দ্বারা কি ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিবে? তাঁহাকে কিরূপে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পাইবে? ফলতঃ জীব তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না। মাধুর্য্যভাব না হইলে ঐশ্বর্য্যভাবে জীব সচ্চিদানন্দময় পুরুষকে কিরূপে পাইবে? অতএব মাধুর্য্যের দরকার। মাধুর্য্যের সাধক সাধারণ মানুষের মতই থাকেন। জলের উপর দিয়াও হাটেন না, আগুনের মধ্যেও থাকে না। উহা একটী অহঙ্কার ও জীব দেখান ভাণমাত্র। নতুবা যাঁহারা সাধক, তাঁহারা কেন এই বিভূতি দেখাইবেন? ফলতঃ বুজরুকির দ্বারা জীব তাঁহাকে পাইতে পারে না। ফলতঃ ঐশ্বর্য্যভাবে জীব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না। মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন, "ঐশ্বর্য্য মার্গে না পাইয়ে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।"

অতএব যোগমার্গে প্রথমতঃ একটা ব্যাকুলতা ও প্রাণের প্রবল পিপাসা থাকে না। সাধনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে শ্রীভগবানকে পাইবার চেষ্টা থাকে না। কাজে কাজে ঐ উদ্দেশ্যবিহীন নীরসপথে পতনের আশঙ্কা আছে। একবার পতন হইলে, সহজে উদ্ধার হওয়ার আর উপায় নাই। পক্ষান্তরে নাম রসময়। নাম নামী অভেদ। "অভেদাত্মা নামনামিনোঃ।" নাম ধরিয়া ডাকিলেই নামীকে পাওয়া যায়। এই নাম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ চিন্ময় পদার্থ, রসময় বিগ্রহ। এই শ্রীনাম নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। "নিত্যশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ।"

নাম জপিতে জপিতে নামের চৈতন্যশক্তি বাড়ে। তখন সাধক নামরসে বিভোর থাকিয়া, যোগানন্দরস উপভোগ করেন। অথচ এই নামের প্রথম হইতে সাধক যে আনন্দধারা পান করিয়া আসিতেছেন, সেই আনন্দধারার মধ্য দিয়াই আনন্দে—আনন্দে পরিশেষে যোগানন্দে (অগাধজলের মীনের মতন) ডুবিয়া থাকেন। সুতরাং নামে সাধকের পতন হইতে পারে না। যেহেতু ইহাতে শুষ্ক জ্ঞানের কঠোর বিধি কিম্বা নীরস যোগের সীমাবদ্ধ পদ্ধতি নাই। উহাতে কেবল পূর্ণানন্দ, ভূমানন্দ। অথচ জ্ঞান কিম্বা যোগের চরম ফল যে যোগানন্দ, সেই

যোগানন্দই উপভোগ করেন। তবে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত পথ প্রথমতঃ অতিশয় নিরানন্দময়, কৃচ্ছসাধ্য ও নীরস। বিশেষতঃ যোগে—মানুষের যে সমস্ত রসময়ী বৃত্তি আছে, সেই সমস্ত বৃত্তিগুলিকে শুকাইয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং পথটা বিপরীত দিকে। আর ভক্তিতে নামের শক্তিতে, মানুষের সেই সমস্ত রসময়া বৃত্তিকে মোড় ফিরিয়া দিয়া ভগবদুন্মুখীন করিয়া চালাইয়া দেয়। কোনটাকেই পরিত্যাগ করে না। যেমন কাম, সাধকের পক্ষে বিষধর সর্পের তুল্য, তাহা ভগবানের দিকে নিয়োজিত করিতে পারিলেই, তখন তাহা প্রেম বলিয়া কথিত হয়। লোভ একটা মহা রিপু, ইহাকে যদি ভগবৎ পাদপদ্ম দেখিবার জন্য লালায়িত করা যায়, তবে ইহার দ্বারা ভাবিয়া দেখ কত উপকার হয়।

এইরূপ ভাবে জোর করিয়া মানুষের বৃত্তিগুলির ছেদন করিলে সাধন হয় না। তাহারা আবার সময় পাইলে, মাথা তুলিয়া উঠে। তখন বড় ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। পুরাণে দেখ নাই, অনেক মুনি-ঋষি সারা জীবন কষ্টসাধ্য সাধন করিয়া, হয়তঃ একদিন একটি অপ্সরী এক সুন্দরা যুবতী দর্শনে, তাঁহাদের বীর্য্য টলিয়া গেল। কাম সময় পাইয়া হুহুঙ্কার করিয়া মাথা তুলিয়া উঠিল। ফলতঃ কামের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে মরিতে হইল। একদিনের কামের আগুনেই সারাজীবনের সাধনভজন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইহা হইতে অধঃপতন আর কি হইতে পারে? কিন্তু যদি সেই কামকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন না করিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ তাহার লালসার বস্তু দেখাইয়া দেখাইয়া লোভ জন্মাইতে পারিত অর্থাৎ প্রেমে পরিণত করিতে পারিত, তখন কাম (বেদিয়ার সাপের মত) পোষ মানিত। তখন তাহার দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হইত না। বৎস, এ বড় গূঢ় রহস্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব ও সূক্ষ্মতত্ত্ব, চণ্ডিদাসাদির সাধন। সুতরাং তুমি শুনবার এখন অনধিকারী। তবে কথায় কথায় একটু আভাস বলিলাম।

মোট কথা সমস্ত বৃত্তিগুলির সাহায্যে সাধন করাই মঙ্গল। তবে তাহাদের একটু বেগ বা গতি (Motion) ফিরাইয়া দিতে হয়। সমস্ত বৃত্তির সম্যক স্ফুরণেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। নতুবা একাঙ্গতা কখনও পূর্ণ নয়। অপূর্ণতা লইয়া জীব সেই পূর্ণতার আদর্শকে কিরূপে পাইবে? অতএব ভগবৎ প্রদত্ত বৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া "নিশ্চল" হইবার জন্য যোগ করিলে পূর্ণতা সাধিত হয় না। কেন না মানব জীবনের সম্যক বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ ও পরিপূর্ণতাই ভগবৎ প্রাপ্তি। কোনও একটাকে জোর করিয়া বাদ দিলে চলিবে না, তাহাতে

ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। আর নামের ভক্তগণ এই সমস্ত বৃত্তিগুলিকে আনন্দধারা পান করাইয়া আনন্দময়ের আনন্দপথে পরিচালিত করান। সুতরাং এই পথ প্রথম হইতেই সহজসাধ্য এবং আনন্দময় ও সরস। কিন্তু উভয়ের পরিণাম ফল একই যোগানন্দ।

আরও একটী কথা আছে, জ্ঞান কিম্বা যোগমার্গে যদিও যোগানন্দ উপলব্ধি হয়, তাহা অনেকদিন পরে; কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে প্রথমতঃ শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকে। শারীর ধর্ম্মকে মুখ্য করিয়া পরে তাহাকে শ্রীভগবানের প্রেমের ধর্ম্মে অগ্রসর করায়। সুতরাং উহাতে শরীর ঠিক করিতে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। অনেক ব্যক্তির সামান্য কারণেও সেই শারীরধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যোগ ভ্রষ্ট হয়। হঠযোগী প্রভৃতিই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল।

কিন্তু শ্রীভগবানের মধুর ভজনে, নামের সাধনায়, প্রথম হইতেই সাধক নামীকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়, তখন সাধক আর নাম ছাড়িতে পারেন না। এই অবস্থায় নাম ও নামী এক হইয়া যায়। নাম লইতে নামীর লীলার স্মরণ হয়। নামীর লীলা স্মরণ করিতে, নামের আনন্দধারা ছুটে। তখন নাম ও নামীর যে ওতঃপ্রোতভাব, কেবল আনন্দের উপর আনন্দ গড়াইয়া পড়ে, তাহা নামীর সাধক ভিন্ন শুষ্ক সাধক উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব কলির স্বল্পায়ু দুর্ব্বল মানবের পক্ষে নামই শ্রেষ্ঠ। বৎস, নামের গুণ সংক্ষেপে বলিলাম, বোধহয় ভাল করিয়া বুঝিতে পার নাই। আরও একটুকু সাধনভজন কর। তবে এই সমস্ত গুহ্য গোপনীয় কথা ভাল করিয়া বলিব। তোমার এখনও তর্কনিষ্ঠ মন। তাই এখানে একটু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলাম। কিন্তু বিশুদ্ধা বা পরাভক্তির কথা গোপন রাখিলাম। পরাভক্তি তর্কের বাহিরে, তর্কে এই বিশুদ্ধা ভক্তি মিলে না। এই ভক্তিতে কুণ্ডলিনী আদির কিছুরই আবশ্যক করে না। উহা শুদ্ধভক্তের জন্য। তবে এই শুদ্ধাভক্তিতে বিশ্বাস কারণ তাহা পৌষের স্বধর্ম্ম নয়। সেইরূপ প্রাচীন মুনিঋষিরা সত্যত্রেতাদি চারিযুগে চারিধর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা আচরণ করাই স্বধর্ম্ম। ইহার বিপরীত আচরণই পরধর্ম্ম। অতএব বৎস্য, স্বধর্ম্মাচরণ কর। কলির স্বধর্ম্মই হ'চ্চে নামকীর্ত্তন ঐ দেখ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পূর্ব্বেই যুগধর্ম্মের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন—তাহা উপেক্ষা করাই ত আমাদের পরধর্ম্ম; ঐ শুন সেই সনাতন ঋষি-বাণী :—

"কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা (অর্চ্চনা) এবং কলিতে হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা উপাসনা করিবে।

"ধ্যায়ন্ কৃতে রাজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং॥" (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে অর্চ্চনার দ্বারা উপাসনা করিবে। কিন্তু কলিতে যে হউক, সে হউক একমাত্র নামকীর্ত্তনই বিধেয়।

কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ।
নাস্তি যজ্ঞাদি কার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলম্॥ (নারদ পঞ্চরাত্রং)

কলিতে গঙ্গাই মুক্তিদাত্রী, গীতাই পরাগতি, যজ্ঞাদি কোন কার্য্যই আর নাই। কেবল হরিনাম কীর্ত্তনই বিধি।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (নারদপুরাণ)

"সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীকৃষ্ণনাম মঙ্গলম্।
পরং স্বস্ত্যয়নং পরাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" (পদ্মপুরাণ)

হে বিপ্র! কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনামই সত্য এবং মঙ্গলজনক। ইহাই জীবের পক্ষে শান্তি স্বস্ত্যয়ন। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

"হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলিযুগে॥" (নারদপুরাণ)

অর্থাৎ যাহারা হরিনামকীর্ত্তন করেন, তাহারাই এই কলিযুগে ধন্য। এখন দেখিলে কি বৎস, কলিযুগের ধর্ম্ম কি? প্রত্যেক যুগের এক একটী করিয়া ধর্ম্ম আছে। তাহাকে যুগধর্ম্ম বলে। এই যুগধর্ম্মাচরণ করাই জীবের স্বধর্ম্ম। কিন্তু বৎস, কলির কামহত জীব মায়ায় যুগধর্ম্ম হারাইয়া, স্বধর্ম্ম ভুলিয়া পরধর্ম্মাচরণ করিতেছে। অধিকাংশ মানবই মায়াপিশাচীর তাড়নায় স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছে। তাই আজ যাহারা হরিনাম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতেছে। নামের প্রতি দোষারোপ করিতেছে? তা, ত করিবেই? শত খোঁড়ার মধ্যে একজন ভালমানুষ গেলে তাহাকে 'গোদা' বলিয়াই বলে। অতএব বৎস, ইহার জন্য দুঃখিত হইও না। বুঝিতে পারিলে, সকলেই একদিন না একদিন সত্যপথ অনুসন্ধান করিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।
নোয়াখালি।

কাঙ্গালের মনের কথা।

——:*:——

হায় হায়! আমার মত অকালকুষ্মাণ্ড তো জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই! আমি কি করিতে আসিয়াছিলাম আর কি করিতে বসিয়াছি! অসার সংসারের অলীক ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে,—মোহময় কর্ম্মজগতের বৃথা খাটুনী খাটিতে খাটিতে অতি সাধের মানবজীবনটা অবহেলে কাটাইয়া দিলাম। সারাজীবন কেবল আমার আমার করিয়া মরিলাম। আমি বা কার,—আর কে বা আমার,—কিছুই বুঝিলাম না।

ভাবিলাম না,—আমার মানবজীবন বৃথা যাইতেছে;—ভাবিলাম না—আমার পরিণাম বড়ই শোচনীয়;—ভাবিলাম না,—আমাকে একদিন না একদিন এই মায়ার সংসার ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। অবিশ্রান্তগতিতে যে শ্মশান-শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছি এ কথাটুকু ভাবিবার অবসর পাইলাম না।

জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল অন্ধের মত এই মরজগতের পথে-বিপথে ঘুরিয়া মরিলাম। হায়! হায়!! মৃত্যুকাল যে অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে,—ইহা জানিতে পারিয়াও আর দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারিতেছি না। মরণের কথা একবারে স্মরণ নাই। আমি যেন অমর হইয়া আসিয়াছি। সংসারে সকলি মরিবে,—কেবল মরিব না আমি! হায়! হায় কি ভ্রান্তি!! এই ভ্রান্তির দাসত্ব করিয়াই আর শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

শান্তিময় শ্রীশ্রীগৌরভগবানের ভজনসাধনে নিরত না হইলে কি আর অন্যত্র শান্তির আশা করা যায়? সংসার যে অশান্তির আকর। সংসারে শান্তির আশা করা আর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন ঢালিয়া দেওয়া উভয়েই তুল্য।

তবে যে সংসারের স্থানে স্থানে ক্ষণস্থায়ী শান্তির ক্ষীণরশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়,—উহা মরুভূমিতে মরীচিকাবৎ মিথ্যা। আর এই অনিত্য শান্তির উত্তপ্ত ছায়ায় কি ত্রিতাপদগ্ধ চিরপিপাসিত প্রাণ জুড়ায়? সংসার তো আগুনে মাখা। এখানে শান্তি কোথা হইতে আসিবে? মরুভূমে কি কখন পত্রপ্রসূনমণ্ডিত লতাকুঞ্জের শীতল ছায়া পাওয়া যায়?—না পাষাণে পঙ্কজ ফুটীতে পারে? কি ভ্রম! কি ভ্রম!!

হায়! হায়!! জীবনের অনেকটা সময় বৃথা কার্য্যে কাটাইয়া দিলাম। মোহাতিশয্যে এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে আমার ভজনযোগ্য নরদেহটা বৃথা কার্য্যে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। কামাদি রিপুগণ এ কথাটা আমাকে বুঝিতে দিল

না। কেবল ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাকারী রাখিয়া সর্ব্বদা কুকার্য্যে কুপথে পরিচালিত করিল।

সংসারে আসিয়া করিলাম কি? সংসারীর মত হইয়া তো সংসার করিলাম না। নর-নিবাসে আসিয়া কেবল প্রেত-পিশাচের অভিনয় করিয়া গেলাম। মানুষের মত হইয়া ন্যায় পথে চলিলাম না, সত্য কথা কহিলাম না,—বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাসুশ্রূষা করিলাম না,—অতিথি সেবা,—রোগী পরিচর্য্যা,—দুর্ব্বলের সাহায্য কিছুই করিলাম না! করিলাম কেবল চুরি, ডাকাতি, পর-পীড়ন আর পরস্বহরণ। হা অদৃষ্ট! এই যদি আমার মানব জন্মের কার্য্য হইল,—তবে না জানি আগামীতে আমাকে আর কোন্ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে?

জীবনটা ভরা কেবল পাপানুষ্ঠান ব্যতীত পুণ্যানুষ্ঠান মাত্রও করিলাম না। অসদাচার ভিন্ন,—সদাচারের দিকে চাহিলাম না। কত মিথ্যা সাক্ষ্যই দিলাম,—আর কত ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কাড়িয়া খাইলাম,—কত সরল প্রাণে প্রাণ-নাশক গরল ঢালিয়া দিলাম, তাহার আর অবধি নাই।

অভিমানে,—অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আমাকে আর আমি চিনিতে পারিলাম না। আপন বিদ্যাবুদ্ধির ওজন বুঝিতে পারিলাম না।

এই দগ্ধ উদর সেবার জন্য,—ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিকার্থতার জন্য কত যে কুকার্য্য করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

পাপীর জন্য নরকের ব্যবস্থা। যে যেরূপ পাপ করে, তাহাকে সেইরূপ এক নরককুণ্ডে নিঃক্ষেপ করা হয়। ভাবিয়া দেখি, আমার পাপের পরিমাণে এই সকল নরক সামান্য। আমার জন্য যমরাজকে একটি স্বতন্ত্র নরককুণ্ড তৈয়ারি করিতে হইবে। যদি মহাপুণ্যবানের পুরস্কারের জন্য নূতন স্বর্গ-সৃষ্টি প্রয়োজন হয়, * তবে মহাপাপীর তিরস্কারের জন্য একটী নূতন নরক সৃষ্ট হইবে না কেন?

হায়! হায়!! কত যে কুকার্য্য করিয়াছি সীমা নাই,—কিন্তু আর একটা যে বিষম সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার তো বুঝি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

গলায় মালা লইলাম,—সর্ব্বাঙ্গে ফোটা কাটিলাম, মাথায় নামাবলী বাঁধিলাম,—বাঁধিয়া দশজন বৈষ্ণবের মধ্যে একজন হইলাম। ভজন সাধন যাহা করিলাম না করিলাম, তাহা ভগবানই জানেন। বৈষ্ণব হইয়া আর কয়দিন থাকা যায়? ক্রমোন্নতি চাই,—না, হইতে হইতে একটা পাকা পোক্তা গুরু সাজিয়া বসিলাম। ক্রমশঃ

* ধ্রুবের জন্য ধ্রুবলোক গঠিত হইয়াছিল।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

আনন্দ।

ক্ষোভ।

যদিও তোমার বিরাট মূরতি
ভুবন করেছে ব্যাপ্ত
যদিও তোমারে সদা মনে হয়
তুমি আমাদের আপ্ত,
যদিও সহস্র ব্যবধান মাঝে
র'য়েছে সুন্দর ঐক্য
যদিও অর্ণবে ধ্রুবতারা সম
তুমি আমাদের লক্ষ্য
যদিও তোমার স্মরণে মননে
সন্তোষ উপজে সত্য
যদিও জগৎপিতা তুমি
আমরা হই অপত্য,
যদিও রে'খেছ সবেরি মূলে
তোমার মঙ্গল হস্ত
যদিও মোদের শেষের সান্ত্বনা
তোমার চরণে ন্যস্ত,
তবু ভগবান একটী কারণে
মোদের ক'রেছ খর্ব্ব
তোমার স্বরূপ বুঝা'তে পারি না
সবেরে করিয়ে গর্ব্ব!

বিসর্জ্জন।

——:*:——

মাকে আবাহন করিয়া যে অনুপম সুখ অর্জ্জন করা গিয়াছিল প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ আজ তাহা বিসর্জ্জন করিতে হইল। আবাহনের পর বিসর্জ্জন আমাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম। ইহার মর্ম্ম এই যে, আমরা একটানা সুখ ভালবাসি না। সুখের পূর্ণতা উপলব্ধি হইবামাত্রই দুঃখকে আবার বরণ করিয়া লই। নৈসর্গিক প্রায় সমুদয় কার্য্যই এই নিয়মে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, শরতের পর হেমন্ত, শীতের পর বসন্ত তো আছেই—অন্যদিকে হাসির পর অশ্রু, মিলনের পর বিচ্ছেদ, অনুরাগের পর বিরাগ প্রকৃতির পর বিকৃতি—মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। তাই আনন্দময়ীর আগমনে নিরাধারা আনন্দ উপভোগ ঘটিল না। মাকে বিসর্জ্জন করিয়া নিরানন্দ-আঁধারে ডুবিতে হইল।

আহা, মরি মরি মায়ের কি মোহনীয় রূপ গো! তিনটী দিন যেন তিনটী নিমেষে চলিয়া গেল! মায়ের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপজ্যোতিঃ পানে একবার যে চাহিয়াছে সে-ই আত্মহারা হইয়াছে! কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীর তো কথাই নাই, যারা জরাভারে প্রপীড়িত হইয়া যষ্টির উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়াছে তাহাদেরও মাতৃরূপ সন্দর্শনে সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল। কৈ বা তাদের জরা, কৈ বা তাদের ব্যাধি এই তিন দিন যেন তাহারা এক আনন্দনিধি লাভ করিতে পারিয়া একেবারে আনন্দ সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছিল। এই বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারিয়াই প্রাণের আবেগে লিখিয়াছিলাম :—

আমি হেরি এ যে মা দুঃখীর দুর্গোৎসব।

চির অভাবের গ্লানি, তাহারা সহিছে জানি

মা গো মা, তোমার হয় স্নেহের উদ্ভব।

তাই সম্বৎসর পরে, আস মা, বঙ্গের ঘরে

ভুলাইতে শত চেষ্টা শত পরাভব।

নূতন উৎসাহ দিয়া, তোল তারে জিয়াইয়া

আশার স্থজিয়া দেও নূতন পল্লব।

দেখিয়া বিফল শ্রমে, জীব অবসন্ন ক্রমে,

এ সাধের সৃষ্টি ধ্বংস করি অনুভব,

"মাভৈ মাভৈ" রবে, আস মা, লইয়া সবে
সিদ্ধি, ঋদ্ধি, জ্ঞান, বীর্য্য যা হ'তে সম্ভব।
মায়ার মায়াতে হায়; ঐ যে কঙ্কাল কায়
মরণ শয্যায় শু'য়ে আছিল নীরব;
সহায় সম্পদ শূন্য, শোণিত-শোষক দৈন্য
ঘুচে না গৃহেতে যার 'অন্ন অন্ন' রব;
বিহনে ঔষধ পথ্য, বিফল শুশ্রূষা—সত্য
ভাবিয়া স্মরিয়াছিল 'শ্রীহরি মাধব'।
সেও কি ভরসা পে'য়ে, আশার সঙ্গীত গে'য়ে
চে'য়ে পুনঃ দেখিছে বিশ্বের অবয়ব!
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্যে, যাহার হৃদয়ে গর্জ্জে
দুঃখের আগ্নেয়গিরি ভীষণ ভৈরব!
সেও মা দাঁড়ায়ে পাশে, ঐ যে আনন্দে হাসে
আনন্দময়ী মা, তুই শিবের বৈভব।
মৃত যে পুত্রেরে স্মরি, পোহাইল বিভাবরী
এখনো নয়ন দুটি ভিজে ডব ডব।
দিয়া কি চোখের ঠাঁর, হরিলে সন্তাপ তার
ঐ যে দুঃখিনী তোরে করিতেছে স্তব!
বু'ঝেছি মা দুর্গে, এ দুঃখীর দুর্গোৎসব!!

বাস্তবিক ইহা কল্পনা নয়, মায়ের চরণসরোজের এমনই আকর্ষণ!! তাই দেখিলাম এই তিনদিন চ'ক্ষে কাহারও পলক নাই, মুখে অন্য কথা নাই কেবল "মা, মা, মা,"। এই অমৃত মধুর 'মা' রব উত্থিত হইয়া ভুবনবাসীদিগকে এক অপার্থিব আনন্দ দান করিয়াছিল। হায় হায় রে, এই আনন্দ কেন অবিনশ্বর হইয়া রহিল না?

ভাদ্র সংক্রান্তির শেষে কৈলাসে যখন মায়ের স্বর্ণরথ সজ্জিত হইতে থাকে তখনই—সারাদিক অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। নতুবা শোভাসৌন্দর্য্য-হারী বর্ষার অব্যবহিত পশ্চাতে শরতের এই সুবর্ণ সম্ভার কদাচও সম্ভব হইত না। বারিপূর্ণ বারিদ-খণ্ডে তদ্দণ্ডেই কনকাভা প্রকাশ পাইত না। জলদদল-বেষ্টিত সুধাংশু মণ্ডলে এমন স্বর্ণ-কৌমুদী ফুটিয়া উঠিত না। এ সমস্তই মায়ের প্রসাদ চিহ্ন! মায়ের পাদপদ্ম অভিলাষী হইয়া জলে জলপদ্ম স্থলে স্থলপদ্ম যেন সদ্য

সদ্যই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে! শেফালিকা তো কলিকা অবস্থা অতিক্রম হইতে না হইতেই মায়ের চরণ পানে ধাবিত হয়! আহা, ও চরণ তো নয়, অমৃতের উৎস!!

গিরিরাণীর মহাষ্টমীব্রতের ফলে বিল্বমূলে আবাহন করিয়া আজ সকলেই মাতৃদর্শনের অধিকারী হইতেছে। চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেক বৎসর বঙ্গদেশের উপর দিয়া তুমুল আনন্দ তুফান বহিতেছে। শরতের সুবর্ণ-রঞ্জিত পথে স্বর্ণরথের ছায়াপাত হইতে সেই স্বর্ণ প্রতিমার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ভারতের নরনারী-হৃদয়ে আনন্দের তর তর স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের বক্ষ বেদনা জুড়াইবার জন্যই দেবী পক্ষের আগমন। বহুদিন হইতে বঙ্গে স্বাস্থ্য স্বচ্ছলতার শুভ্রজ্যোতি দুর্ভাগ্য কালিমা গ্রস্ত! অন্ন বস্ত্র সুপেয় জলাভাবে বাঙ্গালী আধি ব্যাধিত অবসন্ন! তথাপি বৎসরান্তে একবার আনন্দময়ী মাকে দর্শন করিতে পারিয়া প্রাণের জ্বালা পোড়া সমস্তই তাহারা ভুলিয়া যায়! আহা, এমন দুঃখ-হরা মা কি সকলে লাভ করিতে পারে?

ভাই বাঙ্গালী! এস, আমরা মাকে দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ কুটীরে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখি। আমরা যাইতে না দিলে মা কখনই যাইতে পারিবেন না। যাইতে দিলেও মা কেবল আমাদের সম্মুখ হইতেই অন্তর্হিতা হইবেন, ফলে কিন্তু এই পরমাণুটী হইতে ঐ হিমাদ্রিশেখর পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহাঞ্চল জড়িত থাকিবে। মা আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসবিণী। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মা কি কোথাও যাইতে পারেন? তাহা হইলে যে তাঁহার মহামায়া নামের সার্থকতা থাকে না? তাই বলি রাখ রাখ মাকে এবার ভক্তির মন্দিরে বন্দিনী করিয়া রাখ। গিরিরাণীর অকৃত্রিম তপস্যার ফলে যখন এমন সুদিন লাভ করিতে পারিয়াছ, তখন এদিন হেলায় ছাড়িও না। খেলার ছলে মাকে গভীর জলে বিসর্জ্জন করিও না। এ খেলা অনেকবার খেলিয়াছ, অনেকবার আবাহন বিসর্জ্জন করিয়াছ, কিন্তু এইবার একটু নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখ আমাদের অন্নস্থালী লইয়া গৃহমাতৃকাগণ কি দুর্ভাবনাই শিরে বহন করিতেছেন। এই দুঃখ দুর্গতির দিনে সাক্ষাৎ দুর্গতিহারিণী জগত্তারিণী মাকে কোন্ প্রাণে আজ বিদায় দিবে? ওরে এমন সন্তান-বৎসলা স্নেহময়ী মা আর কার আছে? ওরে কার মা এমন সন্তানকে ভক্তিরাজ্যে ডাকিয়া নিবার জন্য চিন্ময়ী হইয়া মৃন্ময়ী রূপ ধারণ করে? ওরে চে'য়ে দ্যাখ্ চে'য়ে দ্যাখ্ তোদের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করিয়া মায়ের চন্দ্রমুখে কি বিষাদ রেখারই সঞ্চার হইতেছে! ওরে

দ্যাখ্, দ্যাখ্, সত্য সত্যই মা আমার কাঁদিতেছে! হায় হায় হায়, তোরা কি নিষ্ঠুর, কি কঠিন, কি পাষাণ!! ওরে এমন সোনার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ প্রাণে তোরা গৃহে ফিরিবে?

হরি হরি হরি! বাঙ্গালী চিরন্তন প্রথানুসারে মাকে বিসর্জ্জন করিতেই উদ্যত হইয়াছে। ভক্তের প্রাণের আকুল আর্ত্তনাদ তারা শুনিতেছে না, একবার মা'র করুণামাখা মুখখানির দিকে তাকাইতেছে না, একবার আকুল প্রাণে মাকে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে না, একবার ঐ বরাভয়প্রদ চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছে না, ওরা করিতেছে কি? হায় হায় কি অমূল্য বস্তুই জলে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে! ওদের মনে কি বিন্দুমাত্রও অনুতাপ জাগিতেছে না? হায় হায়, সুরাসুরবন্দিতা, ত্রৈলোক্যবাঞ্ছিতা জননীকে লইয়া কি বীভৎস কাণ্ডই ঘুড়িয়া দিয়াছে!

"রূপং দেহি যশো দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি, সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।"

বলিয়া এই তিন দিন যাঁহার রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাইল সেই ত্রিলোকারাধ্যা মাকে তাহারা আজ বিসর্জ্জন করিতে আনিল! ঐ রে ঐ সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ঐ রে ঐ সে স্বর্ণ-প্রতিমা 'অথাই' জলে ডুবিয়াছে! ঐ রে ঐ সারা নদী যুড়িয়া সে স্বর্ণরশ্মি উজলিয়া উঠিয়াছে! হরি হরি হরি! আর দেখিবে কি? মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়াছে!!

বিজয়া গীতি।

——:**:——

(সখীসংবাদের সুর।)

(চিতান।)

অধীর প্রাণে গিরির পানে কেঁদে রাণী কয়।
তুমি পাষাণ হয়ে, আছ স'য়ে, আমার তো না সয়
উমার অদর্শনে জ্ব'লে যায় হৃদয়!

(লহর।)

বল বল গিরি কই সে গৌরী
কই গেল কই গেল মরি,
না পাই হেরিতে,
আমি হাতে পে'য়ে উমাশশী
যে'পে ছিলেম্ এ তিন নিশী
কপাল দোষে পড়্‌লো খসি
না চাই জীবন ধরিতে।
আঁধার ভবন ক'রে সে ধন লুকা'ল কোথায়,
এই ছিল সে কোথা গেল
মরি মরি মনোব্যথায়!

(মিল।)

যায় জ্ব'লে যায় আমার তনু বল গিরি, করি কি উপায়?

(অন্তরা।)

না শু'নে না দে'খে নেত্রে, সঁপেছিলে যোগ্য পাত্রে
সোনার প্রতিমা,
জনে জনে ক'য়ে ফিরে জামাইর মহিমা
যায় না তো তা তোমার কাণে, বিঁধ্‌ছে কেবল আমার প্রাণে
উমার দুঃখের কথা শু'নে মুখে আমার অন্ন না যায়।

(মিল।)

"যায় জ্বলে যায়" ইত্যাদি।

(খাদ।)

এ'সেছিল কাল বিজয়া বধিতে আমায়!

(লহর।)

আমি বুকে পে'য়ে বুকের ধনে
আর দুই চার দিন রাখ্‌ব মনে
করিলাম বিফল,
না যাইতে নবমী নিশি
নিতে এ'ল উমাশশী

করে না বিলম্ব বেশী
এম্‌নি সে বদ্ধ পাগল!
"আঁধার ভবন" ইত্যাদি।

(ঝুমুর।)

কৈ গেল সে উমা?
আমার স্নেহের ধন আঁচলের সোনা।
নিবা'য়ে মণ্ডপের বাতি
কেমনে বঞ্চিব রাতি
উমা কি বুঝ্‌ল না,
নাই গো সম্ভব, নিত্য দুর্গোৎসব
এ দুঃখ উদ্ভব তবে হ'ত না।

উপাসনা।

——*:::——

গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে উপাসনা-পক্ষে চিত্তশুদ্ধি প্রধান আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব যে উপসনা-পক্ষে আচার বিচার নিয়ম ও অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চ উপাসকগণের মধ্যে অর্থাৎ শৌর শাক্ত শৈব গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই সাম্প্রদায়িক ভাবে যে যে পথাবলম্বী, যাহার যেমন বিশ্বাস, যাহার যেমন শিক্ষা সেই প্রণালী ও শিক্ষা আনুসারে পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, পতি, সখা, প্রভু প্রভৃতি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন, একান্ত প্রাণে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যে চেষ্টা বা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার নাম ঈশ্বরোপাসনা উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রসাধন এবং তৎসঙ্গে চিত্তের পবিত্রতা লাভ ও ঈশ্বরানন্দ লাভ ইত্যাদি।

ব্রহ্ম কখন স্থূলদেহধারী বিরাট পুরুষ, কখন সূক্ষ্মদেহধারী হিরণ্যগর্ভ, কখন কারণদেহধারী ঈশ্বর, কখন নির্গুণ নিরবয়ব চিন্ময় শান্ত শিব অদ্বৈত। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অর্থে ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই তাহা নহে, ঠিক্ অর্থ এই যে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই নাই। এক ব্রহ্মই জগৎরূপে বিদ্যমান।

আবার ঈশ্বর নিরাকার নহেন, নীরাকার; অর্থাৎ জল যেমন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে ঈশ্বরও সেইরূপ। নিরাকার ভাবিবার বিষয় নহে, ভাবিতে গেলে সাকারই ভাবিতে হইবে। নিরাকার অর্থাৎ যাহার কোন আকার নাই, দেখা যায় না। দেখা অর্থে চর্ম্মচ'ক্ষে দেখা; আর জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করা। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চৈতন্য পদার্থকে সাক্ষাৎ অনুভব করা বড়ই উচ্চ অধিকারের কথা। নিরাকার উপাসনা অতি কঠোর সাধন। সাকার সগুণ উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্গুণ উপাসনার অধিকার জন্মে। পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও তিনি যখন সর্ব্ব-শক্তিমান্ তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন। বিশেষতঃ আমাদের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ পদার্থ অনুভব করিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না। আমাদের সেই শক্তি না থাকাতেই সাধন ভজনের জন্য ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় নির্গুণ নিরুপাধি তুরীয় ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়েন না। তাঁহাকে সাকার সোপাধি সগুণ ভাবে অবলম্বনের সাহায্যে উপাসনা করিতে হয়। জড় অবলম্বন অপেক্ষা মনুষ্য অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা সাধু ভক্তের অবলম্বন শ্রেষ্ঠতর, সাধু ভক্তের অবলম্বন অপেক্ষা দেবতার অবলম্বন আরও শ্রেষ্ঠ, আবার সকল দেবতার মধ্যে যে সকল দেবতাতে ব্রহ্মের সৃজন পালন ও সংহার এই তিনটি সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয় সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের কিম্বা শক্তির অবলম্বন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমস্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সেইরূপ দুর্গা বা শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

নির্গুণ উপাসনার অর্থ, ব্রহ্মে নাম রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ না করিয়া কেবল উপাসকের চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া। ইহা জ্ঞানযোগ বা অধ্যাত্মযোগ নামে খ্যাত নিরাকার উপাসনা।

সগুণ উপাসনার অর্থ, ব্রহ্মে নাম রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক তৎপ্রতি চিত্তবৃত্তি সমর্পণ দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। ইহা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সাকার উপাসনা, দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা।

নির্গুণ উপাসনা অতি উচ্চ অধিকারীর কথা। তাহা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নির্গুণ উপাসনা পরিপক্ক হইলে সবিকল্প সমাধি লাভ হয়। তৎপর ক্রমশঃ অনায়াসে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

নির্গুণ উপাসনার মূলমন্ত্র, ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধিকে লয় করা। আর সাকার উপাসনার মূলমন্ত্র সে সকলকে লয় না করিয়া তাহাদের বিষয়ীভূত সগুণ সাকার ঈশ্বরে তাহাদিগকে সমর্পণ করা। চিত্তবৃত্তি সমর্পণের অর্থ চক্ষু-কর্ণাদি ও মানসিক বৃত্তি সকল ঈশ্বরোদ্দেশে নিয়োজিত করা। চক্ষু দেখিবে কেবল তাঁহারই রূপ, কর্ণ শুনিবে কেবল তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন, নাসিকা আঘ্রাণ করিবে কেবল তাঁহারই গাত্রগন্ধ, জিহ্বা আস্বাদ করিবে তাঁহার প্রসাদ, ত্বক্ অনুভব করিবে তাঁহারই সুস্নিগ্ধ করস্পর্শ। এমন কি কাম ক্রোধ লোভ ও মোহ এ সকলের ক্রিয়াও কেবল তাঁহারই উদ্দেশে সম্পাদিত হইবে। ভগবানে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া কাম ক্রোধ অভিমানাদি তাঁহাতেই করিবে। যথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গ হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিবে যথা তথা ॥

এমন কি ভোগ্যবস্তু পর্য্যন্ত তৎপ্রতি অর্পণ করা আবশ্যক। ঈশ্বরের মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারের যাহা কিছু কার্য্য সকলই তাঁহার উদ্দেশে নিষ্পন্ন করা ও তৎপতি যাবতীয় ভোগ্যবস্তু নিবেদন করাই ভক্তিযোগের সাধনপ্রণালী। ভক্তগণ যতই ভক্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন ততই ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সাধারণ মানুষের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। দূরভাব দূর হয়। নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহে অধীর হওয়া কালে কৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিত্ব চাপা পড়িয়াছিল। ভক্ত রামপ্রসাদ কালীর উপর অভিমান করিয়া এমন কি গালি পর্য্যন্ত দিতেন, তখন তাঁহার মনে ঐশ্বরিক ভাব চাপা পড়িয়াছিল। ধ্যান অর্থেও সাকার ধ্যান বুঝিতে হইবে, কারণ সাকার ভিন্ন আমরা নিরাকার বস্তুর চিন্তাও করিতে পরি না।

ঈশ্বর উপাসনা করিতে হইলে আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন এবং ইহাই আমাদের আলোচ্য, বস্তুতঃ ইহা বড়ই প্রয়োজনীয় ও গুরুতর। আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠান প্রতিপালিত না হইলে ঈশ্বরোপাসনাই হয় না। পক্ষান্তরে আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠান প্রতিপালনই ঈশ্বর উপাসনা।

ভগবান সর্ব্বময়। যিনি বিশ্বকর্ত্তা এবং যিনি সর্ব্বজীব-জীবন ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য শ্রীগুরুর উপদেশে যে প্রণালীতে

তাঁহার অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি করা হয় সেই সকল অর্চ্চনাদিরই নাম ঈশ্বর উপাসনা। ঐ উপাসনার প্রধান অঙ্গ আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠান। সুতরাং ঈশ্বর উপাসনা করিতে হইলে আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠানের একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। যে প্রণালীতে যে অবস্থায় যে ভাবে যে সম্প্রদায়ে যিনি ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি শাস্ত্রানুসারে সেই ভাবের প্রাচীন সাধকগণ যে পথে চলিয়াছেন ও যে রকম আচার করিয়াছেন তাহাই সেই সেই প্রণালীর আচার বলিয়া গ্রহণ ও অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন যে :—

যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
যদ্যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর লোক সকলও সেইরূপ আচরণ করে। ঐ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে কার্য্য করেন, অপর লোক সকল তাহাই সদাচার বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আবার ইহাতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, আচারই মহতের চিহ্ন; সাধু ব্যক্তি-দিগের যাহা ব্যবহার তাহাই সদাচার। যিনি নিজের মঙ্গল ও আত্মার উন্নতি প্রার্থনা করেন, তিনি একান্ত ভাবে সদাচারে রত হইবেন, এবং ইহাই 'হরিভক্তি বিলাস' অনুজ্ঞা করিয়াছেন।

সদাচারই ঈশ্বর উপাসনার অনুকূল অঙ্গ, সদাচারেই জীবকে ঈশ্বরোপাসনায় উন্মুখ করিয়া তোলে। সদাচারেই চিত্তকে নির্ম্মল ও সত্ত্বগুণ প্রধান করিয়া থাকে। চিত্ত নিষ্কপট ও সত্ত্বগুণ প্রধান না হইলে ঈশ্বরোপাসনা দূরে থাকুক, ঈশ্বরোপাসনার ভাব এবং ইচ্ছাও হয় না। সুতরাং সদাচার অবলম্বন ঈশ্বর উপাসনায় অতীব প্রয়োজনীয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে, গৃহস্থের সর্ব্বদাই আচার প্রতিপালন করা উচিত, কারণ আচারহীন অসদাচারী ব্যক্তির ইহকালেও সুখ হয় না, পরকালেও সুখ হয় না। সদাচার লঙ্ঘন করিলে উপাসনা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আচার উপাসনার অঙ্গবিশেষ ও অনুকূল কারণ।

মনুষ্য মাত্রেরই ইহাই প্রধান বাসনা যে, "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ" অর্থাৎ আমার সর্ব্বদা সুখ হউক, দুঃখ যেন না হয়। এই প্রাণের বাসনাবলে সুখের বিরোধী যাহা, তাহা জীব অনায়াসে ত্যাগ করে। সদাচার বড়ই শান্তিময় ব্যাপার; জীবকে দেবতার ন্যায় শান্তিপূর্ণ ও দেবসদৃশ করিয়া তোলে। কেহ বা পার-

লৌকিক সুখের জন্য ইহলৌকিক সুখকে বিসর্জ্জন দেয়। কেহ বা ইহলৌকিক সামান্য সুখের জন্য পারলৌকিক পবিত্র সুখময় বিষয় পরিত্যাগ করে। কিন্তু সদাচাররত ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র সদাচার অবলম্বন করিয়া ইহলৌকিক শান্তিতে ও সুখে সুখী হয়েন, এবং পারলৌকিক সুখেও সুখী হইয়া থাকেন। সদাচারবান ব্যক্তির মুখশ্রী দেখিলেই সর্ব্বদা অনুমান হয় যে, তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল মর্ত্তভূমে থাকিয়াও অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছেন।

সদাচার-পরতন্ত্র না হইলে ঈশ্বর উপাসনার অধিকারী হয় না, সদাচার ঈশ্বর উপাসনার অনুকূল ও সদাচার সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। এ বিষয় প্রাচীন মহাত্মা মুনি ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে বিবৃত করিয়াছেন, কারণ ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। 'হরিভক্তি-বিলাসে'ও আছে যে, আচারহীন ব্যক্তি ষড়ঙ্গের সহিত বেদাদি অধ্যয়ন করিলেও ঐ বেদাদি-অধ্যয়ন তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না। অসদাচারীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঐ আচারহীন শাস্ত্রচর্চ্চা তাহাকে ত্যাগ করে, কারণ শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই। সদাচারই বিপদ্‌কালে জীবকে বিপদ্‌বারণ-তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অনতিক্রমনীয় যমযাতনা বা বিপদবস্থায় সে বিপদ্‌বারণ মধুসূদনকে স্মরণ করে, এবং ঐ আর্ত্তের প্রতি করুণা না করিয়া করুণাময়ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; অতএব মুক্তি তাহার করতলগত। আচারবান দেখিলে সদ্‌গুরুর কৃপা হয়। আচারবান ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হয় এবং ভগবান তাহার পবিত্র হৃদয়ে প্রকাশ পান বলিয়া সে সমস্ত শাস্ত্রেরই মর্ম্ম বুঝিতে পারে। আর আচারহীন হইলে পাণ্ডিত্যেও তাহাকে একদিনের জন্যও পবিত্র বা সুখী করিতে পারে না। আর্য্যসন্তানগণের আচারগত ধর্ম্ম, আচারগত প্রাণ, আচারগত উপাসনা, আচারগত আহার, আচারগত বিহার, আচারগত কার্য্যাদি, এমন কি আচারই তাহাদিগের পরমধন। কাশী-খণ্ডের 'আচার কাণ্ডে' উল্লিখিত হইয়াছে যে, আচারই ধর্ম্মাদি অর্থের প্রদাতা, আচারই কীর্ত্তি বর্দ্ধন করে, আচারই জীবকে দীর্ঘায়ু করে, এবং আচারের প্রভাবে জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অশুভ লক্ষণ সকল বিদূরিত হয়।

আর্য্যজাতির নিজের আর্য্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিচার অতি আবশ্যকীয়। সাধুদিগের আচরণীয় পবিত্র গুণবিশেষের নাম বিচার। কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবার জন্য শাস্ত্রানুসারে যে বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান, তাহার নাম বিচার। আচারেই বিচার অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মাদিগের আচারেরই অন্তর্ভূত বিচার। দেখুন ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে অনেক বিষয়েরই বিচার করিতে হয়। আমরা যখন যে অবস্থায়

থাকি, যাহা যাহা অনুষ্ঠান করি এমন কি যে সকল আহারীয় দ্রব্য আহার করি ইত্যাদি সকল বিষয়েরই বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঐ সকল বিষয় বিচার না করিলে, কিম্বা বিচার দ্বারা বস্তুর সত্যাসত্য, শুভাশুভ, ভাল মন্দ নিশ্চয় না হইলে, সেই বিষয়ে একাগ্রতা আসে না; একগ্রতার অভাব হইলে ঈশ্বরোপসনা দূরে থা'ক ঈশ্বরোপসনার অধিকারীও হইতে পারে না। সুতরাং বস্তু-বিচার ঈশ্বরোপসনার একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। সৎসঙ্গ না হইলে মনের নির্ম্মলতা বা স্থিরতা জন্মে না বটে, কিন্তু সৎসঙ্গও বিচার সাপেক্ষ; এবং সাধুগণও সতত সৎ অসৎ বিচার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিচারের দ্বারা যাহা প্রকৃত আনন্দজনক, যাহা পরিণামে সুখের, যাহা আত্মার উন্নতি-সাধক, তাহাই জীব কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বস্তুর ভাল মন্দ ও পরিণাম বিচার না করিয়া, অনেক সময় কুকার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, বিপদে পড়িবার বাসনা না হইলেও, যন্ত্রণা পাইবার জন্য কামনা না করিলেও মুগ্ধতা বশতঃ অবিচারের প্রভাবে কুকার্য্য করিয়া ফেলে ও ঘোর বিপদে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে বিপদে পড়িতে হয়। একথা সকল শাস্ত্রকারই উপদেশ দিয়াছেন।

কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক যে কোন বিষয়েই আমরা অগ্রসর হইতে চাহি, একান্ত প্রাণে সেই সকল বিষয়ের অনুকূল কারণ সকল বিচার করিয়া গ্রহণ করা ও প্রতিকূল কারণ সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া, বিচার করিয়া, ঐ প্রণালীতে শাস্ত্রপ্রমাণ যেরূপ সেইরূপ কার্য্য করাই উচিত। বিচার হইতেই বিবেকের উৎপত্তি হয়। এবং বিবেক না হইলে কখনই পরমতত্ত্ব লাভ হয় না। বিবেকই ঈশ্বরোপসনার অনুকূল ও মনুষ্যত্ব সম্পাদক। ঘোর কুকর্ম্মকারীও যদি নিজ কর্ম্মের বিচারের গুণে একবার বিবেক লাভ করিতে পারে, তবে অতি সামান্য কালের মধ্যেই ঈশ্বরোপসনা করিয়া তাহার নিজকৃত দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরোপসনা করিতে হইলে চিত্তকে সত্ত্বগুণ প্রধান করিতে হইবে। চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হইলেই ঈশ্বরোপসনার জন্য ব্যাকুল হয়, ব্যাকুল হইলেই উপাসনার অনুষ্ঠান করে, ব্যাকুল নির্ম্মল অন্তঃকরণের ডাকই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়, নির্ম্মল অন্তঃকরণেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হইলেই উপাসনার ফললাভ হইয়া থাকে। বিচার করিতে করিতে বস্তুর অসারতা ও নিজের অকার্য্যকারিতা ধরিতে পারিলে জীবের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে

না। যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ অন্তরের অন্তর, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, রসনার রসনা, শ্রবণের শ্রবণ, জীবনের জীবন প্রাণবন্ধু—বিচার দ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিলে সেই অনাথনাথ দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না, শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করেন। অতএব বিচারের আবশ্যকতা সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে।

আচার ও অনুষ্ঠান।

প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরুত্থত,
যৎ করোমি জগন্মাত, স্তদেব তব পূজনম্॥

অর্থাৎ হে জগন্মাত, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত, এবং সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা যাহা করি সকলই তোমার পূজা—অর্চ্চনা।

নিত্য উপাসনা যথা:—চিত্তশুদ্ধির জন্য আচমন, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস, প্রাণায়াম, ইষ্টদেবতার ধ্যান,—মানসপূজা ও বাহ্যপূজা জপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম ও মন্ত্র উচ্চারণ, স্তব, প্রণাম এবং আত্মনিবেদন।

সংসারের যাবতীয় কার্য্য, তাঁহার কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। এবং সে সকলও তাঁর উপাসনা মধ্যে গণ্য হইবে। ইষ্টদেবতার পূজা শেষ করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়।

নিয়ম ও অনুষ্ঠান।

ঈশ্বর-উপাসকগণের কতকগুলি নিশ্চিত কার্য্য আছে। যে সকল কার্য্য একান্ত অনুষ্ঠেয় ও যাঁহার অনুষ্ঠানে সংযতমনা জীতেন্দ্রিয় ও স্থিরচিত্ত হইতে পারা যায়, তাহারই নাম নিয়ম। যে সম্প্রদায়ের লোকই হউক না কেন, উপাসনা করিতে হইলে নিয়মের একান্ত প্রয়োজন। নিয়ম প্রতিপালনই এক রকম ভগবানের উপাসনা। নিয়ম পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের বলে ভগবানের কৃপায় জ্ঞান জন্মে, এবং এই জ্ঞানলাভ আচার, বিচার, নিয়ম ও অনুষ্ঠানের ফল।

নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টী সকল সম্প্রদায়-সম্মত ও ঈশ্বরোপসনা করিতে হইলে উপাসকের অবশ্য পালনীয়।

১। বাক্য-চপলতা পরিহার করিবে। যতক্ষণ জীব চঞ্চল থাকে অর্থাৎ জীবের চিত্ত চঞ্চল থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বর চিন্তায় সমর্থ হইতে পারে না।

২। মনকে স্থির করিবে। চঞ্চলতা দূর হইলেই মনস্থির হয়, মনস্থির হইলে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিবে।

৩। সর্ব্বদা বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিবে। বস্তুর সত্যাসত্য নিশ্চয় করিয়া, অসার বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্যভাব হৃদয়ে না আসিলে ঈশ্বরে সব্বতোভাবে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পারা যায় না। এবং নির্ভয় হইয়া প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

৪। সকল বিষয়ে কামনা শূন্য হইয়া কার্য্য করিবে। কামনা ত্যাগ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান রূপ নিয়ম ঈশ্বরোপসনায় একান্ত প্রয়োজন।

৫। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিবে। কি মান কি অপমান কি নিন্দা কি স্তুতি কি আপন গৃহ কি পরগৃহ ঈশ্বরেচ্ছায় যখন যাহা লাভ হয় তাহাতেই যাহার মন সন্তুষ্ট তিনিই ভগবানের প্রিয়।

৬। পরমেশ্বরেতেই মনোনিবেশ বা পরমেশ্বরই মনের বিষয় হওয়া, উপাসনার ফল উপাস্য দেবে চিত্তের একাগ্রতা, এই নিয়মের অনুষ্ঠানই ঈশ্বরোপাসনার ফলের অনুষ্ঠান হইয়া যায় অর্থাৎ ফলের প্রাপ্তি হইয়া যায়।

৭। দম্ভমান ত্যাগ। অভিমান অহঙ্কারাদির লেশ মাত্র থাকিলেও ঈশ্বর উপাসনায় অগ্রসর হইয়া প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং দম্ভমান পরিত্যাগ রূপ নিয়ম ঈশ্বরোপাসনায় একান্ত প্রয়োজন এবং ঐ নিয়ম অনুষ্ঠান করায় ঈশ্বর প্রীত হইয়া তাহার অভীষ্ট ফল লাভের উপায় করিয়া দেন। ভক্তিসূত্রেও আছে যে অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈন্যাশ্রয় করিলে, ভগবান দীনবন্ধু শত সহস্র দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। যদি এই সকল নিয়মের বলে ভগবানকে একবার ভক্তি ডোরে প্রাণে প্রাণে বাঁধিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন রোগ শোক দুঃখ দৈন্য কি অভাবের ভয় থাকে না।

৮। উপাসনার সময় নির্দ্ধারণ। দিবসের যে যে ভাগে, যে মাসে, যে তিথিতে যেরূপ নিয়মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে তাহা অবশ্য পালনীয়।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে ভগবানের কৃপা চাহিয়া না পাইলে সকলই ব্যর্থ। ভগবানের কৃপা না হইলে কি আচার, কি বিচার, কি নিয়ম, কি অনুষ্ঠান কিছুই হইবার নহে। আমরা আচার জানি না, বিচার মানি না, নিয়মাদির অনুষ্ঠান হীন, প্রতিনিয়ত বস্তুর অসারতা দর্শন করিয়াও প্রাণে প্রাণে বিচার করতঃ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কাজেই ঈশ্বরোপাসনার নিয়মাদির কিছু মাত্র অনুষ্ঠান হইতেছে না। যে নিয়মের অনুষ্ঠানে ভগবানকে পাওয়া যায়, যে নিয়মের অনুষ্ঠানে অনন্তকালের সঞ্চিত পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, সে সকল

নিয়ম জানি না, কেহ জানাইলেও অনুষ্ঠানে বিরত, কাজেই ফললাভে বঞ্চিত। এই জন্য একমাত্র করুণাময় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করাই উদ্ধারের উপায়। সকল কথার উপর দয়াময় দীনবন্ধুর দয়া। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"।

রাগিনী বাহার তাল একতালা।

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"।
পাপনাশহেতুরেষ নতু বিচার বাগ্বলং।
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নিৰ্ম্মলং,
বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি, তাত, কিং ফলং॥"
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" সবে বল ভাই!
ওহে ব্রহ্ম কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাইরে।
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি, এ,
(কৃষ্ণ নগর)

শ্রীনাম কীৰ্ত্তন।

——:*:——

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতে পর)

শিষ্য। গুরুদেব, এখন বেলা অধিক হইয়াছে। আপনার আর সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। এখন সংক্ষেপে একটু শ্রীনামের গুণ বর্ণন করুন। শুনিয়া কৃতার্থ হই।

গুরু। শুন বৎস, শাস্ত্রোক্ত কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি শুন তবে

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
নিত্যশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ।

"নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ। এই নাম নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। নাম এবং নামী অভিন্ন"।

গোবিন্দনামসদৃশং ন ত্যাগো ন ব্রতং মুনে।
ন সঙ্কল্পো নাপি শৌচং ন পুণ্যং ন ফলং তথা।

(পদ্ম পুরাণ)

গোবিন্দ নামের সদৃশ ত্যাগ, ব্রত, সঙ্কল্প, শৌচ, পুণ্য ফলাদি কিছুই নহে।

"জ্ঞানং দেবার্চ্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ।
প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ হরিনামসমং নচ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

"জ্ঞান, দেবার্চ্চা, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, যম, প্রত্যাহার, সমাধি, ইহারা কেহই হরি নামের সমান নহে।", অতএব বৎস, ভাবিয়া দেখ, নামের মাহাত্ম্য নামের শক্তি কতদূর ?

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।"

(শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস)

এই নাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল-সকলেরও মঙ্গল জনক এবং সকল আগম নিগমের কল্পলতার ফল। যে ব্যক্তি হেলায় শ্রদ্ধায় একবার তারক ব্রহ্মনাম জিহ্বায় উচ্চারণ করেন, তিনি যে হউন না কেন, এই শ্রীনাম তাঁহাকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভয় পদে লইয়া যায়।

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চনঃ।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"হে দেবি, ঋক, যজু, সাম, বেদাদি পড়িয়া অমূল্য সময় হারাইও না। হরিনাম, গোবিন্দনাম, কীর্ত্তন কর।" প্রাণের প্রিয়তমবৎস, স্বয়ং দেবাধিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন ; আর আমরা কিনা কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বিষ্ঠার কৃমি, তাই আজ না বুঝিয়া, নামের নিন্দা করিতেছি। কি দুর্দ্দিন বৎস ?

ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতং।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলং॥
ন নামসদৃশ স্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ সমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥
নামৈব পরমা মুক্তি র্নামৈব পরমা গতিঃ।

নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব কারণং জন্তো র্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো গুরুঃ ॥"

(কাত্যায়ন সংহিতা)

মহাদেব ভগবতীকে বলিতেছেন "নামের সদৃশ, জ্ঞান, ব্রত, ধ্যান, ত্যাগ, শম, পুণ্য কিছুই নাই। নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, পরম নিবৃত্তি, পরম ভক্তি, পরম মতি। নামই পরমা প্রীতি, পরমা স্মৃতি। নামই কারণ, নামই প্রভু, নামই পরমারাধ্য, নামই পরম গুরু।" অতএব বৎস, নাম ভজ নামে মজ, নাম কীর্ত্তন কর।

"নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
যে নাম ভজিলে ভবে পাইবে নিস্তার ॥"

শিষ্য। আজকাল সমাজে একটী আপত্তি হইতেছে; "কীর্ত্তনে ভদ্রলোকদের নৃত্যকরা একটী বর্ব্বরপ্রথা। ইহাতে যাহার তাহার গাত্রসংস্পর্শে আত্মার অবনতি ঘটিতে পারে। অতএব ছোট লোকের মত ভদ্রলোকেও কেন এইরূপ নৃত্যগীতাদি করিতেছে? ইহাতে তাঁহাদের ঘোরতর প্রত্যবায় হইতেছে।" ইহার বিরুদ্ধে যদি কোন ও শাস্ত্রীয় যুক্তি থাকে, তবে বলুন?

গুরু। কি মূর্খতা বৎস! কীর্ত্তনে হরিনামে মহাপ্রভুর প্রেমময় নামে নৃত্য করিবে, তাহাতে আবার আপত্তি? বলি বৎস, নৃত্যটা কি গায়ের জোরে হয়, না, ভাবের জোরে হয়? ঐ দেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ এম, এ উপাধিকারী বড় বড় বাবুরা যে সারাদিন নামকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, ইহারা কি অশিক্ষিত? না, তোমার আমার চেয়ে ইহাদের পদমর্য্যাদা বা আত্মসম্মান কম? ইঁহারা হয়তঃ দুই এক মাইল পথ হাটিতে শিবিকা না হইলে যাইতে পারেন না, অথচ নামকীর্ত্তনে জলবিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া, সারাদিন নৃত্য করেন,? ইঁহারা কি ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করিতে পারেন? সাধ্য কি? ইচ্ছা করিয়া হইলে নৃত্য সেইরূপ মধুর ও সম্মোহন হয় কি? আর গায়ের জোরে কতক্ষণ নাচিতে পারে? ফলতঃ বৎস, নৃত্যটা ভাব হইতে জন্মে। ভিতরে ভাব ফুটিলে, বাহ্যিক শরীরটা না নাচিয়া থাকিতে পারে না। ঐ শুন শাস্ত্রের অমোঘবাণী—

"সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং পাদরজঃস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা॥"

(নারদ পুরাণ)

"সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া যে মানব নৃত্য করেন, তাঁহার পদধূলিতে (মানুষ দূরে থাকুক) পৃথিবী পর্য্যন্ত পবিত্রা হন।"

"নামকীর্ত্তনং ভবেদ্ যত্র কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স্থানং তচ্চ ভবেৎ তীর্থং মৃতানাং তত্র মুক্তিদম্॥
নাত্র পাপানি তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সুস্থিরানি চ।
তপস্বিনাং ব্রতিনাঞ্চ ব্রতনাং তপসাং স্থলং॥"

"যে স্থলে নামকীর্ত্তন হয়, সেই স্থল মহাতীর্থরূপে পরিণত হয়। সেই স্থলে মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ জীব মুক্তি লাভ করে। সেখানে পাপ থাকে না, পুণ্য চির-বিরাজিত হয়। সেইস্থল তপস্বী ব্রতীদিগের তপস্যা এবং ব্রতের স্থান।" অতএব, দেখ বৎস, এমন দেবদুর্লভ স্থলে নৃত্য করিতে এবং গড়াগড়ি দিতে ক্ষতি কি?

"দেবতায়তনে যস্তু ভক্তিযুক্তঃ প্রণৃত্যতি।
গীতানি গায়ত্যথবা তৎ ফলং শৃণু ভূপতে॥
গন্ধর্ব্বরাজতাং গানৈ নৃত্যাদ্রুদ্র-গণেশতাং।
প্রাপ্নোত্যষ্টকুলৈ র্যুক্ত স্ততঃ স্যান্মোক্ষভাঙ্ নরঃ॥"

(বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসংবাদে)

যম ভগীরথকে বলিতেছেন,—"যিনি ভক্তিমান হইয়া দেবতায়তনে নৃত্য করেন, হে ভূপতি, তাহার ফল শ্রবণ করুন।"

"তিনি কীর্ত্তন দ্বারা গন্ধর্ব্বাধিপতিত্ব (শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ) এবং নৃত্য দ্বারা রুদ্রগণের অধীশ্বরত্ব (মহাদেবত্ব) অর্থাৎ শিবত্ব জ্ঞান লাভ করেন। তৎপর অষ্টকুলসহ ভবসংসার হইতে পবিত্রাণ পাইয়া থাকেন।"

"নৃত্যন্তং বৈষ্ণবং হর্ষাদাসীনো যস্তু পশ্যতি।
খঞ্জো ভবতি রাজেন্দ্র সএব জন্মজন্মনি॥"

(গরুড় পুরাণ)

"প্রেমপুলকে পুলকিত বৈষ্ণবকে দেখিয়া যে নৃত্য না করে, সেই পাপাত্মা জন্ম জন্মান্তরে খঞ্জ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

ইহাতেও কি বুঝিতেছ না বৎস, কীর্ত্তনে নৃত্য করা, মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া দোষের নহে? এইরূপ প্রত্যেক শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ হইতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়। আর কত উল্লেখ করিব?

কীর্ত্তনে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে কি দোষ আছে, বুঝিতে পারিলাম না? হাঁ বৎস, যাহারা কীর্ত্তনের স্থানকে মাটী জ্ঞান করে? তাহাদের পক্ষে দোষ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তগণ সেই স্থানকে মহাতীর্থ, ব্রজের ভূমি বলিয়া জ্ঞান করে। সুতরাং ব্রজের ধূলায় গড়াইব ইহাতে আপত্তি কি? কৈ সকল সময়ত গড়ায় না? তুমি কি প্রাচীন গানে শুন নাই?—

"ব্রজের ধূলায় না মতি হ'ল হায়রে হায়!
ধূলা নয়রে ধূলা নয়রে গোপীপদরেণু॥
সেই ধূলাতে গড়াইয়াছে ব্রজের রাম কানু।
সঙ্কীর্ত্তনের ধূলা যদি পড়ে গঙ্গাজলে।
গঙ্গামুক্ত হ'য়ে যায় পুরাণেতে বলে॥"

অতএব বৎস, ভাবে না হউক, সাধ করিয়া একবার কীর্ত্তনেব ধূলায় গড়াইতে হানি কি? ইহাতে দেহ পবিত্র হয়। ত্রিতাপজ্বালা থাকে না। ভক্তের পদরজে মায়া বন্ধন কাটিয়া যায়। ভক্তি জন্মে; ভাব ফুটে অভিমান, অহঙ্কার দূরে সরিয়া যায়, দৈন্যভাব আইসে। একটা আকুলতা হয়। বৎস, মানুষ মায়ার বাঁধে এই ৩॥০ হাত শরীরটাকে, এই মাত্র ৮৪ আঙ্গুল পরিমিত ক্ষুদ্র দেহটাকে কত গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে। অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। মাটী দিয়া যেন পা ফেলিতে চায় না। কিন্তু এই দেহের পরিণাম ত দুদিন পরে চিতাভস্ম। ইহারই জন্য এত মায়া, এত অহঙ্কার এত দাম্ভিকতা, এত মূর্খতা, একদিন না একদিন ত মাত্র এই ৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত ক্ষুদ্র শরীরখানি মাটীতে মিশাইবে, এখন না হয়, একটু কীর্ত্তনের ধূলায় গড়াইলে, ক্ষতি কি? হয়তঃ সাধু মহন্তের পায়ের ধূলার জোরে এবং কীর্ত্তনের পুণ্যবাতাসে, তোমার কপাল ফিরিতে পারে। সঙ্গগুণে রং ধরিতে পারে। রাং সোণা হইয়া উঠিতে পারে। পাতার নীচের কপাল একটু নামের বাতাসে ভাসিয়া উঠিতে পারে।

বৎস, জগতে সব চেয়ে নীচ হও। উপরে উঠিও না; পড়িয়া যাইবে। সাগরের নিম্নেই রত্ন জন্মে। উপরে কেবল তরঙ্গের অস্থিরতা, দাম্ভিকতা! অহঙ্কার-পাহাড়ের উপর ভক্তির জল উঠিতে পারে না। উঠিলেও বেশীক্ষণ থাকে না! নিম্ন ভূমিতেই ভক্তির স্বচ্ছজল স্থান পায়। অতএব বৎস, জগতে যদি মানুষ হইতে চাও, তবে নীচ হও। নীচতা শিক্ষা কর। সাধু মহন্তের পায়ের ধূলা হও। সঙ্কীর্ত্তনের ধূলির মধ্যে প্রত্যহ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ভাবে হউক, অভাবে হউক গড়াগড়ি দাও, অভিমান দূর হইবে। ভক্তি

আসিবেন। ভক্তি দেবীর গতি নিম্নগামিনী। তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন না। অতএব বৎস, নীচতা দীনতা শিক্ষা কর।

কীর্ত্তনে জাতি ভেদ নাই। তখন সকলই সমান; সকলই ভক্ত। সকলেই তোমাকে কৃপা করিতে পারেন? এই ভাব মনে করিয়া সকলের ধূলা লইতে পার। কীর্ত্তনের ধূলি দিয়া তিলক কর; দেখিবে ক্রমে সাধু ভক্তদিগের গায়ের বাতাসে, তোমার অবিদ্যা ছুটিয়া গিয়াছে। ভক্তি জন্মিয়াছে। ভাব আসিয়াছে। তোমার কাজ তুমি কর। লোকনিন্দার আতঙ্ক করিও না। জগতের প্রত্যেক মহাপুরুষই লোকনিন্দার তীব্র যাতনা সহ্য করিয়াছেন। যিশু ক্রুসে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, মহম্মদ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিলেন; এমন কি স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। অতএব বৎস, লোকনিন্দার দিকে লক্ষ্য রাখিও না। শ্রীমতী বলিতেন "লোকনিন্দা পুষ্পচন্দন অলঙ্কার পড়েছি গায়" এইরূপ হওয়া চাই। লোকে যখন মাংসাদি ভাল জিনিষ হাতে করিয়া লইয়া যায়, তখন কাক, চিল, শকুনি উপর হইতে কত প্রকার কা, কা, চি, চি, প্রভৃতি শব্দ করে। সেই সকল দিকে লক্ষ্য করিলে, অবশেষে হাতের বস্তু হারাইতে হয়। চিলটা অমনি ছোঁ-মারিয়া মাংসটুকু লইয়া যায়। এইরূপ ভাবে বহিরঙ্গ লোকের, বাজে মার্কার কা, কা, হৈ, চৈতে মন দিও না। তাহা হইলে আসল বস্তু হারাইবে কত লোকে কত কথা বলিবে, ইহার জন্য উদ্দেশ্য পথ হারাইও না।

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। কিন্তু আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কতকগুলি লোকে বলিয়া থাকেন "আচ্ছা বাপু তোমরা হরিনাম কর কৃষ্ণ নাম কর, প্রভুর নামকীর্ত্তন কর, কিন্তু ইহার সঙ্গে গৌর নিতাইর নাম কেন কর? গৌর নিতাইত ভগবান বা অবতার নন, সুতরাং তাঁহাদের নাম কেন, নামকীর্ত্তনে যোজিত কর?" আমি এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া নিরুত্তর। আশা করি ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া আমার মনের ধাঁ ধাঁ দূর করিবেন।

গুরু। বৎস, এই সমস্ত কথা শুনিলে হাসি আসে। ইহা হইতে মূর্খতা ও বাতুলতা কি হইতে পারে? ইঁহারা ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ধান্যের উপকারিতা স্বীকার করে, পরন্তু জমির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যিনি প্রথমতঃ জীবের ঘরে ঘরে নাম বিলাইলেন, যিনি প্রথমতঃ জগতে নামকীর্ত্তন আপনি আচরণ করিয়া, প্রচার করিলেন, সেই সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিশ্বাস করেন না।

অথচ তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তি আছে, ইহা কি বৎস, সত্য হইতে পারে? নিশ্চয়ই ইহা বিদ্বেষ-জনক। নতুবা মাতৃদুগ্ধের প্রশংসা করিতে পারে, মায়ের প্রশংসা করে না কেন? ইহা কি সম্ভব? এই সনাতন ভারতবর্ষে ত পূর্ব্বে নামসঙ্কীর্ত্তন ছিল না।

মহাপ্রভুই প্রথমতঃ নামসংকীর্ত্তন প্রচার করেন, তিনিই প্রথমতঃ "হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ" এই গানটী গাহিয়াছিলেন। সেই হইতে নাম সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি। অতএব যিনি নাম সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করিলেন, কীর্ত্তনে তাঁহার নাম থাকিতে পারিবে না, এ কেমন কথা? পুত্রের সুখ্যাতি করিব, অথচ পিতার নাম লইতে পারিব না এ কেমন শিক্ষা? বিশেষতঃ যে গানে আমার গৌর নিত্যানন্দের নাম নাই, সে গানে আনন্দ হয় না। কেন না আমার গৌর নিত্যানন্দই যে, ঘরে ঘরে এই নাম বিলাইয়া আনন্দ দিয়াছেন, এই নাম জপিয়া, নামের শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারাই যে, নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং যে কীর্ত্তনে তাঁহাদের নাম নাই, সেই কীর্ত্তনে কিরূপে আনন্দ হইবে? একবার বৎস, বাহু তুলিয়া, প্রেমানন্দে মাতিয়া, "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ বল। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম বল।" একবার এই নাম কর।

দেখিবে আপনিই নামের আনন্দধারা বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা এমন আমার এই প্রাণগৌর নিত্যানন্দের নামে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারাও যদি একবার হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া গাহিয়া, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ বলেন, তবেই আমার গৌর নিত্যানন্দের অসীম কৃপায়, প্রেমানন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু অন্ধ জীব ত তাহা করিবে না। হিংসায় পেট পরিপূর্ণ। শৃগাল, কুকুরের মত কেবল, খেকাখেকি করিতেছে।

বৎস, তুমি আর এক আপত্তি করিতেছ, গৌর ভগবানের অবতার নয়; সুতরাং তাঁহার নাম কেন করিব? এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে না বলিলে বুঝিতে পারিবে না। তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আর একদিন ভাল করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। কেন না তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। বৃহৎ একখানা গ্রন্থ হইয়া যায়। এখন সময় নাই। যখন "নবদ্বীপে অবতার" এই সম্বন্ধে আর একদিন উপদেশ দিব, তখনই বলিব। এখন বৎস, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাও। সন্দেহ-বৃশ্চিকে আর দংশিত হইও না। ভেদাভেদ দূরে ফেলিয়া দাও। একবার হৃন্মন্দিরে প্রাণগৌর নিত্যানন্দের যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কর। মন-তুলসী দিয়ে তাঁর পূজা কর। অশ্রুগঙ্গাজলে তাঁহার চরণকমল ধোয়াও। প্রেমের গায়ত্রী,

প্রেমের ওঙ্কার রূপ ধ্যান কর। ভক্তিচন্দনে প্রেমফুল মিশাইয়া, পুষ্পাঞ্জলি দাও। জ্ঞানধূপিতে শ্রদ্ধাধূপ দিয়া, অনুরাগ বাতাস সহযোগে তাঁর আরতি কর। একবার প্রেমানন্দে মনানন্দে নাচিয়া গাহিয়া বদনভ'রে বল বৎস, "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ, (তাহা হ'লে) ঘু'চে যাবে মনের সন্দ।'

বৎস, কি বলিব? তোমার কথায় আজ আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গদেব নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া, জগতে এক শান্তির মধুর-রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন; তিনি এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মজগতে যে অফুরন্ত সুধা রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অফুরন্ত সুধা যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত জীব পান করিয়া অমর হইবে। সেই চির-স্মারক তারক-ব্রহ্ম নাম "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ"...ইত্যাদি।

এই শ্রীনাম কলিযুগের নবগায়ত্রী, এই নাম রসময় প্রেমময়, এই নামের শক্তি অদ্ভুত। উহার দ্বারা ভ্রাতৃত্ববন্ধন ফুটিয়া উঠে। (Universal Love) বিশ্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হয়। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে কোলাকোলি হয়। এই নাম সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, (Universal religions)। উহা কোনও সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে।

আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী ভারতবাসী যে সর্ব্বত্র সাম্যনীতি ও ভ্রাতৃত্ব-ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ২৪ বৎসরের এক ব্রাহ্মণবালক (মহাপ্রভু) বলিয়া গিয়াছেন;— "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" সেই শক্তি, সেই তেজ আজও সমাজের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান আছে। ঐ দেখ নামকীর্ত্তনে প্রেমানন্দে বিভোর কুলীন পণ্ডিত-শিরোমণি অস্পৃশ্য চণ্ডালের পদে গড়াগড়ি দিতে কিছু শঙ্কাবোধ করিতেছে না। বাস্তবিক ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ; ধর্ম্ম-ভাব জাগাইতে না পারিলে শুষ্ক কতকগুলি অসার বক্তৃতার দ্বারা এই ধর্ম্মপ্রাণ-দেশে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাব জাগাইতে পারিবে না। পার যদি একবার বুক ফুলাইয়া বল, সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া বল,—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' তখন দেখিবে সকলেই ভাই, ভাই; জাতি হিংসার দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তখন জগতে এক শান্তির বাতাস বহিবে। হায়! আবার জগতে সে দিন কবে আসিবে!

শিষ্য। গুরুদেব! আজ আপনার কৃপায় নামের মাহাত্ম্য কিছু বুঝিলাম, আশা করি মাঝে মাঝে এ অধমকে এইরূপ কৃপা করিবেন। এখন সময় অসময় হইয়াছে। প্রণাম করি।

গুরু। কল্যাণ হউক বৎস, গৃহে যাও, গৃহে যাইয়া সেই সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা ভজনা কর।

"সংকীৰ্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীৰ্ত্তন যজ্ঞে ভজে সেই জীব ধন্য॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীবিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন।
ডুবলাচাঁদ নোয়াখালী

ভিক্ষা।

—:*:—

হে গুরো দয়াল. আমি হে কাঙ্গাল,
অনন্ত প্রেমের বটে।
দাও প্রেমভিক্ষা, গুহ্যতম শিক্ষা,
মাগিতেছি করপুটে।
মানুষের প্রেম, বড় জ্বালাময়,
জুড়া'তে নারিনু তায়।
কিসের লাগিয়া, কেন প্রাণ জ্বলে,
কিছুই বুঝা না যায়!
তুমি,—অনন্ত সাগর প্রেমের আকর
জুড়া'তে এসেছি তাই।
দাও,—মধুর সে প্রেম, বড়ই শীতল,
তাহাতে মিশিয়ে যাই!

শ্রীমতী সুবালা দেবী।
মঢ়াতাল জব্বলপুর।

প্রার্থনা।

—*::—

গৌর হে!

আমি আর সইতে নারি, সইতে নারি
সইতে নারি গৌরহরি।
বুঝি বা এবার আমি প্রাণে ম'রে যাই!
বুঝি আমি ম'রে যাই, যদি তোমায় না পাই,
সেও ভাল, যদি তোমায় ভে'বে মরতে পাই।
দিনমণি ডোবে ডোবে, সন্ধ্যার আরতি ভে'বে,
মৃদঙ্গ মধুর ধ্বনি মরমে জাগাই।
ভাবে প্রাণ ভাসাই, ভাবে চৌদিকে তাকাই,
এই দেখি, আছ তুমি এই দেখি নাই!
পতিতের সখা, দেও বা না দেও দেখা,
একটুকু দাস্যভক্তি ভিক্ষা আমি চাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাল।
বাঘিয়া ঢাকা

কাঙ্গালের মনের কথা।

——:**:——

(২)

মনের সয়তানি লুকাইয়া রাখিয়া বড় বড় গোসাঞির মত গাম্ভীর্য্য,—ভাবুকের মত ভাব-ভঙ্গী,—ভক্তের মত দৈন্য-বিনয় অভ্যাস করিয়া লইলাম। লইয়া একটি বিড়াল তপস্বী বা "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" বলিয়া উঠিলাম। হা কৃষ্ণ! আমার গতি হইবে কি?

যখন গুরু গণ্য হইয়া উঠিলাম, তখন শাস্ত্র-গ্রন্থে অভ্যাস থাকা আবশ্যক,—অগত্যা কতকগুলি মোটামোটি শ্লোক-বচন আওড়াইয়া মুখস্থ করিয়া লইলাম।

নিত্য-ব্যবহার্য্য বচন কয়টা জানা না থাকিলে গোসাইগিরীর পক্ষে হানি আছে,—সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে শ্লোক শিখিতে হইল।

না,—কিছু কিছু করিয়া যেমন তেমন একটা বিদ্যাবাগীশ হইয়া গেলাম। গোসাঞি হইলাম, বিদ্যা শিখিলাম, ভক্তি-বিনয়ে বাহিরে একবারে—"তৃণাদপি"র মূর্ত্তিমন্ত অবতার,—এখন আর আমাকে পায় কে?

গৌরব আর গায় ধরে না। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব আমার নিকট তৃণবৎ। অত্রাবস্থায় যে আত্মপ্রকাশের অভিলাষটী অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিবে,—তাহার আর সন্দেহ কি?

এই দুষ্ট ইচ্ছাটীকে ফলবতী করিবার জন্য বৈষ্ণব নিগ্রহই আমার ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল। এখানে সেখানে যাইয়া, কি যাঁরে যেখানে পাই,—তাঁরেই কূটপ্রশ্ন করিয়া জব্দ করি। আমার শ্লোক-বচনের চোটে নিরীহ বৈষ্ণবগণ অস্থির হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আমার কুতর্কে প্রায় বৈষ্ণব সমাজ পরাস্ত। এখন আমাকে দেখিয়া সকলেই যমের মত বিবেচনা করে। আর যাহারা নির্ব্বোধ,—তাহারা মনে করে,—"এমন একটা জানাশুনা লোক নাই। এই একটা মানুষের মত মানুষ, আর কি?"

আমি তো আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় দেখাইয়া সকলকে নীচে রাখিয়া স্বয়ং উপরে থাকি। আর বলিয়া বেড়াই,—"কেহই কিছু জানে না,—যাহা কিছু জানি আমি।"

না,—হইতে হইতে গুরুত্যাগ করিলাম। কেহ গুরুত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলি,—"ইনি কি গুরুর উপযুক্ত? ইনি কি জানেন? এরূপ গুরুত্যাগ করিলে দোষ নাই।" প্রশ্নকারী নিরুত্তর।

আমার এইরূপ প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখিয়া কতগুলি নিতান্ত সরল লোক অনুগত হইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে গণ্ডমূর্খের সংখ্যাই অধিক। নতুবা এমন নরাধমকে গুরুজ্ঞান করিবে কেন?

আর যাঁহারা সংসারে চালাক চতুর,—তাঁহারা আমার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আমার কপটতায় মুগ্ধ না হইয়া নীরবে দূরে থাকিয়া আপন আপন সাধুত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য পিশাচ পিশুন লইয়া আমি এক দল বাঁধিয়া বসিলাম। গুরুগিরী তো করিলাম,—তন্ত্রমন্ত্র যাহা শিক্ষা দিবার দিলাম।

এখন আর গুরুগিরীও ভাল লাগে না। ইহাতে মানবজীবনের সম্পূর্ণ

সার্থকতা লাভের কি আছে? একটা "অবতার" না হইলে আর হয় না। তখন আমার মনে কেবল "অবতারে"র আবেশ ভাবনা। "অবতার" একটা হওয়াই চাই।

না,—ধীরে ধীরে একটা ছোটখাট "অবতার"ই হইয়া গেলাম। যখন অবতার হইলাম, তখন অবতারের লীলাভিনয়ই আমার প্রধান কার্য্য। কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন জলে জঙ্গলে দৌড়াইয়া যাই,—আগুনে ঝাপ দিতে চাই,—ধূলায় গড়াগড়ি করি,—ভাবাবেশ ভাণ করিয়া নদীয়ার কথা প্রকাশ করি। মনের ধারণা,—লোকে বুঝিয়া লউক,—"কলির জীব তরাইতে আবার গৌর আসিয়াছেন।"

আমার দলের মূর্খেরা বুঝিল, ইনি নদীয়ার শচীনন্দন। আমিও শ্রীগৌরাঙ্গের মত হাবভাব দেখাইতে সাধ্যমত ক্রুটি করিতেছি না। হা গৌর! হা গৌর! হা গৌর!!! এ পাতকীর নিস্তারের জন্য কি উপায় করিয়াছ?

শিশ্নোদরপরায়ণ আমি নরাধম, মোহবশে এখন আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না। প্রভু গো! তোমার উক্তিতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী-নিঃসৃত নিম্নোক্ত কয়েকটী কথার সত্যতার প্রমাণ আমা হইতেই হইয়া গেল!!

"উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় "ঈশ্বর আমি" মূলে জরদ্গব ॥
গর্দ্দভ, শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে "আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া ॥"
কুক্কুরের ভক্ষ্যদেহ, ইহারে লইয়া।
বোলায় "ঈশ্বর" বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হৈয়া ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২৩ অঃ।।

আপনে আচরণ না করিয়া জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যায় না,—যথা—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

অবতারধর্ম্ম যখন এইরূপ,—তখন আমাকেও তাহাই করিতে হইল। গোফ দাড়ি রাখিলাম,—আমার ভক্তেরাও রাখিল, আবার ফেলিয়া দিলাম,—সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ফেলিয়া দিল!

ফোটার পারিপাট্য করিতে আর কমি করিলাম না। সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আঁকিলাম, নাকে-কপালে উর্দ্ধপুণ্ড্র আঁকিলাম,—গলায় তুলসীর

কণ্ঠি ধারণ করিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে, দলের সকলেই বৈকুণ্ঠের বিভূতি লইয়া দ্বিতীয় বিষ্ণুকলেবর ধারণপূর্ব্বক মহাতপস্বী সাজিল।

কিন্তু মাছখাওয়াটা দূর হইল না। আমিও মাছ খাই,—আমার হতভাগ্য ভক্তেরাও মাছ খায়!!

হায়! হায়!! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! আর উপায় নাইরে, আর উপায় নাই। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি মুদ্রা ধারণ করিয়া, গলায় তুলসী বাঁধিয়া আমি নরাধম মৎস ভক্ষণ করিলাম!! হায় কি পরিতাপ!! হা কৃষ্ণ! হা গৌর! হা নিতাই! আমার গতি কি হইবে? আমার মত আত্মঘাতী আত্ম-প্রতারক চণ্ডাল তো আর এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়টি নাই।

হায়! হায়!! রক্ত-মাংসের একটা পঁচাগলা শরীর লইয়া,—দু'দিনের জন্য মরজগতে মরিতে আসিয়া কি অমার্জ্জনীয় অপরাধই না করিয়া গেলাম!!!

ভগবানের ভজনসাধন করিলাম না, সাধুসঙ্গে বসিয়া দুটা কৃষ্ণকথা কহিলাম না,—শুনিলাম না। হায়! হায়!! সময় থাকিতে আপন দুষ্টামি বুঝিতে পারিলাম না। এখন আমি কোথায় যাই? কি করি?

হে কৃষ্ণভক্তগণ! হে দয়াময় গৌরগণ! তোমরাই এই প্রকার কপটাচারী আত্মপ্রতারক পাপীর পরমাশ্রয়। তোমরাই ভরসাস্থল। দয়া করিয়া এই মহা-পাতকীকে উদ্ধার কর। ওগো! তোমরা এই গতিহীনের গতি কর। হরি-বোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি।

সহিলপুর।

"মহাযজ্ঞ।"

——:*:——

সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ ভগবান অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাস-মঞ্চে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ও তাঁহার চিচ্ছক্তি গোপাঙ্গণাগণসহ নিত্য পূর্ণানন্দে রম্যমান। সেই গোলোকধামেরই দ্বিতীয় কলেবর বা ছায়া মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে সেই রাসবিহারী হরি, দ্বাপরযুগে শারদীয় পৌর্ণমাসীতে সহসা সেই মহারাসের পূর্ণানন্দোৎসব করিবার অভিলাষ করতঃ ভক্ত-চিত্তাকর্ষণী মন্ত্রঘোষ নামক তাঁহার মোহনমুরলীতে ধ্বনি করিলেন। গোপাঙ্গণাগণ যিনি যে ভাবে অবস্থিত

ছিলেন সেইভাবেই দিক্‌বিদিক্ লক্ষ্য না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হওতঃ শ্রীরাস-মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। ভগবান এক হইয়াও অনন্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া সেই অনন্ত গোপিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদিতে নিমগ্ন হওতঃ শ্রীরাসের রসাস্বাদ করিলেন। অমরবৃন্দ ও মুনিঋষি সকল ভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলারসের সুখাস্বাদ করিবার জন্য সকলেই অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ঘন প্রণিপাত স্তবস্তুতি করতঃ সচন্দন তুলসীপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপ্সরা ও কিন্নরীগণ প্রেমানন্দে শ্রীগোবিন্দের এই রাসলীলা বর্ণন-রূপ গীত গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরম মৃদু মধুরভাবে যমুনা প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। বৃক্ষ লতা সকল সহসা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমগণ ললিত মধুরস্বরে ভগবানের অমিয় রাসলীলার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে লাগিল। শুকশারীদ্বয় 'জয়রাধে শ্রীরাধে' রবে শ্রীবৃন্দাবনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল। ময়ূরময়ূরী শিখি বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীরাসমঞ্চের পুরোভাগে নাচিতে লাগিল। সেই মহানন্দের আনন্দধারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইল। তাহাতে ত্রিজগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল। অতএব শ্রীরাসই পূর্ণানন্দের সুস্বাদু সুধা। মধুর হইতেও অতি সুমধুর ও পরম আস্বাদ্য।

এই ধন্য কলির প্রথম সন্ধ্যায় সেই পূর্ণ ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যলীলার পরম সহায় গোপ-গোপাঙ্গণা ও পার্ষদাদিসহ গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীশ্রীনব-দ্বীপধামে শ্রীরাধার ঋণ পরিশোধার্থে তাঁহার নবঘন কালরূপখানি শ্রীরাধিকার রূপলাবণ্যে আচ্ছাদন করিয়া পূর্ণানন্দপ্রদ শ্রীরাসের অভিনয় করিয়া জগতে এই আনন্দের ছড়াছড়ি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের গৌরলীলায় এই রাসের অপর নাম শ্রীসঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তন শ্রীরাসের অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃদঙ্গ তাঁহার মোহনমূরলী। সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ গোপীভাবাপন্ন হইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হওতঃ 'রাধা রাধা গোবিন্দ' বলিয়া তাঁহার যুগলরূপের মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া থাকেন। অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহর ও নবরাত্রি যে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে ইহা সেই মহারাসের পূর্ণানন্দানুভব মধ্যে রাধাকৃষ্ণকে রাখিয়া মণ্ডলাকারে গোপীভাবে বেষ্টন করিয়া রাধামাধবের নামানুকীর্ত্তন করা হয়। সঙ্কীর্ত্তন শ্রীরাসের অভিনয় বলিয়াই সঙ্কীর্ত্তনে এত আনন্দ। সে আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত ও সুলেখক ভক্তপ্রবর আমাদের শ্রীযুত কালীহর বসু ভক্তিসাগর মহোদয় তাঁহার 'মহাযজ্ঞ' গ্রন্থে এই মহানন্দের প্রেমানন্দধারা

বহাইয়াছেন। প্রেমিক গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকাতেই বলিয়াছেন "মথিত দ্রব্য (নবনীত) ভাণ্ডারকে গ্রন্থ বলি। গৌরচন্দ্র প্রেমসুধা সমুদ্র; কীর্ত্তনানন্দের মঙ্গল মধুর আন্দোলনে যে সুস্বাদু সুধা সমুত্থিত হয় তাহাই 'মহাযজ্ঞে'র হব্যকব্য সম্ভার সুসার" "কলিতে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই মহাযজ্ঞ।" গ্রন্থকার মহাশয় আবার বলিয়াছেন "এ কথা নদীয়া নাগরীর মুখেই শোভা পায়" আমরাও এই কথার সমর্থন করিয়া বলিতেছি সেই "কালাকলঙ্কিনী" নাগরীগণের মধ্যে কেহ 'কালীহর' নামে আমাদিগকে ধন্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আনন্দধারা ঝর ঝর করিয়া ঝরিতেছে। ভক্তিসাগর মহোদয় প্রকৃতই ভক্তির সাগর। তাঁহার 'মহাযজ্ঞ' গ্রন্থখানি প্রেমভক্তির প্রস্রবণ বিশেষ। গ্রন্থের কোন্ স্থানের কথা রাখিয়া কোন্ স্থানের কথা বলিব ? সকল স্থানই যে মধুময় বলিয়া জ্ঞান হয়! কোথাও আছে :—

মধুর মধুর গোরকিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত মধুর মধুর তান।
মধুর রসেতে মাতল ভকত—মধুর মধুর গান।

কোথাও আছে :—

"কিসের ভয় কিবা গুরুজন লাজে।
মধুর মূরতি সে লাগল হিয়ার মাঝে॥"

আবার কোথাও আছে :—

"জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে অম্‌নি গোরা পড়ছে ঢ'লে।
গদাধর ধর তু'লে প্রাণ গোরাচাঁদেরে॥"

আ মরি মরি! গ্রন্থের যে আগাগোড়াই মধুভরা। হে মধুপিপাসিত ভকতবৃন্দ! মধু অন্বেষণার্থ আর নানা ফুলে উড়িয়া বেড়াইতে হইবে না, ভক্তিসাগরের এই "মহাযজ্ঞ" রূপ মধুচক্র আশ্রয় কর এবং মনঃপ্রাণ ভরিয়া উদর পূরিয়া মধুপান কর!

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ ভক্তিতত্ত্ববিশারদ।
চাঁইবাসা, (সিংহভূম)

চৈতন্য-চন্দ্রালোক।

গৌররূপ।

সেই অরূপের দেশে যে রূপই থাক—এই রূপের আগারে রূপ না হইলে চলিবে কেন? ভগবান শ্রীহরি তাই গৌররূপ ধারণ করিয়া জগতের মন হরণ করিলেন। কিন্তু রূপখানি সেই অরূপ ছানিয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া বরাবর একরূপ দাঁড়াইল না! ইহাতেই মহানুভব ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের মনে ধাঁধাঁ উপস্থিত হইল। তিনি চাঁদ দেখিবার লোভে চকোরের ন্যায় তৃষিত অন্তঃকরণে ছুটিয়াছিলেন শেষে কিনা—

"জিনিঞা রবিকর, অঙ্গ মনোহর,
নয়নে হেরই না পারি।"

বলিতে বাধ্য হইলেন। বলি এখন "নয়নে হেরই না পারি" বলিতেছ কেন? এই না একটু আগে "হে মাই হে মাই, দেখত গোরাঙ্গচন্দ্র" মা মা, তোর গৌরাঙ্গ-চন্দ্রকে তুই দ্যাখ ত,—বলিয়া চাঁদ দেখার সাধ পূর্ণ করিতেছিলে? তাঁহাকে যথার্থই সুধাসমুদ্র জ্ঞানে আধ আধ আনন্দবাণীতে সুরম্য পদের সৃষ্টি করিতেছিলে? এখন 'ইঁহার অঙ্গজ্যোতি সূর্য্যকিরণকেও পরাস্ত করিয়াছে, ইহার দিকে চাহিতে পারিতেছি না' বলিতেছ কেন? না না ঠাকুর তাতো বলিবারই কথা এতো যেমন তেমন রূপ নয়, এ সেই অরূপ-সাগরমথিত অপরূপ রূপের ছটা! একি একরূপ থাকিতে পারে? থাকে না বলিয়াই ঠাকুরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যথা—

"আয়ত-লোচন, ঈষৎ-বাঙ্কম,
উপমা নাহিক বিচারি।"

এখানে "চোখ গেল, চোখ গেল" বলিয়াও ঠাকুর নয়ন দুইটীর ঈষৎ বক্রতা ও বিশালতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন ইহা কঠিন ব্যাপার, তাই উপমা বিষয়ে একটু সংযম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন, ফলে কিন্তু সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিলেন না। পরক্ষণেই দেখা যায়, রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়া নিকষে সুবর্ণকষার মত গৌররূপ কষিয়া লইয়াছেন। যথা :—

"চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তাঁহা বনমাল।

চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥”

কৈ ঠাকুর উপমা না দিয়া সারিতে পারিলে কৈ? হায় হায়রে, এ রূপ কি দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। যার দর্শনে, স্পর্শনে, স্মরণে, মননে জগতের সকল পদার্থ চুম্বক-আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। না থাকে শ্বাস, না থাকে স্পন্দন, না থাকে লোকলাজ বন্ধন, চন্দনের ন্যায় শীতল প্রলেপ হইয়া প্রাণে মিশিয়া যায়। ঠাকুর তো ঠাকুর,—গৌররূপ স্মরণে আমাদের ন্যায় কুকুরের মনও গাহিয়া উঠে—

তু’লেছে অধীর ক’রে মন।
ধীর হইতে বলিস্ তোরা, গৌর-পীরিতের ধারাই এমন।
গৌর-প্রেমের ঢেউ যার লাগে গায়,
গুণ্ গুণ্ করে গৌরগুণ গায়,
নীরবে থাক্‌তে কি পায়, প্রাণ করে তার কেমন কেমন।
কইতেছি সই, শপথ ক’রে
মন আমার নাইক ঘরে
গৌরাঙ্গ প্রেমসাগরে কর্‌তে গেছে তৃষ্ণা দমন।
কুমতি কুটিল যারা
গৌররূপে হয় আত্মহারা
কহে,—“ওগো দাঁড়া দাঁড়া করিলো তোর সঙ্গে গমন।”

ভাই সব! চল আজ গৌর-চরণের সুরসিক ভৃঙ্গ শ্রীল ঠাকুর মহোদয়ের পদানুসরণ দ্বারা ত্রিলোকসেব্য গৌররূপ-সুধাপানের চেষ্টা কার। ঠাকুর কথিত ঐ যে ‘উপমা নাহিক বিচারি’ কথাটা কেবল চোখ দুইটী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায় না, কারণ ইহার পরেই একপদী ছন্দে চোখের বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

“অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥”

অর্থাৎ “মহারাজ চক্রবর্ত্তীদের মুখচোখ যেমন থাকে ইঁহার মুখচোখেও সেই সকল শুভচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে” এ কথায় কি চক্ষের উপমা প্রকাশ পাইল না? পাইয়াছে বৈ কি? বাস্তবিক সেই অপরূপ রূপ দর্শনে সঙ্কল্প স্থির রাখা বড় সহজ কথা নয়। ঠাকুর তো ধ্যানযোগে সেই জগন্মোহন রূপলহরী দর্শন করিতেছিলেন, যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাহাদের অবস্থাটাই দেখ না কেন, অন্যের কথা ছাড়িয়া

দিয়া যাঁরা সেই রূপের দুলালকে লাভ করিতে পারিয়া জনক জননীরূপে জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন তাঁদের দশাখানাই ভাবিয়া দেখ। যথা :—

"শচী জগন্নাথ হেরি পুত্রের সেরূপ।
একেবারে হইলেন আনন্দ স্বরূপ॥
কি বুদ্ধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে ব্যস্তে নারীগণ জয়কার পূরে॥"

ইহা রূপের ধাঁধাঁ নহে কি? না হইলে এ রূপ কেন হইবে? পুত্রকন্যা জন্মলাভহেতু সংসারে পিতৃমাতৃ-কর্ত্তব্য ত সুনির্দ্দিষ্টই আছে? কিন্তু থাকিলে কি হয় রূপের জোয়ারে কর্ত্তব্য 'টর্ত্তব্য' সব ভাসিয়া গিয়াছে।

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী একজন পরম জ্যোতির্ব্বিদ। তিনি দৌহিত্রের লগ্ন নিরূপণ জন্য যথাকালে আহূত হইলেন। জ্যোতিষিক অঙ্কপাতের পূর্ব্বে নাতিটীকে এক নজর দেখিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্যই বটে। তিনি তাই (সম্ভবতঃ তৎকাল প্রচলিত ঠাকুর দাদার আচরিত দুটো ব্যঙ্গোক্তি সহ) সেই কর্ত্তব্য সারিয়া লইলেন। কিন্তু যেই দেখা সেই আর যায় কোথা, দাদা ঠাকুরের জরালাঞ্ছিত চোখে রূপের ধাঁধাঁ প্রবেশ করিল। হায় হায়রে, তাঁহার দীর্ঘকালের আলোচিত বিদ্যাও—আজ তাঁহাকে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত করিতে পারিতেছে না, ক্রমেই যেন গোল বাধিতেছে। যথা—

"শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে॥"

এই সার সত্যে ধরা দিয়াছে। গোরারূপই যত অনর্থের গোড়া হইয়াছে। ভক্তের সঙ্কল্প, পিতৃমাতৃ-কর্ত্তব্য, পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত সমস্তই ঐ রূপের কাছে হার মানিয়াছে। যেরূপ আকার দেখা যাইতেছে শেষে বুঝি জাতিকুলের দফাও রফা করিবে। হরি হরি হরি! কি সর্ব্বনেশে রূপ গো!!!

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

আনন্দ।

শ্রীবৈষ্ণব।

—:*:—

বিষয় বিতৃষ্ণ মনে নির্ব্বিকার চিতে
কে ওই তাপস মূর্ত্তি মগ্ন সমাধিতে?
তরুণ তপন আভা করুণ নয়নে
খেলিছে আনন্দজ্যোতি প্রসন্নবদনে!
বিলম্বিত শিখাগুচ্ছ বিমুণ্ডিত শির
প্রশস্ত ললাটে আঁকা শ্রীহরি মন্দির!
শোভিছে ত্রিকণ্ঠি কিবা কণ্ঠে মনোহর
করে দোলে মাল্যাধার ইষ্ট স্ফুর্ত্তিকর।
দীনতার প্রতিবিম্ব করিয়ে বিকাশ
শোভে ছিন্ন উত্তরীয়, ছিন্ন বহির্বাস!
কামনা আহুতি দিয়া ত্যাগের অনলে
তৃণাসনে ব'সে কেও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে?
অভক্ত করিবে কি সে মর্ম্ম অনুভব
যুক্ত বৈরাগ্যের ছবি ইনি শ্রীবৈষ্ণব॥

প্রভু ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি।

———:*:———

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে প্রভু আমার ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর তখন স্বাধীন রাজ্য। রাজা রুদ্রপতি এই রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার প্রবল প্রতাপে সকলেই সশঙ্কিত। তিনি আবার পরম ভগবদ্ভক্ত। প্রভুর সহিত তাঁহার দক্ষিণ পথ ভ্রমণ সহচর গোবিন্দ আছেন। ত্রিবাঙ্কুর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও জনাকীর্ণ জনপদ। এই নগরীর প্রান্তভাগে একটী বৃক্ষতলে প্রভু আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যাস্ত-গমনের কিছু পূর্ব্বে প্রভু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবঙ্কু নগরে।
বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥ (গোবিন্দের কড়চা)

কনক-কান্তি-বিশিষ্ট পরম জ্যোতিস্ময় সুবলিত দেহ, দীর্ঘাকার এক দেবমূর্ত্তি গোধূলী সময়ে নগরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দর্শনে, নগরের বাল-বৃদ্ধ যুবা আসিয়া দলে দলে একত্রিত হইল। তাহারা নগরে ফিরিয়া যাইয়া সেই রাত্রিতেই সমগ্র নগরে প্রভুর আগমন সংবাদ প্রচার করিল। প্রভু আমার সে রাত্রি বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিলেন। সৌভাগ্যবান একজন গ্রাম্য লোক তাঁহাকে ভিক্ষা আনিয়া দিলেন :—

একজন গ্রাম্য লোক চুনা আনি দিলা।
বৃক্ষতলে থাকি প্রভু রজনী যাপিলা॥

পরদিন প্রভাতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমস্ত লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ধন্য হইল। প্রভুর অপরূপ রূপরাশি একবার যে দর্শন করিল সে জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিল না। প্রভুর আগমন বার্ত্তা তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। প্রভুকে দর্শন করিয়া লোক গৃহে ফিরিতেছে, আর বলাবলি করিতেছে—"এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই? এমন সুন্দর সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিলেন? যেন সাক্ষাৎ ভগবান!" একবার দর্শনেই প্রভুর প্রতি তাহাদের কেমন একটা প্রীতির ভাব উদয় হইল। প্রভুকে না দেখিয়া তাহারা আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। যে একবার দেখিয়া গেল সে আবার আসিল,

তাহার আহার নিদ্রা, সমস্তই লোপ পাইল। এইরূপে প্রভুর নিকটে অনেক লোকের সমাগম হইল। সকলেই যোড় হাতে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান :—

গোরার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া সকলে।
যোড়হস্তে আসিয়া দাঁড়ায় সেই স্থলে॥

প্রভু আমার বৃক্ষতলে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে হরিনাম জপ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নিস্পন্দ, লোমাঞ্চিত কলেবর, কনক-কেতকী সদৃশ দুইটী নয়নের কোণে অবিরল অশ্রুধারা! পুলকে সর্ব্ব অঙ্গ পরিপূরিত! এইরূপ অপূর্ব্ব রূপবান, ভক্তিমান প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার নিকট হাত যোড় না করিয়া কে থাকিতে পারে? সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ! কেহ ফল মূল আনিয়া সন্ন্যাসীর নিকট রাখিতেছে, কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিতেছে "প্রভু, আমার গৃহে চল, তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিব।" কেহ বলিতেছে "ওগো, সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও না।" কেহ বলিতেছে "এ সন্ন্যাসী মানুষ নহে, সাক্ষাৎ দেবতা।" প্রভু আমার হরিনামে বিভোর। কাহারও প্রতি নয়ন মেলিয়া চাহিলেনও না।

হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নয়ন।
দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মন॥
বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে।
নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।
ভাব দেখি গ্রাম্য লোক কত স্তব করে॥
কেহ বোলে "মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী।"
কেহ বোলে "তোমারে দেখিতে ভালবাসি॥"
কেহ কেহ ফল মূল আনিয়া যোগায়।
নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়॥

ইহার মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ অতি কষ্টে যষ্টি হস্তে করিয়া, সেই লোকের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অতিশয় ভক্তিসহকারে অন্য এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিল "সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায়? আমাকে কি একবার দর্শন দিবেন না?" প্রভু হরিনামে উন্মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। কিন্তু এই বৃদ্ধের ভক্তিপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাড়াতাড়ি বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া বৃদ্ধের

নিকটে আসিলেন। প্রভুর দয়া দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দে কাঁদিয়া আকুল হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইল :—

একজন বুড়া আসি কহে ভক্তিভরে।
কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরারায়।
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায়॥

প্রভু স্বহস্তে এই বৃদ্ধের নিকট ফল মূল চুনা ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

প্রভুর এই সকল কাহিনী রাজা রুদ্রপতির কাণে গেল। তিনি ধর্ম্মানুরাগী ভগবদ্ভক্ত, সাধু সন্ন্যাসীর প্রতিপালক রাজা। তিনি মহা আনন্দের সহিত আগ্রহ করিয়া প্রভুকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাজা রুদ্রপতির লোক আসিয়া প্রভুকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল। প্রভু উত্তর করিলেন, "বিষয়ীর নিকট আমি যাই না, বিষয়ীর দান আমি গ্রহণ করি না।" রাজার লোক আমার প্রভুকে জানে না। কি করিয়াই বা জানিবে? প্রভুর মত সন্ন্যাসী দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সে প্রভুকে বলিল :—

রাজদূত বলে শুন সন্ন্যাসী ঠাকুর।
কেন নাহি যাবে, পাবে সম্পত্তি প্রচুর॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥

সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় গম্ভীর, কিন্তু রাজার লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চিরসুন্দর বদনপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা উদিত হইল। উপস্থিত নরনারীবৃন্দ তাহা দর্শন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। প্রভু রাজদূতকে বলিলেন :—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন।
শুন রাজদূত ধনে নাহি প্রয়োজন॥
বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে।
কভু নাহি যাই মুঞি কি হবে বিভবে॥
বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ।
অনর্থের মূল ধন এইত বিশ্বাস॥
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্ব কথা।
বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সর্ব্বথা॥

অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে।
জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে॥

প্রভুর মুখে এই সকল তত্ত্ব কথা শুনিয়া রাজদূতের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে রাজার নিকটে যাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। তিনি রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, রাজাকে নরকের কীট বলিয়াছেন ইত্যাদি কথা অতিরঞ্জিত করিয়া রাজাকে শুনাইল। রাজা রুদ্রপতি ভগবদ্ভক্ত এবং সৎসঙ্গপ্রিয়। সাধু সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার বড় ভক্তি। তিনি দূতের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। দূতকে বিদায় দিয়া তিনি এই অপরূপ সন্ন্যাসী দর্শনে বহির্গত হইলেন। সঙ্গে হস্তী অশ্ব পদাতিক ইত্যাদি সকলে চলিল। রাজোচিত সজ্জায় তিনি নগরের মধ্য দিয়া প্রভু যে স্থানে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার আদেশে হাতী ঘোড়া লোকজন সকল দূরে রক্ষিত হইল। দুই চারিজন মর্ম্মী মন্ত্রীসহ রাজা রুদ্রপতি অতি দীনবেশে করযোড়ে প্রভুর নিকটে আসিয়া অতিশয় ভক্তিভরে প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুর অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা রুদ্রপতি আনন্দে গদ গদ হইলেন। তিনি যোড়হস্তে প্রভুকে কহিলেন :—

যোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে॥
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধম তারণ।
শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ॥

রাজা রুদ্রপতি শ্রীমদ্ভাগবতে সুপণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞানজ্ঞ শাস্ত্রবিশারদ। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিজন পণ্ডিত গিয়াছেন,—প্রভুর নিকট কিছু শিক্ষার জন্য করযোড়ে দণ্ডায়মান। প্রভু তখন রাজার প্রতি করুণা দৃষ্টি করিয়া মধুর বচনে কহিলেন :—

প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান।
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন॥
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী।
রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি॥

প্রভুর শ্রীমুখে 'রাধাকৃষ্ণ' এই দুইটী নাম আসিবামাত্র নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন। সার্দ্ধ চতুর্হস্ত পরিমিত শ্রীঅঙ্গখানি প্রেমভরে টল-টলায়মান হইল। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া, সুবলিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমুখে ঘন ঘন হরিনাম ধ্বনি করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আর সেই সোণার অঙ্গ আছাড়িয়া আছাড়িয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা রুদ্রপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি ছুটিয়া যাইয়া প্রভুকে তুলিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে রাজা রুদ্রপতির সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে পূরিত হইল। তিনিও প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারও দুই নয়নে দরদর প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ধূলায় সব্ব অঙ্গ ধূসরিত হইল। প্রভু আমার রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া রাজাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এ'স ভাই॥

রাজা রুদ্রপতিকে প্রভু আমার ভাই সম্বোধনে কৃতার্থ করিলেন। তিনি রাজাকে কি বলিলেন, তাঁহার চিরভৃত্য গোবিন্দদাসের মুখে শুনুন :—

হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়া'ল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয়॥

প্রভুর কথা শুনিয়া রাজা রুদ্রপতির বড় লজ্জা হইল। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। প্রভুর সেবায় লোকজন রাখিয়া গেলেন। নানাবিধ ফলমূল ইত্যাদি প্রভুর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কত লোকে কত প্রকার আহার্য্য বস্তু আনিয়া যোগাইল। প্রভুর আমার সে দিকে দৃষ্টিও নাই, তিনি ভালমন্দ কিছুই বলেন না :—

যার যাহা ইচ্ছা হয় আনিয়া যোগায়।
ভালমন্দ কিছু নাহি কহে গোরারায়॥

ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য মধ্যে রামগিরি নামে পর্ব্বতের উপরিভাগে, একটী সুরম্য স্থান আছে। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র জানকীসহ এখানে তিনদিন বাস করিয়াছিলেন

এ স্থানের মহিমা অতি আশ্চর্য্য। প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ স্বচক্ষে এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন :—

পর্ব্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর।
ঝরণার জল চলে অতি মনোহর॥
বড় বড় নিম্ববৃক্ষ চারিদিকে হয়।
আশ্চর্য্য তাহার শোভা কহনে না যায়॥
রামগিরি নাম গিরি আছে সেই থানে।
আশ্চর্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে॥

প্রভু আমার সেই পুণ্যস্থান দর্শন করিতে পর্ব্বতে উঠিলেন। সঙ্গে শত শত লোক চলিল। পর্ব্বতের উপর বিস্তীর্ণ বন। একপক্ষকাল প্রভু আমার সেই রামগিরিতে বাস করিলেন। এইরূপে ত্রিবাঙ্কুর দেশের রাজা রুদ্রপতিকে কৃপা করিয়া প্রভু আমার সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজা বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন। প্রভু আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

তাৎকালিক বড় বড় রাজা মহারাজদিগকে প্রভু কিরূপে আত্মসাৎ করিতেন তাহা রাজা রুদ্রপতির কার্য্যে বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে প্রভুর কীর্ত্তিগুলির স্মৃতিচিহ্ন সেই সেই স্থানে কিরূপে তৎকালে সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ কেহ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন নাই। দেশীয় নরপতিগণ অবশ্যই কোন না কোন কার্য্যে তাহাদের রাজ্যে প্রভুর শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম দক্ষিণ দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখনও অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। প্রভু আমার বরোদারাজ্যেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানকার রাজাও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব। *

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।
শ্রীবৃন্দাবন কেশীঘাট।

* এই যে প্রভুর বিবরণ সংগ্রহের কথা হইল, ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি"র ন্যায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর' একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া অচিরেই উহা প্রারম্ভ হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁরা মহাপ্রভুর চরণে মাথা বেঁচিয়াছেন, সেই সকল বিশ্বস্ত গৌরপরিকরের হস্তে এই অনুসন্ধান ভার অর্পণ করিতে হইবে। নতুবা সত্য নিষ্কাশন হইবে না।

আঃ সং

গীত।

—:*:—

যত দূরে থাকিনা কেন
পড়িয়া আছি চরণ তলে,
যত তাপে তাপি না কেন
ডুবিয়া আছি করুণা জলে।
গগন হ'তে উচ্চ তুমি
আমি ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে,
রেণুর রেণু নই হে নাথ!
ক্ষুদ্র বিন্দু সিন্ধুজলে।
সর্ব্বজ্ঞান অতীত তুমি
ব্যাপ্ত সদা জলে স্থলে
ক্ষুদ্র শিশু শু'য়ে আমি
তোমারি অই বিরাট কোলে।
বাঁচালে বাঁচি মড়ালে মড়ি
তারে যেমন পুতুল খেলে
কিঙ্কর কয় ধরতে তোমা
না পারিনু মায়ায় ভু'লে।

শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কাব্যকণ্ঠ
দেপুড় বর্দ্ধমান।

গুরু শিষ্য সংবাদ।

———০:*:০———

শিষ্য শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হওত যুক্তকরে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনিন্দ্য বদনকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। গুরু ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ; এই অবস্থায় ভাবের প্রাবল্যে কখন কখন কমলনয়ন হইতে প্রবলবেগে অশ্রু বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থল ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া ধরাতল সিক্ত করিতেছে। কখন বা আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। শিষ্য অনিমেষনয়নে সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন।' কিছুক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে গুরুদেব চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়শিষ্য হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য সজলনয়নে ভক্তিগদগদভাবে তাঁহার প্রশান্ত বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন।

গুরু। (সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন) গোবিন্দ, কতক্ষণ?

শিষ্য। (পুনঃ প্রণত হইয়া বলিলেন) অল্পক্ষণই, সম্ভবতঃ অর্দ্ধঘণ্টা হইবে।

গুরু। শারীরিক কুশল ত? বাড়ীর সকলে ভাল আছেন?

শিষ্য। আপনার শ্রীচরণকৃপায় সমস্তই মঙ্গল।

গুরু। বেশ বেশ, এখন অসময়ে কি মনে করিয়া?

শিষ্য। একটী বিষয় জানিবার জন্য আসিয়াছি, যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে নিবেদন করি।

গুরু। বেশ কথা। একবার বাড়ীর ভিতর যাও, হাতমুখ ধুইয়া কিছু জল খাইয়া শরীর সুস্থ করিয়া আইস। শরীরের সহিত মনের বড় নিকট সম্বন্ধ। কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইলে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শরীর মন বেশ সুস্থ রাখা চাই, তাহা না হইলে সকল কথা মনেও থাকে না এবং বেশীক্ষণ চিন্তা করাও যায় না। যাও শীঘ্র শীঘ্র হাতমুখ ধুইয়া একটু জল খাইয়া আইস পরে সকল কথা হইবে।

শিষ্য গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়া কিছু জলযোগ করিয়া আসিলেন ও বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, আজকাল প্রায় সকলেরই মুখে "ধর্ম্মসমন্বয়" বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, তাহা কিরূপ? চিন্তা করিয়া দেখিলে কোন ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের যে মিল আছে এমন বুঝা

যায় না, তবে ধর্ম্মসমন্বয় কিরূপে হইবে? অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সংশয় অপনোদন করুন।

গুরু। জিজ্ঞাসা করি তুমি বলিতে পার কি ঈশ্বর কয়জন?

শিষ্য। আপনার শ্রীমুখেই শুনিয়াছি শ্রীভগবান এক অদ্বিতীয়, কার্য্যবিশেষে নানা রূপ ধারণ করিয়া জীবের হিতের জন্য জগতে প্রকাশমান হন।

গুরু। ঠিকই বলিয়াছ, বেদধর্ম্ম শাস্ত্রের আদি এবং বেদবাক্যই প্রামাণ্য। বেদ বলিতেছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সুতরাং শ্রীভগবান এক ভিন্ন বহু নহেন। মানুষ আকারে এক হইলেও প্রকৃতিগত সকলেই পৃথক। আপন আপন রুচি অনুসারে সকলেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীভববানও বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং," কাজেই সাধকের প্রকৃতি বা ভাবানুযায়ী শ্রীভগবানকেও বহুরূপ ধারণ করিতে হয়। ভক্তের অনুরোধেই তাঁর বহুত্ব সাধিত হয়। তবে যে যে ভাবেই পূজার্চ্চনা করুন না কেন, সকলেই কিন্তু এক শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, শাক্ত শৈব গাণপত্য সৌর বৈষ্ণবই বল, যিনি যে নামে যে ভাবে যাঁহাকেই অর্চ্চনা করুন, উদ্দেশ্য সেই একই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা, ভাব বহু হইলেও উদ্দেশ্য একই আছে। তোমার পিতা তোমাকে গোবিন্দ, তোমার মাতা তোমাকে 'ননী,' দাদা মহাশয় 'ক্ষেপা,' অন্যে হরবাবু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, তোমার নাম বহু ও পরিচ্ছদাদিতে রূপ বহু হইলেও তুমি কিন্তু এক ভিন্ন বহু নহ; যেমন সকল নামই তোমার এবং সকল রূপের মধ্যেই তুমি, সেইরূপ শ্রীভগবানও সাধকের বাসনানুযায়ী কালী কৃষ্ণ শিব রাম আল্লা যিশু ইত্যাদি বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে যে নামে, যে ভাবে ডাকেন, তিনি তাহার নিকট সেই নামে সেই ভাবেই প্রকট হয়েন। ভগবদুদ্দেশ্যে সকল সাধনাতেই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, তবে ভাবের তারতম্য আছে, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

শিষ্য। প্রভু, যদি সকলেরই উদ্দেশ্য এক শ্রীভগবানকে পাওয়া, তবে পরস্পর এত বিরোধ দেখা যায় কেন? খৃষ্টানগণের উপদেশমত জানা যায় সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, এক খৃষ্টধর্ম্মই সত্য, আর এ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কেহই নিস্তার পাইবে না। তাহারা যখন অন্য কোন ধর্ম্মই বিশ্বাস করেন না, তখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ঘৃণা করেন সে বিষয় বলাই বাহুল্য। মুসলমানগণেরও সেই কথা, তাহারা অন্যধর্ম্মীকে 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্ম্মী আখ্যা দিয়া থাকেন। মুসলমান ও খৃষ্টানগণের সহিত হিন্দুর এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে; কারণ তাহারা সমাজগত,

আচারগত, ধর্ম্মগত সকল বিষয়েই আমাদের সঙ্গে ভিন্ন, কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-সমাজের মধ্যে যাহাদের সহিত আহার ব্যবহার, আদান প্রদান সকলই হইতেছে তাহাদের সঙ্গেই আমাদের পরস্পর ধর্ম্মবিরোধ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন।

গুরু। আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি মানুষ সাধারণতঃ আকারে এক হইলেও সকলের প্রকৃতি এক নহে। প্রকৃতি অনুসারেই রুচির তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ মদ্য, কেহ মাংস, কেহ পর্য্যুসিত, কেহ ঝাল ক্ষার, কেহ শাকসবিজা, কেহ ঘৃত, দুগ্ধ ছানা মাখন, কেহ কেহ বা মিষ্টদ্রব্যই অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করেন। সকলদ্রব্যই সগুণ, তন্মধ্যে কতকগুলিতে তমের আধিক্য, কতকগুলিতে রজ ও কতকগুলিতে সত্ত্বগুণ প্রধান ভাবে দৃষ্ট হয়। যিনি যে প্রকৃতিগত অর্থাৎ যাহার যে গুণ অধিক তাহার তদনুযায়ী দ্রব্যই অধিক প্রীতিকর বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের দ্বেষ্য প্রিয়তা নাই, তাঁহার নিকট সকলই সমান। কাজেই কোন আচারেই তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হয় না।

শিষ্য। প্রভু, একটু বিশদভাবে বলুন, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। শ্রীভগবানের একটী প্রধান কার্য্য তিনি সকল জীবকেই নিয়ত আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। এই আকর্ষণ জন্য তাঁহাতে দুইটী ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, একটী ঐশ্বর্য্য অপরটী মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লইয়াই তিনি জীবের কাছে প্রকট হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতকার তাঁহার রূপের এইরূপ ব্যাখ্য করিয়াছেন:—

পুরুষ যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বিষয় এখন থা'ক্, ঐশ্বর্য্যের বিষয় লইয়া কিছু চিন্তা করি এস। মনে কর আমি একজন বিশিষ্ট বলবান ও সাহসিক পুরুষ, বলদর্পে ও সাহসিকতায় আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না; যদি আমাকে আকর্ষণ অর্থাৎ বশীভূত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাপেক্ষা অধিক বলশালী ও সাহসিকের প্রয়োজন হইবে, যে আমাকে সকল বিষয়েই পরাস্ত করিতে পারিবে সেই আমাকে বশীভূত করিবে, আমাকে বশীভূত করা শান্তপ্রকৃতি মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন লোকের কর্ম্ম নহে।

একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলিতেছি শুন। যখন শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যগণ অত্যন্ত বলদর্পে দর্পিত হইয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়,

তখন তাহাদিগকে বশে আনিবার জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী পরমা সুন্দরীবেশে হিমাচলশিখরে যথায় দৈত্যগণ সহজে তাহাকে দেখিতে পায় এমত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুম্ভদৈত্যের কোন এক দূতের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, দূত অনেক উপদেশপূর্ণ মধুর কথায় দৈত্যগৃহে যাইয়া দৈত্য রাজের অঙ্কলক্ষ্মী হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। সেই সময় মহামায়া দূতকে বলিয়াছিলেন—"হে দূত! তুমি যাহা বলিতেছ সকলই সত্য, কিন্তু কি করিব আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে তাহা ভঙ্গ করিতে পারি না। সে প্রতিজ্ঞা এই:—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

"হে দূত! তোমাদের দৈত্যরাজ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে যাইয়া সংবাদ দাও, তিনি আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া আমার দর্প চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আমাকে তাহার অঙ্কশায়িনী করুন।" পরে মহামায়ার সহিত শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং মহামায়ার হস্তে সমস্ত দৈত্য বিনষ্ট হয়।

শিষ্য। গুরুদেব, ইহাতে আর বশীভূত করা কৈ হইল? দৈত্যরাজ প্রাণ দিল তথাপি বশীভূত হইল না।

গুরু। শ্রীভগবানের আদ্যাশক্তি মহামায়ার অসুরবধ কার্য্য নহে। তাঁহার কটাক্ষে ঐরূপ শত শত শুম্ভদৈত্যের সৃষ্টি ও নাশ হইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে উদ্ধার অর্থাৎ সদ্গতি দিয়া আত্মপক্ষে আকর্ষণ মানসে স্বহস্তেই তাহাদের তম রজ গুণ বিশিষ্ট দৈত্যদেহের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তাই দেবতাগণ মহামায়ার কার্য্য দেখিয়া গাহিয়াছিলেন:—

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।

তম রজ গুণ বিশিষ্ট লোক আপন গুণানুযায়ী প্রার্থনা করে। তুমি যদি কুস্তিগির পালোয়ান হও, আর যদি ২।৪ জন চাকর বরকন্দাজ রাখার প্রয়োজন হয়, তুমি কখনই দুর্ব্বলকে চাকরি দিবে না, তোমার প্রকৃত বলবান পালোয়ানই খুজিবে। সেইরূপ সাধক সে প্রকৃতির মানুষ সেই প্রকৃতির দেবতারই প্রার্থনা বা ভজনা করিয়া থাকেন। জগতে সকলের প্রকৃতি এক নহে, সেই জন্য ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কৃপাময় শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হইয়া বহুরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান এক অদ্বিতীয়, বহুরূপ ধারণ করিলেও স্বরূপে

এক। যেমন খাদ্য বহু ক্ষুধা এক, পথ বহু গন্তব্য স্থান এক, সেইরূপ শ্রীভগবানের রূপ বহু হইলেও শ্রীভগবান এক। নানা ভাবে নানা রূপের সাধন করিলেও চরমে সেই এক শ্রীভগবানকে পাইয়া জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভু, সকল সাধনাতেই একটা সাধ্যসাধন নির্ণয় আছে, এই সমন্বয় ধর্ম্মের মধ্যে সাধনাপ্রণালী কিরূপ, অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

গুরু। এই সমন্বয় ধর্ম্ম অতি উচ্চ, পরম ভাগবত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।

শিষ্য। প্রভু, বুঝিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ক্ষমা, দয়া, আর্জ্জব, সন্তোষ, অহিংসা প্রভৃতি। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের ত সে-ভাব দেখি না। তাঁহাদের মধ্যে হিংসার ভাবই অধিক দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কি করিয়া হইতে পারে? আমি মূর্খ, কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

গুরু। গোবিন্দ, তোমার ভুল হইতেছে, তুমি আচারকে ধর্ম্ম বলিতেছ, বাস্তবিক আচার ধর্ম্ম নহে, তবে ধর্ম্মের অনুকূল বটে। একদিন শ্রীশ্রীপরমহংস দেব বলিয়াছিলেন সকল ধর্ম্মই ভাল অর্থাৎ ধর্ম্মের সকল পথই ভাল, যদি ঠিক ঠিক হয়। কেহ সদর দেউড়ি দিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতেছে, কেহ খিড়কী দিয়া, কেহ বা পায়খানার পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ঐ পথের ব্যতিক্রমে বাড়ীর মধ্যে যাওয়া কাহাকেও আটকাইল না, সকলেই বাড়ীর মধ্যে গেল।

শিষ্য। প্রভু কেহ মদ্য মাংস দিয়া ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের ভজনা করিল, আর কেহ বা সাত্ত্বিকভাবে গলিত পত্র ভোজন করিয়া নিষ্কামে মাধুর্য্যময় ভগবানের ভজনা করিল, উভয়ের গতি এক হইবে কি প্রকারে?

গুরু। মনে কর তোমার একটী অনুগত কুকুর আছে। ছোট হইতে তাহাকে হাতে করিয়া খাওয়াইয়া বড় করিয়াছ। সে তোমাকে বেশ চিনে, তোমার গলার আওয়াজ সে বুঝে, তোমার গায়ের গন্ধ তাহার জ্ঞান আছে। একদিন যদি বাঘের চামড়া গায় দিয়া তুমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন সে কি করিবে? তোমার রূপান্তর দর্শনে সে চীৎকার করিবে না কি? অবশ্যই করিবে। কারণ তখন তুমি অন্যরূপের মধ্যে থাকায় তাহার ঐ ভ্রম জন্মিতেই পারে। আবার তখন যদি তুমি তাহাকে ডাক বা কোনরূপ কথা কহ, তোমার কথা শুনিয়া সে নিশ্চয়ই তোমার রূপ ছাড়িয়া মুখের দিকে অর্থাৎ স্বরূপের দিকে চাহিবে ও আপন প্রভু জ্ঞানে তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইতে থাকিবে। জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস। শ্রীভগবান যেরূপেই দর্শন দেন না কেন, তাঁহার সাড়া পাইলেই জীব তাঁহার রূপের দিক ছাড়িয়া স্বরূপের দিকে

তাকায়, আর তাহার পূর্ব্বস্মৃতি তাহার প্রভুকে চিনাইয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত রূপের মধ্য হইতে সাড়া না পায় সেই পর্য্যন্তই চেঁচাচেঁচি, ঝগড়াঝাটি; একবার সাড়া পাইয়া আপন প্রভু চিনিয়া লইতে পারিলে তখন আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। তখন তাহার আচার বা রূপে মন থাকে না, সর্ব্বদাই স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। সেই অবস্থার সাধকের পক্ষেই সমন্বয় ধর্ম্ম, নচেৎ সকল সম্প্রদায় এক জায়গায় বসিয়া আহার করিলে বা এক জায়গায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান সমবেত হইয়া ভজন করিলেও সমন্বয় ধর্ম্ম হয় না। সুতরাং সমন্বয় ধর্ম্ম অতি উচ্চাধিকারীর জন্যই ব্যবস্থিত।

তুমি ইতিপূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছ সকল ধর্ম্মসাধনার মধ্যেই একটা সাধ্যসাধন নিহিত আছে, সমন্বয় ধর্ম্মের সাধ্যসাধন কি?

জীব যেকাল পর্য্যন্ত সমন্বয় ধর্ম্মের অধিকারী না হয় সেকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তির আশা নাই। সমন্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সহজ কথায় বুঝাইয়াছেন—"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবই আমার এলোকেশী।" আর জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য ষোল নাম বত্রিশাক্ষর জপের বিধান দিয়া এই সমন্বয় ধর্ম্ম সাধনের সহজ ব্যবস্থা ক'রয়া গিয়াছেন। এই সমন্বয় ধর্ম্মের সাধন ষোল নাম বত্রিশাক্ষর জপ এবং সাধ্য ষোল নাম বত্রিশাক্ষর প্রতিপাদ্য শ্রীভগবান। (ক্রমশঃ)

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।
মাহিগঞ্জ।

রজ।

—:*:—

এই সেই রজ ওগো, এই সেই রজ,
জিনি রক্ত শতদল
সুকোমল সুশীতল
যাহে বিরহিত কানু চরণ পঙ্কজ।
এই সেই রজ ওগো, এই সেই রজ,
যথায় দিবস নিশি
খেলিত সে ব্রজশশী
যাঁর পদরজ কণা বাঞ্ছে ভব অজ।

এই সেই ব্রজ ওগো, এই সেই ব্রজ,
মহাভাবময়ী রাধা
শ্রীনন্দ দুলাল আধা
যাহে বিলসিত রাই শ্রীপদ সরোজ
এই সেই ব্রজ ওগো, এই সেই ব্রজ,
বিহরিত যশোমতী
বিব হত ব্রজ-পতি
বিহরিত গোপীকুল গোপালক ব্রজ।
এই সেই ব্রজ ওগো, এই সেই ব্রজ,
যার তরে দিবানিশি
কাঁদিতে লো কৃষ্ণদাস।
বড় ভাগ্যে মিলিয়াছে, প্রাণ দিয়ে ভজ
অপ্রাকৃত আনন্দের বৃন্দাবন ব্রজ

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।
শ্রীবৃন্দাবন কেশীঘাট।

মাতৃসেবা।

—:*:—

মা জীব-জগতের এক অপূর্ব বস্তু। মা ভিন্ন মা'র তুলনা নাই। মা'র তুলনা মা। মা শব্দের মাধুর্য্য মানুষের ভাষায় বর্ণন করা যায় না। নববাঙ্গোর কত কোটি কোটি লেখনী কত অনন্তকাল হইতে মা শব্দের মাধুর্য্য বর্ণনে ব্যাপৃত আছে কিন্তু এই অমৃতসিন্ধুর কুলকিনারা পাইতেছে না

কত অমৃতসার দিয়াই মা এই মধুরাদপি সুমধুর শব্দটী গঠিত হইয়াছিল। সংসারের কত মধুই আছে কিন্তু এমন মধু কোথায়? যেমন মধু মা। মা সরস্বতীর শব্দভাণ্ডার খুঁজিয়া এমন শব্দ পাওয়া যাইবে কি? যেমন শব্দটী মা।

মা শব্দের ভিতর প্রেম, ভক্তি, দৈন্য বিনয়, শান্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির মধুর ভাবসকলের অনাবিল মৃদুতরঙ্গ সর্ব্বদা বিরাজিত। মা শব্দ উচ্চারণ করিতেই হৃদয়ের পরতে পরতে স্নেহমমতার উজ্জ্বলালোক আসিয়া সন্তানকে আনন্দোদ্ভাসিত করিয়া তুলে। আহা, কি সুন্দর প্রাণভরা ডাকটী মা। মা বলিয়া ডাকিতেই যেন আমরা এক পরম প্রীতিপদ শান্তির শীতল ছায়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ি।

ভাই পাঠক! তুমি কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া, কি শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া বা রোগভোগে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যদি ডাক মা, তবে অমনি তোমার সারা অঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। "মা ব'লে ডাকিলে জুড়ায় দেহ।" এই জন্যই তো আমরা আর্ত্তজগতে সতত "মা, মাগো, ওমা" ধ্বনি শুনিতে পাই। মাতৃসম্বোধনের মধুরতায় ও শান্তিদায়িনী শক্তিতে রুগ্ন বিপন্ন আর্ত্ত ও অন্নক্লিষ্ট জীব ঈশ্বর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া অবিরাম "মা, মাগো, ওমা" ডাকিতে থাকে।

সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী পরাপ্রকৃতি মাতৃদেবীর স্নেহমমতাপূর্ণ হৃদয়ের ভাব যে জীব-জগতের কত কল্যাণপ্রদ তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময় বোধ হয়। জানি না—বিশ্বস্রষ্টা ভগবান কোন উপাদানে কত বাৎসল্যের সারাংশ দিয়া মাতৃহৃদয় সংগঠন করিয়াছিলেন! স্নেহমমতাপূর্ণ মাতৃহৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতের আধার। মাতৃ-হৃদয়ের করুণামৃত পানে সন্তপ্ত জীব-জগৎ সর্ব্বদা সংতৃপ্ত।

পরাপ্রকৃতির প্রকটপ্রতিমা মাকে দেখিলে প্রাণের ভিতর কেমন একরকম শান্তি সংমিশ্র অভয়ানন্দের প্রবাহ ছুটে! জীব-জগৎ সর্ব্বদা মাতৃস্নেহ লাভে কৃতার্থ ও লালিত পালিত হইতেছে।

করুণাময় ভগবান যদি মাতৃহৃদয়ে এই অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডার খুলিয়া না রাখিতেন, তবে না জানি জীব-জগতের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত! মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, উহা নির্ভেজ খাঁটি—স্বার্থ গন্ধ শূন্য।

মাতৃস্নেহের একটানা স্রোত অনবরতই সন্তানের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্তান অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক সময় তাহা বুঝিতে পারে না। আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর নিকট সন্তান কালো কুৎসিত খোড়া কালা অন্ধ হইলেও সোণার চাঁদ। মা'র স্নেহের চ'ক্ষে সন্তান বড় সুন্দর দেখায়।

মা আপন কুৎসিত সন্তানটীকে দিয়া অন্যের সুশ্রী সন্তানটীকে পাইতে ইচ্ছা করেন না। মাকে এইরূপ বিনিময়ের কথা কহিলে তিনি কিছুতেই একথায় সম্মতা হইবেন না। আর কোন বিশেষ কারণে হইলেও তাঁহার প্রাণ তাঁহার সেই কুৎসিত পুত্রের জন্যই ছটফট করিতে থাকিবে।

মা সন্তানকে বুকের ধন প্রাণাপেক্ষাও বেশী মনে করেন। সন্তানের কোন-রূপ পীড়া বা সঙ্কট উপস্থিত হইলে স্নেহময়ী জননীর আর দুঃখ দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

আহা, করুণাময়ী মা কতকষ্টে সন্তানকে লালনপালন করেন। সন্তানের মলমূত্রে কি মুখের লালায় মায়ের কোন ঘৃণার উদ্রেক হয় না। সন্তানের একটু

অসুখে মায়ের মনে বহু অসুখের সৃষ্টি করে। সন্তানের প্রতি সতর্ক-নয়না মাতার সর্ব্বদাই মধুর দৃষ্টি পতিত হইতেছে। সন্তানের কল্যাণকামনায় মাতা ভক্তি প্রণতচিত্তে তেত্রিশ কোটি দেবতার নিকট আঁচল পাতিয়া কৃপাভিক্ষা করিতেছেন। শিশু সন্তান হাসিলে খেলিলে, মাকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিলে মায়ের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

শিশুটী কাঁদিতেছে অন্যেরা কাঁদা নিবারণের জন্য কত কিছু করিতেছেন, একের কোল হইতে টানিয়া অন্যের কোলে লইতেছেন, নানা দ্রব্য দেখাইয়া নানা শব্দ শুনাইয়া শিশুর কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন, শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতেছেন, ভয় প্রদর্শন জন্য বুড়ী জুজু শিয়াল প্রভৃতিকে ডাকিতেছেন, কিন্তু তাহাদের সকল যত্নই বিফল হইতেছে, শিশু কিছুতেই রোদন সম্বরণ করিতেছে না; ও হরি, যেই মা আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন অমনি চুপ—তৎক্ষণাৎ কান্না নিবৃত্তি হইয়া গেল। ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও শিশু মাতৃ-অঙ্কের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারে।

ভাই পাঠক! মা'র বুকখানা সন্তানের পক্ষে কত মধুময় তা তুমি নির্ণয় করিতে পার কি? তুমি স্বর্গ লইয়া মাতৃহৃদয়ের তুলনা করিতে চাহিলে তোমাকে আমি পাগল মনে করিব।

মাতৃক্রোড়স্থ শিশু এক মহাসম্রাট্। মাতৃক্রোড় নিরাপদের উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণার কোন অধিকার নাই।

মাতৃমূর্ত্তি কত সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে গঠিত তা কে বলিবে? তোমার হৃদয় পাষাণ হউক না কেন, তুমি একটা ক্রূর রাক্ষস হও না কেন, মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে অবশ্যই গলিয়া যাইবে, তোমার অপবিত্র হৃদয়েও ভক্তিকৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইবে। পরন্তু তুমি ক্রোধী হও, দুষ্ট হও, দুর্জ্জন হও, মাতৃস্নেহ হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। মাতৃদ্রোহি-সন্তানের জন্য মা'র কত আকুলতা! ঐ দেখ ভাই অকৃতজ্ঞ পুত্রের কল্যাণকামনায় মা বদ্ধাঞ্জলিভাবে ভগবদ্‌বিগ্রহ-সমীপে দণ্ডায়মানা। কৃপাময়ী জননীর কৃপার কথা কি কাগজে কলমে লিখিয়া শেষ করা যায়? এমন মুখ দেখিয়া দুঃখ বুঝিতে জগতে আর কে আছে ভাই?

মা তোমার মঙ্গলের জন্য কত ব্রত, কত পূজা, কত উপানসাই না করিতেছেন। মা'র মত জগতে এমন বান্ধব কে আছে ভাই?

মা আপন কদাকার পুত্রের মুখচুম্বন করিয়াও অপার্থিব সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। তুমি অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও মায়ের কাছে কঁচি খোকা।

পাঠক! আমি মায়ের কথা লিখিতে বসিয়া ম'র যে দিনের যে ব্যবহারের কথা মনে হইতেছে তাহা লিখিতেছি আর কাগজখানার উপর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। ভাই! আমি নরাধম মাতৃহীন। অনেক দিন হইল মা আমাকে এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে রাখিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু মাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না। স্মৃতির সাহায্যে সেই মায়াময়ী মা'র মনোমোহকর মূর্ত্তিখানি মানসপটে আঁকিয়া লইয়া ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় অশ্রুমোচন করি। ভাই! আমার মা নাই। আমি এই উত্তপ্ত সংসার প্রান্তরে ছায়া শূন্য হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃপদসেবা-সৌভাগ্য দু'দিনের জন্যও আমার কপালে লেখা ছিল না। হা অদৃষ্ট!

মা'র অতি বিশুদ্ধ সন্তানবাৎসল্য,—অতি বিশুদ্ধ স্নেহমমতা সততই আমার অন্তঃকরণে জাগিতেছে। মাতৃস্নেহের কথা সহস্র মুখে বলিয়াও শেষ করা যায় না।

শুনিয়াছি, একদা নিকটস্থ দুইটী বাড়ীতে দুইটী প্রসূতি এক সময়ে দুইটী সন্তান প্রসব করেন। প্রসবের অল্পদিন পর একটী সন্তান মারা যায়। ইহা অন্য কেহকে না জানাইয়া প্রসূতি সেই মৃত সন্তানটীকে মাটির তলে পোতিয়া রাখিয়া নিকটস্থ বাটীর নবজাত শিশুটীকে গোপনে চুরী করিয়া লইয়া আসে। পরে ঐ দুই মা'র মধ্যে ছে'লে লইয়া বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল, উভয়েই বলে "ও আমার ছেলে" অন্যেরা কেহই কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নবজাত কঁচি শিশু উভয় মা'র কোলেই শান্তিলাভ করে, উভয়েরই স্তন্যপান করে সুতরাং ইহাতে ছেলে কার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। অথচ অবয়ব দেখিয়াও কার ছেলে ইহা কেহ নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না।

এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইল। সাক্ষী এক সর্ব্বদর্শী ভগবান ভিন্ন আর কে? মানুষ সাক্ষীরা বলিল "এ ছেলেটী যে কার তা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কারণ দুইটী ছেলেই একমত ছিল। ছেলে দুইটী কাহারই নিকট সুন্দর মত চিহ্নিত হইতে পারে নাই।"

বিচারপতি বিচার-বিভ্রাটে পড়িয়া আজ্ঞা করিলেন "এই ছেলেটী যে কার প্রমাণাভাবে তাহা স্থির করা গেল না। অতএব আমি হুকুম করিলাম শিশুটীকে সমানাংশে কাটিয়া দুইভাগ দুইজনে লইয়া যাও।" এই বলিয়া বিচারক জল্লাদকে আজ্ঞা করিলেন "এখনই আমার সম্মুখে ছেলেটীকে দ্বিখণ্ড কর, বিবাদ মিটিয়া যাক্।"

আজ্ঞামাত্র নরঘাতক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা শিশুকে কাটিতে উদ্যত হইল। অমনি একটী মা পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বিচারপতিকে বলিতে লাগিল—, "দোহাই ধর্ম্মবতার! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি এ বালক আমার নয়, তাহার। আমার ছেলেটীকে শিয়ালে লইয়া গেলে আমি চুরী করিয়া তাহার ছেলে আনিয়া আমার বলিতেছিলাম। দোহাই ধর্ম্মাবতার ছেলে কাটিবার প্রয়োজন নাই। যার ছেলে তাহাকে দিয়া আমাকে ছেলে-চুরীর অপরাধে দণ্ডপ্রদান করুন। আমি বিনা আপত্তিতে তাহা স্বীকার করিতেছি।" এই বলিয়া সেই শোকাকুলা রমণী বিচারপতির পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল এবং অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া ঘাতকের হস্ত হইতে শিশুটীকে কাড়িয়া লইয়া প্রতিবাদিনীর কোলে তুলিয়া দিল ও বলিল "ওগো, ধর তোমার ছেলে তুমি লও,—আমাকে ক্ষমা কর।"

প্রিয় পাঠক! সুচতুর বিচারকের বিচার কৌশলে ছেলেটীর প্রকৃত মা কে চিনিয়াছেন তো? বলিহারি মাতৃস্নেহ।

পাঠক! এখন আপনাকে লইয়া নরজগত ছাড়িয়া পশুপক্ষী জগতে যাইব। সে রাজ্যে আপনি নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহ দর্শন করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না আপনি হয়তঃ মনে করিতে পারেন দেহান্তে জলপিণ্ড প্রাপ্তির আশায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় প্রতিপালিত হইবার আশায় আমাদের মা আমাদিগকে ভালবাসেন। বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। মা কখন জলপিণ্ড কি প্রতিপালনের প্রত্যাশায় সন্তানকে ভালবাসেন না, বুকের রক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন না, উহা মাতৃহৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। অনেক স্থলে দেখা যায় হস্তপদ শূন্য, বিকলাঙ্গ অন্ধ পুত্রকেও মা প্রাণপণে পালন করিতেছেন। ভবিষ্যতে গলগ্রহ ভিন্ন ঐ অবস্থার পুত্রের নিকট জলপিণ্ড কি প্রতিপালনের আশা তো করাই যায় না? তবে আর প্রত্যুপকারের কথা তুলিয়া নির্ম্মল মাতৃস্নেহের উপর কলঙ্ক-কালিমার প্রলেপ মাখা কর্ত্তব্য নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি।
সহিলপুর, ময়মনসিংহ।

বাঁশরী।

—•—

আবার কেনরে বাঁশী বাজিলি এমন?
তোর ও মধুরস্বরে
পরাণ আকুল করে
কত অতীতের কথা করায় স্মরণ।

আবার কেনরে বাঁশী থাকিয়া থাকিয়া,
সরল সুমিষ্ট তানে
মিশাইয়ে সমীরণে
কর মত্ত নীলাকাশ গাহিয়া গাহিয়া?

আর কি তোমার বাঁশী আছে সেই সে মান?
শুনিয়া তোমার রব
আকুল গোপিনী সব
ধে'য়ে ধে'য়ে করিত সে কৃষ্ণের সন্ধান।

আর কি তোমার বাঁশী আছে সেই সে মান?
যখন ব্রজের শশী
তমাল তলায় বসি
বাজা'ত বহিত সুখে যমুনা উজান।

গিয়াছে সেদিন হায় জন্মের মতন
কোথা মাতা যশোমতী
কোথা বাই রসবতী
কোথা সেই নন্দরাজ কোথা সে গোধন?

শ্রীদাম সুদাম গেছে ব্রজ পরিহরি!
কিছু নাই কিছু নাই
স্মরিলে বেদনা পাই
স্মৃতিচিহ্ন রূপে তুমি রয়েছ বাঁশরী!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।
নাউটীয়া—ময়মনসিংহ।

চৈতন্য চন্দ্রালোক।

——:*:——

রূপ না অপরূপ ?

ওগো উহাকে যে তোমরা রূপ রূপ বলিতেছ ও যথার্থই রূপ নাকি? আমাদের ত বিশ্বাস হয় না। ও যদি রূপই হইবে তবে উহাকে দেখিয়া মানুষের এই অবস্থা ঘটে কেন? রূপ কি কেহ দেখে না? এই রূপ-রসগন্ধ-পূর্ণ পৃথিবীতে রূপের কি কিছু অভাব আছে? জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্রই ত রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে। রূপবিশেষে মনোহারিত্ব গুণও দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু এমন করিয়া মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক আচ্ছন্ন করিতে দেখা যায় কৈ? তাই বলি উহাকে তোমরা রূপ বলিয়া বিশ্বাস করিও না।

আরও দেখ, ঘটনামূল সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া। পৃথিবীতে কত কত শিশুই জন্মগ্রহণ করিতেছে, এমন শুভমুহূর্ত্ত কয়জনে লাভ করিতে পারে? পরম মঙ্গল-প্রসূ এই নদীয়াতেও কত কত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু গোরাচাঁদের উদয়ে নদীয়া নগরী যেমন আনন্দমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তেমনটী আর চারি শত বৎসরের মধ্যে হইয়া উঠিল কৈ? অহো! 'চৈতন্য ভাগবতে' সে চিত্র কি মনোরম রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে :—

চৈতন্য অবতার শুনিয়া দেবগণ রে
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপহর দেখি শ্রীমুখচন্দ্র
আনন্দে হইল বিহ্বল রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সবেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন "হরি হরি" গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ 'হরি হরি' রে।
মানুষে দেবে মিলি এক ঠাঁই কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ-পুরী রে॥

শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্জেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহ পড়ে স্তুতি কাহারও হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে গায় রে॥

* * *

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর বিশাল রে।
বেদের অগোচর আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজে রে।
বহুত পুণ্য ভাগ্যে চৈতন্য পরকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝে রে॥
অন্যান্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহ নাহি মান রে।
নদীয়া পুরন্দর জনম উল্লাসে
আপন পর নাহি জান রে॥

ভগবানের চৈতন্যবিগ্রহ-দর্শনার্থী দেবগণ আজ সকলেই নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। নদীয়ায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ গঙ্গাস্নান যাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাস্নান ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, ভগবান গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই তাঁহারা সত্বর শচীমাতার অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে দর্শনান্তর অভিবাদন, স্তুতি স্তবন কত কি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে ছত্র চামরাদি স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যেরও সদ্ব্যবহার করিলেন। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত, অন্ধকারে কে কারে লক্ষ্য করে? গঙ্গাস্নানানন্দে ও কীর্ত্তনানন্দে সকলেই তখন আত্মহারা। শচীর আঙ্গিনায় লোক আর ধরে না! যখন ইন্দ্রালয় হইতে যন্ত্রিদল আসিয়া বিবিধ যন্ত্রযোগে অশ্রুতপূর্ব্ব

তান লয় উঠাইয়া পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলিল, তখন নদীয়াবাসী কাহারও মনে হিংসা বিদ্বেষ রহিল না। অপার্থিব সখ্যসুখে বিভোর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

এই বর্ণনাটীকে গ্রন্থ প্রণয়ের কল্পিত ছাঁদ বলিয়া কেহ মনে করিও না। যখন ইহা রচিত হয় তখন গ্রন্থ ব্যবসায় এদেশে প্রচলিত ছিল না। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পরোপকারমানসে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। তাহাতে একটু নাম কামের কথা থাকিলেও "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত" রচয়িতাকে সে কথাও লক্ষ্য করে না। বহুল সংস্কৃত চর্চ্চার যুগে প্রাকৃত ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে একটী বর্ণও সত্য অপলাপের জন্য বা সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। এই কারণ এই গ্রন্থ বৈষ্ণবজগতে বেদবৎ পূজিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা অকপট বিশ্বাস ও অকৈতব ভক্তি-সহকারে এহেন গ্রন্থবৈভব অনুশীলনে যত্নবান্ হইলাম, দীন দয়াল শচীনন্দন আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আমরা স্পষ্টতই দেখিতেছি গৌরহরির জন্মক্ষণে অনেক অলৌকিক ঘটনাই সংঘটিত হইয়াছিল। দেবতারাও দেবলোক ছাড়িয়া আসিয়া জীবলোকের সেই আনন্দোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। দেবকণ্ঠে মানবকণ্ঠে একযোগ করিয়া হরি-নামের তুমুল ধ্বনিতে আকাশ মেদিনী কম্পিত করিয়াছিলেন! কিন্তু শচী-মাতার অঙ্গনে গিয়া অলক্ষিতে ভিন্ন প্রভুচাঁদকে দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের যে ঘটিয়াছিল ইহা মনে হয় না। কারণ লোকাচার অদ্যাপিও এতদ্দেশে পুরুষদিগকে প্রসব গৃহে সদ্য প্রবেশের বিধি দেয় না। এ পক্ষে দেবস্ত্রীদিগেরই অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। যথা :—

দেবস্ত্রীরে নরস্ত্রীরে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভাল মতে॥
দেব মাতা সব্যহস্তে ধান্য দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে "চিরায়ু" বলিয়া॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ুঃ' বলিয়া হৈল হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচীদেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো মুখে নাহি আসে॥
শচীর চরণ ধূলি লয় দেবগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥

অন্যদিকে মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন গণনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সেই 'বিস্ময়' অবস্থা হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া লগ্নফল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যথা :—

লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাহা দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবান।
অল্পেই হইব সর্ব্বগুণের নিধান॥

দাদাঠাকুর এ বয়সে কত শিশুরই জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু আর কোনদিনও জাতকের লগ্নফল নির্ণয়ে তাঁহার এমন বৈচিত্র অনুভব হয় নাই। তিনি বলিবেন কি? এ যে সেই শ্রুতি-কথিত 'সত্যং শিবং সুন্দরং' আসিয়া শরীরি-বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। উহাতে কি কোন পাপস্পর্শ থাকিতে পারে? কিন্তু মানুষের মন লইয়া স্বীয় দৌহিত্রের তথাবৎ লগ্নকার্ত্তনে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। সমস্ত আবেগ জরাজীর্ণ বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া দুই চারিটী কথায় কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। কাজটা ভাল হইল না। অজ্ঞ দেবমানব যে ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক সম্মিলিত, একই উৎসাহে উৎসাহিত, একই আনন্দে আনন্দিত সে ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী। মানবের শক্তি সে স্থলে সংহৃত হইয়া আসিলেও দৈবে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। তাই দেখা যায় :—

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে মনে মন।
ইহা হইতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীত হইবে ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥
ভাগবত ধর্ম্মময় ইঁহার শরীর।
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃমাতৃ-ভক্ত ধীর ॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মত এ শিশু করিবে সর্ব্বকর্ম্ম ॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে বাখান ॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।
এ নন্দন যার তাঁরে রহুক প্রণাম ॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান।
'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইবে ইহান ॥
ইহানে বলিবে লোক নবদ্বীপচন্দ্র।
এ নন্দন জানিও কেবল পরানন্দ ॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥

এই গণৎকারটীর আর পরিচয় লইতে হয় না; স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ হইতে কত শত মহাত্মাই সেখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন, প্রভুর ভবিষ্যকর্ম্মের সূচি প্রকাশে কে যে মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলেন তা বুঝিবার হেতু কি আছে? আমরা তাহা বুঝিতেও চাই না, বুঝিতে চাই কেবল এক কথা—সেই রূপের কথা, শচীমাতার অঙ্গনে সেই যে দেবমানবে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি উপস্থিত হইয়াছিল সে কি রূপের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, না অরূপসাগরে ঝাঁপ দিবার জন্য? সে রূপ না অপরূপ?

স্নেহ-প্রতিমা।

—:*:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(২)

গোপীনাথপুরের রায়রা খুব বড় জমিদার। সুতরাং তাহাদের অসাধারণ প্রতাপ। যেরূপ ধনে মানে, সেইরূপ দান ধ্যান ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানেও তৎকালে রায়দের সুন্দর সুখ্যাতি রটিতেছিল। উমাপ্রসাদের সময়েও সেই অবস্থার কোন বহির্ভঙ্গ ঘটে নাই। নায়েব গোমস্তা, পাইক লস্কর, দাসদাসী আগেকার মত সমস্তই ছিল। দোল দুর্গোৎসব, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, অতিথিসেবা রুদ্রেশ্বরদেবের ভোগরাগ পূর্ব্বের মতই জাকজমকের সহিত নির্ব্বাহ হইতেছিল। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে উমাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তখন উমাপ্রসাদের পত্নী হরপ্রিয়া অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি ৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র হরিজীবনকে লইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে পতিত হইলেন। দেবর শিবপ্রসাদ সংসারবিরাগী। সেই স্নেহময়ী রমণী তাহাকে অনেক রকম বুঝাইয়াও যখন বিষয় আশয় সংরক্ষণে রত করিতে পারিলেন না, তখন নিজেই বহুদিনের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী গোকুলমুন্সীর সাহায্যে ষ্টেটের কার্য্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কাজ মন্দ চলিল না কিন্তু রায়দিগের সম্পত্তির পরিণাম ভগবান্ অন্যরকম নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া দুই মাস পর রামজীবনকে প্রসব করিয়া হরপ্রিয়াও এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার হইতে যাত্রা করিলেন। হঠাৎ এই শোকাবহ ঘটনায় গোপীনাথপুরের আপামর সকলেই অত্যন্ত দুঃখানুভব করিল। হরপ্রিয়ার হৃদয়খানি দয়াদাক্ষিণ্যের আধার ছিল। গোপীনাথপুরের দরিদ্র, দুঃখী কাঙ্গালীরা হরপ্রিয়াকে মায়ের মতন দেখিত। বিপদে আপদে তাহারা হরপ্রিয়ার কাছে গিয়া অন্তরের গ্লানি জুড়াইয়া আসিত। যেন স্নেহাঞ্চলখানি দুলাইয়া হরপ্রিয়া তাহাদের প্রাণে শান্তির হিল্লোল বহাইয়া দিত। সেই হরপ্রিয়া তাহাদিগকে আজ ফাকি দিয়া চলিয়া গেল। সত্যসত্যই গোপীনাথপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা আজ হরপ্রিয়ার শোকে উন্মত্ত। কৃষকেরা হাল চষে না, ধীবরেরা জলে নাবে না, ঐ রূপ কামার কুমার ধোবা ছুতার সকলেই আপন আপন বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্নমুখে বসিয়া আছে। যেন গোপীনাথপুরের শ্রীই আজ বদলিয়া গিয়াছে।

শিবপ্রসাদ হরপ্রিয়াকে সৎকার করিয়া যখন রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে ফিরিয়াছেন, তখন সন্ধ্যার কালোছায়া পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। পাখীরা দ্রুত পক্ষ বিস্তার করিয়া সরবে আপন আপন কুলায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে একশত আষ্টটী দীপাধারে মনোজ্ঞ দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ধূপ গুগ্‌গুলের ধুঁয়ার গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। শিবপ্রসাদের অশৌচ, রুদ্রেশ্বরের সান্ধ্য আরতি আজ সেই বৃদ্ধ পূজারীকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। জনৈক শিব-ভৃত্য তাহাকে ডাকিতে গিয়াছে। এইজন্য আরতির শঙ্খ কাঁসর এখনও বাজিতেছে না। অন্যান্য দিনের মত আজ তত জন সমাগমও হইতেছে না। যে দুই চারিজন আসিয়াছে তাহাদেরও আজ স্ফূর্ত্তি উদ্যম কিছুই দেখা যাইতেছে না। হরপ্রিয়ার বিয়োগ-ব্যথায় সকলেই আড়ষ্টভাবে কালযাপন করিতেছে। শিবপ্রসাদ সেই মন্দিরসংলগ্ন, সম্মুখের একটা পাকা পোস্তায় বসিয়া অনবরত 'শিব শিব' বলিতেছেন। তাহারই পদতলে নীচের একটা সিড়িতে বসিয়া মন্দিররক্ষক শিবরতন চৌবে সুদীর্ঘ এক যষ্টি ঘুরাইয়া ভাঙ্‌ ঘুটিতেছে, আর তার বরাবরের অভ্যস্তসুরে "গৌরীশঙ্কর সীতারাম" "সাধু গুরুজী সীতারাম" বুলী আওড়াইতেছে। এই সময় দূরশ্রুত বীণাধ্বনিবৎ একটী সুমিষ্ট ধ্বনি কোথা হইতে আসিতে লাগিল। না—সে ধ্বনি যতই নিকট হইতে লাগিল, ততই সকলের আত্মবিস্মৃতি জন্মাইতে লাগিল। এইবার স্পষ্টই শুনা যাইতে লাগিল। অপ্সরকণ্ঠে কে যেন গাইতেছে :—

প্রভুমীশমনীশ মশেষগুণং,
গুণহীনমহীশ-গণাভরণং।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌॥
গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং,
তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্‌।
বিধি-বিষ্ণু-শিরঃ-স্তুত-পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌॥
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং,
কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্‌।
সুরশৈবালিনীকৃত-জূটপটং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্‌॥

নয়ন-ত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং,
মুখপদ্মবিরাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
বৃষরাজনিকেতন-মাদিগুরুং,
গরলাশনমাজি-বিষাণধরম্।
প্রমথাধিপ-সেবকরঞ্জনকং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
মকরধ্বজ-মত্তমতঙ্গ-হরং,
করিচর্ম্মসনাগ-বিরোধধরম্।
বরদাভয়-শূলবিষাণধরং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং,
করুণয়ৈব পুনস্ত্রি-রূপধরম্।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈক-গতিং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।
ন দেয়ং পুষ্পং সদা পাপচিত্তৈঃ,
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো!
ভজতোঽখিলদুঃখ-সমূহহরং,
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।

কি যেন দেবমায়ায় অভিভূত হইয়া সকলেই আত্মসাড়া ভুলিয়া গিয়াছে। শ্রবণশক্তি ছাড়া আর তাহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কতক্ষণ যে অতিবাহিত হইল, তা কিছু নিশ্চয় নাই, যখন গীত থামিল, তখন সকলেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। তাহারা স্পষ্টই দেখিল এক জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি রুদ্রেশ্বরের পুরোভাগে অর্থাৎ সদর দরজার মধ্যভাগে শোভা পাইতেছে। এত রূপ মানুষের হয় না। শরীরে যেন চন্দ্রকিরণ ঝলসিতেছে। সকলেই বিস্ময়াকুল-লোচনে সেই দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিয়া আছে। তখন আবার বীণাবিনিন্দিত-কণ্ঠে এই কয়টী কথা উচ্চরিত হইল "শিবপ্রসাদ! অদ্ধরাত্রে হরপ্রিয়ার শ্মশানে সন্ধান লইও, শান্তি মিলিবে।" এই প্রত্যাদেশ জ্ঞাপন করিয়া, সেই রমণীমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিল। (ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব চন্দ্রগ্রহণ।

——:*:——

তড়িত গিলিল মেঘে।

সোহাগে গলিত তপত কাঞ্চন
কিবা মরকত রাগে ॥
রাধা-কৃষ্ণচাঁদে পূরণ গ্রাসিল
বরণ ফিরিল চাঁদে।
এ চাঁদেব গ্রাসে আঁধার না হয়
আলোক দ্বিগুণ ছাঁদে ॥

চিনাব কি চিন থুল ?—
ধরা যায় তারে, নয়নে নিশান৷
চিনিতে আর কি র'ল ?—

চাচরচিকুব শোভা।
বর্ণচোরা চাঁদে জড়িত জলদ
খুলিছে কত বা প্রভা।

তানয়, তনয় শুধু।
অরুণ পদতলে বজব-কুম্বাদি ঝলে
কমলদলাগ্রে বিধু ॥
চাঁদেরে ঢাকিয়া চাদের তরঙ্গ
ছড়াল ভাবের তনু।
রাধা-অঙ্গ মাখি কৃষ্ণ গোরা হল
কি কাজ ধরিবা বেণু ॥
কালীহর বলে যাঁর লাগি বাঁশী
সদা "বাধা রাধা" গায়।
তারে যদি মিলে, আর কেন বাঁশী
সিদ্ধিতে সাধন (বাঞ্ছাত্রয়) যায় ॥

শ্রীকালীহর দাস বসু।
বিলনীয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

শ্রীশ্রীহরিনামে প্রেম।

——:০:——

(কলিযুগে ধর্ম্ম)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ বৃহন্নারদীয়ং

এই কলিকালে শ্রীশ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ভিন্ন জীবের নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই। সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা জীব ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি দ্বারা জীব ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতিরেকে, জীবের নিস্তারের আর উপায় নাই। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

কলিকালের নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
তাঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্তি একবার ॥

এই কলিকালে যোগ জ্ঞান তপ-আদি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কেন না কলির জীব অল্লায়ু দুর্ব্বল ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি তাপত্রয়ে সদা সর্ব্বদার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এতাবদবস্থায় ঐ সকল কঠিন কর্ম্মাদি করিবার শক্তি নাই। সুতরাং কলিযুগধর্ম্ম শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলির জীব-নিস্তারের একমাত্র উপায়। আজ এই কলির জীবগণের কি দুর্দ্দশা? কালের প্রবলস্রোতে জীব যে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমিও ঘোর অপরাধী তমসাচ্ছন্ন একটী কলির জীব। কালের প্রবলস্রোতে পতিত হইয়া আজ আমার কি অবস্থা। আজ কি না আমি সদা সর্ব্বদা বিষয় মদে মত্ত হইয়া আমার আমার চিন্তাতেই

বিভোর। তিলার্দ্ধের জন্যও সেই জীবনসর্ব্বস্ব ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা কি তাঁহার মধুমাখা নাম করিব এমন অবসর নাই এবং শক্তিও নাই। স্বীয় কর্ম্মদোষে সবই হারা হইয়াছি। এবার এমন দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়া জীবনটাকে বৃথা অতিবাহিত করিলাম। শুধু জীবন অতিবাহিত কেন, সঙ্গে সঙ্গে নরকে যাইবার পথও পরিষ্কার করিয়া তুলিলাম। ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কেন না আমি যে কৃষ্ণদাস—সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। ভুলিয়া ঘোর মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। মায়ার বশীভূত হইয়া কতই যে কি করিতেছি তাহার সীমা নাই। সে আমাকে যে ভাবে নাচাইতেছে, আমিও সেই ভাবেই নাচিতেছি। কিন্তু তাহাতে যে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা একটুও ভাবিতেছি না। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে যে আমাকে সদা সর্ব্বদার তরে জ্বারিয়া মারিতেছে তাহা বিন্দুমাত্রও বোধ নাই। সে যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলিয়া মনে করিতেছি না। কিন্তু যদি একটু বিচার করিবার শক্তি থাকিত, অথবা বিচার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তখনই যন্ত্রণায় ছট্‌ফটী উঠিয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা নিবারণের চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু হায়, দুর্দ্দৈবদোষে তাহাও ঘটিল না। যদি একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে জানা যায় যে এই মায়াকর্ত্তৃক যে যন্ত্রণা সেও আমাদের মঙ্গলের জন্যই; কেন না, দয়ার সাগর ভগবান্ বলিতেছেন যে, জীব আমাকে একেবারেই বিস্মৃতি হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নানা প্রকার যন্ত্রণাদিতে অসহ্য হইয়া যদি একবার নিষ্কপটে বলে যে হা; প্রভু দয়াময় হে! আমাকে রক্ষা করুন তাহা হইলে আমি তখন তাহাকে সেই মায়াজাল হইতে উদ্ধার করিব। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং যথা—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (ক্রমশঃ)

জীবাধম—শ্রীব্রজলাল সাহা।
হম্‌দম্‌পুর পোঃ ফরিদপুর।

রাজর্ষি বনমালী রায়ের তিরোভাব।

(সংকীর্ত্তন মধ্যস্থ শবদেহ-দর্শনে লিখিত)

দেখ দেখ !

তাড়সের অধিপতি, দুঃখী বৈষ্ণব গতি,
ভাগ্যবান্ রাজঋষি বনমালী রায়।
বরজমণ্ডল শোভা, প্রকাশিয়া দিব্য-আভা,
সাঙ্গ করি নরলীলা নিত্যধামে যায়॥
ব্রজধামে কৃষ্ণসেবা, যে করিল রাত্রিদিবা,
বৈষ্ণব সেবনে যা'র প্রীতি অতিশয়।
সাধুসেবা সৎসঙ্গ, ভক্তির সরব অঙ্গ,
যে সাধিলা করি নিত্য বহু অর্থ ব্যয়॥
দেখ দেখ চলে রঙ্গে, কৃষ্ণনাম সর্ব্ব অঙ্গে,
গলে শোভে ফুলমালা প্রফুল্লবদন।
চন্দনচর্চ্চিত-দেহে, সুবিমল গন্ধ বহে,
ভকতপ্রধান চলে গোবিন্দ সদন॥
এ মহাপ্রয়াণ নব, নবলীলা অভিনব,
করি গেলা রাজঋষি বৃন্দাবনধামে।
কলিতে জনকঋষি, জনমিল যেন আসি,
তাড়সাধিপতি রায় বনমালী নামে॥
শাস্ত্রতত্ত্ব-সুপণ্ডিত, সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত,
কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী ভকত প্রধান।
ব্রজরসে টলমল, ব্রজভাবে ঝলমল,
বিশুদ্ধ হৃদয় যাঁর,—দীনতা নবীন॥
শাস্ত্রগ্রন্থ পরচারে, অর্থ দিলা অকাতরে,
বরজমণ্ডল রবি গৌরাঙ্গের দাস।
নিত্যধামে প্রবেশিলা, সাঙ্গ করি নরলীলা,
শুভক্ষণে কৈল যিঁহো বৃন্দাবনে বাস॥
দীন বৈষ্ণবজন, চিরদিন অনুক্ষণ,
স্মরিবে তোমার নাম জীবনে মরণে।
(হে) বৈষ্ণব-গৌরবরবি, হৃদে ধরি তব ছবি,
পূজিবে অনন্তকাল প্রীতিযুক্ত মনে॥
যাও তবে বনমালি ! এ অনিত্য দেহ ফেলি,
নিত্যধামে নিত্যানন্দে কর গিয়া বাস।
তব সঙ্গ-সুখ-সুধা, মিটাইবে ভব ক্ষুধা,
যতদিন জীবে ভবে দাস হরিদাস॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।
কেশীঘাট, শ্রীধামবৃন্দাবন।

ওঁ তৎসৎ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

আনন্দ।

গোরারূপ।

—:*:—

স্বর্ণরম্ভা পরে কমলের ঝাড়
উলটি শোভিছে চারু,
উরুযুগ-মূল কটিতল কোপা
সে কটি পরম সরু।
তদুপর শোভে সুন্দর উদর
সুধার তরঙ্গ ভরা।
তদুপর কিবা পরিসর উর
নাগরীর মনোহরা।
আজানুলম্বিত দুদিক দু-বাহু
সপদ্ম মৃণাল দোলে
লাবণ-সমুদ্রে ভাসমান কম্বু
তদুপর চাঁদ ঝলে।
চাঁদের উপরে বেড়ি মেঘদল
কিবা অপরূপ শোভা।
চাঁদমুখ সুধা স্মিতাধর ধারা
মাখিয়া তড়িৎপ্রভা।
মেঘের তড়িৎ সুধাংশুর সুধা
কিবা সে পীরিতি জড়া,
কি সুন্দর নাসা খগ-চঞ্চু বাড়া
পীরিতে অমিয়-ঝরা।

খগ-চঞ্চু ভয়ে নাগ-নেত্র ছুটি
বিষামিয় সে কুটিলে
নারীবুক দংশি পলাইতে চায়
অই-যে শ্রবণ বিলে।
সুমেরুর অঙ্গে গঙ্গা উপবীত
তরঙ্গিত সুধাময়,
সুনিতম্ব বেড়া লোহিত অম্বরে
চুম্বিত গঙ্গা-পয়ঃ।
গলে মুক্তাহার মালতীর মালা
কপালে তিলক শোভা,
শ্রবণে কুণ্ডল ছুল, মণিময়
কপোলে মধুর প্রভা।
সর্ব্ব তনুময় মধুর চুয়ানি
কমলে চন্দন ভাতি,
দরশ করিলে পরশ লাগিয়া
পরাণ ছুটয়ে মাতি।
তনু তেজঃপ্রভা কণিকা লোলুপ
ভাস্কর গগণে চরে,
তনু শৈত্য সুধা ছটা পিয়া চাঁদ
নিজ তনু পুষ্টি করে।
অঙ্গগন্ধ-লোভে গন্ধবহ বয়
শীতল মধুর মৃদু,
রসোজ্জ্বল গোরা রস পারাবার
মাধুর্য্য সুধার বিধু।
রূপনিধি গোরা সৌন্দর্য্যের সার
পুরুষ-রতন সই,
তড়িতের প্রায় নয়ন ঝলসি'
হায়রে, লুকা'ল কই!

শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর।

ঢাকা।

নাম-নামী অভেদ।

—০:*:০—

আমরা কয়জন বন্ধু একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইতেছি, কিন্তু প্রসাদের অঙ্গীভূত গৌরকথা না উঠিয়া ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িয়াছে। গল্পে কেহ কম নহেন, কাজেই গল্পটীর আর ক্ষান্ত (The end) হইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ চাকর 'মুরারি' আসিয়া ধমকাইয়া বলিল "আর কি তোমাদের কথা নাই? কৃষ্ণ কথা কও, রামলক্ষণ বল, গৌরনিতাই বল, দেখছ না অপদেবতার ভর হয়েছে।" তখন আমাদের চমক ভাঙ্গিল, হটাৎ যেন সর্ব্বাঙ্গ ভার ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। 'মুরারি' একজন পাকা ভূতের ওঝা, রহস্যপ্রিয়ও বটে। সে হাসিয়া বলিল যদি তোমরা ভয় না পাও তবে তাহার (মুরারি রাত্রিতে ভূতের নাম করে না) আবির্ভাব এখনই দেখাইতে পারি। বলিতে বলিতে 'মুরারি' কি বিড় বিড় করিতে লাগিল, অমনি একটা সোঁ সোঁ শব্দ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কলাগাছ বিনা বাতাসে পড়িয়া গেল। আমরাত অবাক, 'মুরারি'র বুজরুকী দেখিয়া বজ্ঞানরাজ্য তোল পাড় করিয়া ফেলিলাম কিন্তু সমস্যা পূরাইতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম নাম-নামী অভেদ ইহাই বুঝি প্রভু আজ বুঝাইলেন! নাম করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে নামীর অনুভব হইতে থাকে, ইহা সত্য পরম-সত্য। কলাগাছ ভাঙ্গাত ছোট কথা, আমরা দেখিয়াছি নাম-প্রভাবে কাঠের পুতুল নাচিয়াছে, পাহাড়-পর্ব্বতও নাচিয়াছে। বাস্তবিক ইহা মিথ্যা বা কল্পনার কথা নহে। সেদিন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব সময়ে যখন প্রভুসন্তানগণ ও ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া "কলি-মহামন্ত্র নাম বত্রিশ অক্ষর, ভবতাপ-নির্ব্বাপণ অমিয়া নির্ঝর"—মনের আবেগে গাইতেছেন, তখন দেখিতেছি কীর্ত্তন মাঝে মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান অমাত্য, 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, মহাগম্ভীর মহাপ্রবীণ 'ললিতমোহন' অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন! আর গৌর-প্রেমরসে ঝুরিতেছেন! তাঁহার দক্ষিণে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী একজন যুবক রুমালে চক্ষু মুছিতেছেন, আর অলক্ষ্যে তালে তালে পা ফেলিতেছেন। আর বামভাগে Double M.A. উপাধিধারী সার ভূষণ বাবু, তাঁর অবস্থাও ততোধিক! পূর্ব্বদিনই যে ললিত বাবুকে যষ্টি সাহায্যে কষ্টে সৃষ্টে চলিতে দেখিয়াছি, তাঁহাকে আজ নাচাইতেছে

কে? কপটতা বা প্রতিষ্ঠা কামনার কোন প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না, যেহেতু তিনি ও তাঁহার পার্শ্বস্থ মহাবিদ্বান্ ও উচ্চপদস্থগণ প্রথমে গাম্ভীর্য্য-রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে জেদ ভাঙ্গিয়া কে চপল করিয়া তুলিল? ইহাকেই বলে পর্ব্বত নাচান। বুঝিলাম নামের সহিত নামীর আবির্ভাব সুপ্রকটীভূত হইয়াছিল, তাই ঐরূপ অসম্ভব সম্ভাবিত হইয়াছিল। আবার সেদিন কলিকাতাস্থ জনৈক গৌর-ভক্ত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাণস্পর্শী শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা গান হইতেছে, নবীন-ভক্ত-গায়ক যোগেন্দ্রনাথ প্রেমভরে গাইতেছেন, আর দরদর ধারা হইয়া নাচিতেছেন; ভক্তবৃন্দও উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু কীর্ত্তন মাঝে দেখিলাম মালতীর মালা বিলম্বিত অতি অপরূপ একটী মোহিনী মূর্ত্তি নাচিতেছে! কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ভক্ত ৺সুবল চন্দ্র মহাশয়ের পৌত্রী পঞ্চমবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী বালিকা মনোহর নৃত্য করিতেছে! সে নৃত্যের ভাব অদ্ভুত, ভঙ্গিমাও অপূর্ব্ব! মধুর মৃদঙ্গ বিবিধতালে বাজিতেছে, গৌর-রস-ভাবিতা বালিকাটীও ঠিক তালে তালে মধুর নৃত্য করিতেছে! বালিকাটীর মুখে চোখে অপার্থিব প্রফুল্লতা খেলিতেছে! সে দৃশ্যে ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রেমের প্রবাহ তরতর করিয়া ছুটিয়াছে! কীর্ত্তনের আর বিরাম নাই, বালিকার নৃত্যেরও তাল ভঙ্গ নাই! যখন এইরূপে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তখন অরসিক আমি বালিকার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া সেই মধুর প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রভুর এই অলৌকিক মনোহারিণী লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম! কাঠের পুতুল নাচান ইহাকেই বলে। বালিকাকে কে তাল লয় শিখাইল? কেই বা এই অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমতী করিয়া তুলিল? 'শ্রীভাগবতের' সার শ্লোকের কথা মনে পড়িল :—

"এবং ব্রতং স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

"প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥" চৈঃ চঃ।

কুতর্ক-নিষ্ঠ দুষ্ট-চিত্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলেও মানিতে চায় না, তাই একবার মনে হইল ইহা কি গান বাজনার শক্তি? সরলা বালিকা বাজনা বাজিলে নাচিতে পারে বটে কিন্তু জগতে এমন কোন গান বাজনা নাই যাহাতে ললিত

বাবু ও ভূষণ বাবুর মত মহা-প্রাজ্ঞকে নাচাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং মনকে শেষে নিরুপায় হইয়া স্বীকার করিতে হইল ইহা কৃষ্ণনামের শক্তি, ইহাই নামের অচিন্ত্য প্রভাব। নাম-নামী অভেদই বটে।

নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥"

চিন্তামণি স্পর্শমাত্রেই লৌহ কাঞ্চন হয়। শ্রীনাম কৃপা করিয়া যাহার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাহার লৌহবৎ চিত্তও দেখিতে দেখিতে কাঞ্চণ হইয়া উঠে। অই দেখ ভাই, কাল যে জগাই মাধাই নিষ্ঠুরতার ও পাপাচরণের জীবন্ত প্রতিমা ছিল, আজ তাঁহারাই পরম কোমল ভাগবত হইয়াছেন। কায়মনোবাক্যে জীবের সেবার জন্য গঙ্গাঘাট বিধৌত করিতেছেন, আর যাঁহাকে পাইতেছেন তাঁহারই চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছেন, অপরাধ ক্ষমা চাহিতেছেন। শত বর্ষের তপশ্চরণেও বুঝি চিত্তের এইরূপ পরিবর্ত্তন হ'ত না, কিন্তু নামস্পর্শমাত্রেই শতজন্মের সঞ্চিত পাপ মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইল, সুতরাং নামকে চিন্তামণি না বলিয়া আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত 'রসোবৈসঃ'। কৃষ্ণ নামেই সেই গুণগুলি পূর্ণ বিরাজিত। তাই যিনি নামে ডুবিয়াছেন তিনি সংসার বিমুক্ত আনন্দময় মূর্ত্তি। প্রাকৃত সুখদুঃখ, শোকতাপ কিছুতেই তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কৃষ্ণ-প্রেমরসে তাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ ডুবিয়াই থাকে। কোটিকল্প-সাধনে যাহা না মিলে, তাহাই তাহার সুলভ হয়। নামামৃত-সাগরে ডুবিয়া ভক্ত তখন জ্ঞানকর্ম্ম যোগাদির অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়া গাহিতে থাকেন:—

"গো-কোটিদানে গ্রহণে চ কাশী।
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী॥
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রীগোবিন্দ নামে॥"

অপরাধ যুক্ত হইয়া নাম লই বলিয়া নামে আমরা অমৃত আস্বাদন পাই না। 'কুইনাইন' মিশ্রিত দুগ্ধ পানে অমৃতাস্বাদন পাইব কেন? তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"নিরপরাধ হইয়া সদা লবে নাম।"

আমরা গৃহী বিষয়ী, সর্ব্বদা অপরাধ সাগরে ডুবিয়া আছি, তবু কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীনাম আমাদিগকেও সেই অমৃতের সংবাদ দিয়া থাকেন। আজ

কাল যেরূপ দুর্দ্দিন পড়িয়াছে তাহাতে শাস্ত্র বিহিত নবধা ভক্তি যাজন করা অসম্ভব। বুঝি আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে জানিয়াই সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বসু রামানন্দের সহিত কথোপকথনে তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। বসু রামানন্দ আমাদের পক্ষে প্রশ্ন করিলেন, "গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে? নবধা ভক্তি সাধনত আমরা পারিব না।" "প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-সেবন, নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন নাম সাধন হইতেই সব হইবে।

"এক কৃষ্ণ-নামে করে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়॥" চৈঃ চঃ।

জীবের পুরুষার্থ হইল কৃষ্ণ-প্রেম, জীবকে তাহাই লাভ করিতে হইবে। শাস্ত্র জীবের জন্য চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ "ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ" দেখাইয়া দিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই চারি পুরুষার্থকে কৈতব বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। জীবকে ঐরূপ উপদেশ করিয়া উদ্ভ্রান্ত করে, তাহা কৈতব শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি তারস্বরে উদ্বাহু হইয়া বলিলেন "প্রেমই একমাত্র জীবের পুরুষার্থ" যে-রূপেই হউক তাহা পাইতেই হইবে। সেই দেবদুর্ল্লভ প্রেম-চিন্তামণি পাইবার সহজ পন্থা এই কৃষ্ণনাম সাধন। কলিকালে যখন ব্রাহ্মণেতর জাতি ধর্ম্মবাজ্য হইতে দূরে বিতাড়িত হইয়াছিল, যখন শূদ্র-দর্শনেই ব্রাহ্মণকে পুনরায় স্নান করিতে হইত সেই ধর্ম্ম-সঙ্কোচ সময়ে প্রভু আসিয়া নিখিল শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রচার করিলেন :—

"নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বশাস্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥"

অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ইহাতে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতির তুল্যাধিকার। কেহই বঞ্চিত নহেন।'

"সর্ব্বজন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার।
সাধন ভক্তি (নাম) চারি বিচারের পার॥ চৈঃ চঃ

তাহাতে বসু রামানন্দ প্রশ্ন করিলেন "শাস্ত্রে দীক্ষা পুরশ্চরণাদির বিধি আছে, চণ্ডাল যবনাদিকে কে দীক্ষা দিবে?" জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সমাধান করিলেন, নামের অপূর্ব্ব শক্তি অদ্ভুত কৃপা, ইহাতে

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥"

মাদৃশ বদ্ধজীবের কল্যাণ জন্য পুনরপি বসু রামানন্দ বলিলেন, "ভব-বন্ধন ক্ষয়

হইবে কিসে? এবং কৃষ্ণ প্রেমধন লাভ যাহা শ্রীমুখে পরম পুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তাহাই বা কিরূপে লভ্য হইবে? পরম দয়াল শ্রীগৌরসুন্দর একটু হাসিয়া বলিলেন "রামানন্দ, হরিনাম মহিমা বর্ণিবার নহে, উহা জপিতে জপিতে অনাদি কালের সঞ্চিত পাপাপরাধ-জনিত অরুচি বিদূরিত হইয়া রুচি জন্মিবে। রুচিকর বস্তুর স্বভাবই চিত্তাকর্ষক, তখন কাজেই আসক্তি আসিবে, আসক্তির সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্যের উদয় হইবে। সংসারের বন্ধন ছিন্ন জন্য পৃথক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইবে না, তাঁহাত হরিনামের অনুষঙ্গ ফল।"

"অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥"

কৃষ্ণ-নামগুণ-মহিমা আর কত বলিব? জগদুদ্ধার জন্য এই ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রভু আমার জীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া বিলাইলেন, কিন্তু বিনামূল্যে অমৃত পাইয়াও মাদৃশ হতভাগ্য গ্রহণ করিল না, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? তাই ভাইরে, আমাদের দুর্গতি যাইয়াও যাইতেছে না। আমরা যে আত্মহা, আমাদিগের উদ্ধারের জন্য পরম দয়াল প্রভু শাস্ত্রগুরু সাধু মহাজন রূপে অনুদিন ফিরিতেছেন, নিজে আসিয়া কত মিনতি করিয়া নাম বিলাইয়াছেন, তবু আমাদের সুমতি হইতেছে না, আমাদের স্কন্ধে যে আত্ম-হত্যা চাপিয়াছে।

একটা সত্য গল্প মনে পড়িল। আমাদের তারানাথ বসুর ছেলের ঘাড়ে কি ভূত চাপিয়াছিল। সে কোন কথাবার্ত্তা নাই, ফাঁক পাইলেই গলায় দড়ি দিয়া বসিত। এইরূপ একবার দুইবার তিনবার করিয়াছে, তিনবারই লোকের চোখে পড়িয়াছিল তাই রক্ষা পাইয়াছে। শেষে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইজন প্রহরী অষ্টপ্রহর নিযুক্ত রহিল। এদিকে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, ভোগবিলাসের অন্যবিধ অবস্থা পূর্ণমাত্রায় ছিল কিন্তু কেমনই তাহার স্কন্ধে "গলায় দড়ি" চাপিয়াছিল, সে কিছুতেই সংসারে মজিল না, অবশেষে একদিন গাড়ী ভাড়া করিয়া সাঁওতাল পরগণায় পলাইয়া গিয়া, সেখানকার জঙ্গলে যাইয়া, নিরুপদ্রবে গলায় দড়ি দিয়া তবে সোয়াস্থি পাইল! আমাদেরও ভাই, তাই হইয়াছে, ঠিক ঐরূপ আত্মহত্যা করিবার প্রবল একটা নেশা চাপিয়া আছে। শাস্ত্র শতমুখে হরিনাম-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, সাধু মহাজনগণ অবিরাম হরিনাম ঘোষণা করিতেছেন, স্বয়ং প্রেমসিন্ধু পতিতপাবন শ্রীগৌরনিতাইও সেই পরমমঙ্গল নাম দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিলাইলেন, তবু আমাদের সুমতি হইতেছে না,

নামে নিষ্ঠা আসিতেছে না। জানি না এ ব্যর্থজীবন লইয়া প্রভু আর কোন কার্য্য সাধিবেন?"

"কেনে বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন গেল না মরিয়া॥"

শ্রীবামাচরণ বসু।
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাশীমবাজার।

পাগল মানুষের ভিক্ষা।*

—০:*:০—

(ভিক্ষা না মাধুকরী)

গৃহী আমি, একপুত্র, পত্নী বর্ত্তমান,
একে তিন, তিনে এক মধুর মিলন!
দেহযাত্রা উপযোগী কিছু চাই দান,
বিপুল বিভবে মোর নাহি প্রয়োজন।
তিনটি প্রাণীর তরে সেরেক তণ্ডুল,
চারিটী পয়সা আর চারি হাত স্থান।
ইহাতেও কুণ্ঠাবোধ, দেশের কি ভুল!
কলিজা কি হিয়া হ'তে হ'ল অন্তর্দ্ধান?
কি উদ্দেশ্য, 'কবা লক্ষ্য, শুনিতে বাসনা?
বাহে অপরাধ শূন্য নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরেতে প্রেমলীলা রস আস্বাদন,
ইহাইত অহেতুকী ভক্তি উপাসনা।
পাগলের এই ভিক্ষা শুধু শিক্ষা তরে।
মাধুকরী নাম তার বুঝ ভাল ক'রে।

শ্রীরসিকলাল দে।
সোনামুখী, গরীবভাণ্ডার।

---

* আমাদের প্রিয়তম পাগল মানুষ যুক্তবৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর নিরপবাধ নাম সঙ্কীর্ত্তন অভিপ্রায়ে দেহ যাত্রার উপযোগী এক সের চাউল, এক আনা পয়সা ও চারি হাত পরিমিত নিষ্কর স্থানের প্রার্থনা সর্ব্বসাধারণে জানাইয়াছেন। এই দীন হীন অধম সেবক ভিন্ন সকলেই তাঁহাকে উপেক্ষার চ'ক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! পাগলের প্রবর্ত্তদশার এই ভিক্ষার ভাবাবলম্বনে কবিতাটী লিখিত।—লেখক।

ব্রহ্মচর্য্য।

—:*:—

প্রবাহ বন্ধ হইলে বারি পচে, কীটাকীর্ণ হয় এবং কালপ্রবাহে জলাশয় ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়। বৃক্ষ ছিন্নমূল হইলে ঢলিয়া মরে। কারণ যে রসপানে বৃক্ষ জীয়ে, সে রসপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। বৃক্ষ বাঁচে না। "আমি"—জ্ঞানের কোবে (অস্ত্রাঘাতে) মূল কাটা যায়; তখন জীব কেবল স্বীয় আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আত্মশক্তি বা নামমাত্র স্বাধীনবুদ্ধিবলে বিপথী হয়। নিজকে সমূল বজায় রাখিবার—কি অন্তঃপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার—মৌলিক প্রক্রিয়া কি?—

লতা ভূমির রস পান করে; তাহাতে উহার দেহপুষ্ট হয় এবং ক্রমে ঐ রসসারাংশ ফুলে পরিণত হয়, তদ্রূপ ভক্ষিত সামগ্রী মানবদেহে প্রথমতঃ রক্তে অতঃপর মেদাদিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বশেষে ফুল ফুটায়। এই ফুল হইতে কপালদোষে কাহারও বিষফল, ভাগ্যবশে কাহারো প্রেমামৃত ফল জন্মে। এই পুষ্পময় ললাটতিলকবিন্দু চন্দ্রবিন্দু জানিবেন। চন্দ্রের বাস গগনে। এই বিন্দুর পতনে জীব পাতালে যায়। "পত" ধাতু হইতে পাতাল শব্দের ব্যোৎপত্তিকা। চন্দ্র সুধানিধি, এরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। উহার সুধাকৌমুদী-স্পর্শে ওষধিমাত্র উৎপন্ন ও সঞ্জীবিত হয়। এই চন্দ্র হইতে ক্ষরিত সুধারস সর্ব্বদেহেন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও মধুর করে। মধুর ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়নিচয় আনন্দের হেতুভূত স্বীকার করিবেন। আনন্দময় কোষস্বরূপ এই চন্দ্র নিত্যানন্দের শ্রীপীঠ, কারণ চন্দ্র আনন্দ বিধান করেন বলিয়া উনি রাম এবং বলবিধান করেন, তাই উনি বলদেব! দিব্যচক্ষু কাহাকে বলে তা জানেন?—ঐ চন্দ্র যার দেবতা শ্রীনিত্যানন্দ। ফুলে যেমন ফল ধরে, নয়নে তেমন রূপ খুলে। কামে মজিয়া চন্দ্রের যক্ষ্মা হইয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য ভাবুন।—চন্দ্রধারণে সুধা ঘনীভূত হইয়া প্রেমসঞ্চার করে এবং রাসপূর্ণিমার শোভাসম্পাদন করে, পক্ষান্তরে কাম বা বিলাসিতা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক, সুতরাং উহাতে চাঁদের হ্রাস পরিণাম অমাবস্যা সংঘটিত হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রবলতায় মানুষ দুর্ব্বল হয়, সহজে হাসিয়া ফেলে। চন্দ্রের যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছিল। কামে চন্দ্রের ক্ষয়, প্রেমে চন্দ্রের জয় হয়।

চাঁদের সুধায় অভিষিক্তি হইয়া জীব ব্রহ্মতেজঃ লাভ করে। চন্দ্রহানি নিবন্ধন জীব ব্রহ্মতেজে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নীরস, শ্রীহীন ও বিকৃত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মটা জীবের স্বভাব কিন্তু চন্দ্রক্ষয়ে জীব অপ্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা' হারায় এবং নানারঙ্গে চিত্রিতা বিলাসিতায় মজে। ইদানীং মানবের ধর্ম্মভাবটা বিলাসিতানিবন্ধন এক প্রকার মলিন। ধর্ম্মমালিন্যবশতঃ জীবের বর্ত্তমান শোচনীয়াবস্থা ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম এখন মানবের প্রাণ নয়, পোষাক, ইহা সংজেই উপলব্ধ হইতেছে। বহির্দ্দশাই যত দুর্দশার নিদান; মূলনিদান এইযে চাঁদের যক্ষ্মা হইয়াছে। কাম (বাসনা) জীবসমাজকে একবারে কবলিত করিয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্মী কামনা-সাগরে ডুবিয়াছেন। লক্ষ্মীর অন্তর্ধানে আমরা এত দুঃস্থ; ধন্বন্তরির অভাবে আমরা এত রুগ্ন; অমৃত সকলই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়াছে। আমাদের সুখসৌভাগ্য সমস্তই সে জলে নিমজ্জিত এসো সবে ধর্ম্মহীন জীবন্মৃত আমরা কামনা-সিন্ধু মন্থন বা স্তম্ভিত করিয়া সুধাকর চাঁদেরে তুলিয়া আবার গগনে আরোপিত করি। চাঁদ পাদবিমুক্তবৎ উজ্জ্বল হইবেন।

শাস্ত্র বলেন, আপনারা মহাজন বলেন, "নামে প্রেমোদয় হয়, ভাবোদয় হয়." বটে, কিন্তু নামে রুচি না জন্মিলে, কেবা নাম করে? নামে রুচি কেমনে জন্মে তদনুসন্ধান আবশ্যক। আমি অধম যতদূর বুঝি, ভিতর ব্রহ্মময় না হইলে, নাম রসময় হয় না, রসময় না হইলে পুনরুচ্চারণে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি জন্মায় না। ভিতরটা আগে ব্রহ্মজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিক করা চাহি। এই ব্রহ্মজ্যোতি চাঁদের কিরণ পারে অবধূত নিত্যানন্দভাব। অতএব ব্রহ্মচর্যা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখমূল। ব্রহ্মচর্য্যে চাঁদ ফোটে, চাঁদ ফুটিলে ভিতর ব্রহ্মানন্দময় হয়। ব্রহ্মানন্দ-স্ফুরণে নামরুচি স্ফূর্ত্তি পায়; অতঃপর প্রেমস্ফূর্ত্তি, উহা চন্দ্রকুসুমের ফল; উহা শ্রীনিত্যানন্দের গৌরাঙ্গ! ভিতর জ্যোতির্ম্ময় না হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি বিধৌত হয় না। ব্রহ্মজ্যোতিঃ-সুধাস্নাত না হওয়া পর্য্যন্ত অশুদ্ধাবস্থায় নামাপরাধাদি বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং কাম ভীষণ রিপু! কাম জীবকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া ঘোর নরকে ফেলিয়া দেয়, কেবল আঁধার, আঁধার, আঁধার! কামুকের পৈশাচিক লীলা সর্ব্বত্র ছাইয়াছে। কলির জীবের আবার ঘোর দুর্দ্দশা।

এখন পাঠক মহোদয়গণ আপত্তি করেন, এই চন্দ্ররশ্মি জড়, অজড় নয়। ঠিক্ বটে, কিন্তু উহা জড় হইলেও অজড়স্পর্শী। সাধনার উজান গতি। শ্যামের বাঁশরীগানে যমুনা উজান বয়। সাধককে বংশীধ্বনীপানে উজান-

সরিৎ বাহিতে হয়। এই জড়ীয় উজান-সরিৎ-রথে চড়িয়া সাধক অজড় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতির পথিক হন। সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া ভক্ত প্রণামধ্যানাদি করেন; ইহার তাৎপর্য্য ঐ। জড়জ্যোতি ভাবুককে অজড়জ্যোতিতে পৌঁছায়। জড়ীয় আনন্দের অরণ্য হ'তে চিদানন্দপুরের প্রবেশ-দ্বারে দ্বারী শ্রীনিত্যানন্দ। ব্রহ্মচর্য্যের চরম এই সন্ধিস্থলে জীবের দীক্ষা হয়। অনাদি ভক্তিশাস্ত্রে নামের দোহাই আছে। নামে পঞ্চমপুরুষার্থ সংলব্ধ হয় শাস্ত্রে বলেন, আমরাও মানি, কিন্তু জানিবেন, সেই নামের দীক্ষা এই স্থলে বটে। কারণ নাম জড় নয়, অজড় চিন্ময়। ব্রহ্মজ্যোতিতে চিত্ত উদ্ভাসিত হইলে, চিত্তে নাম জাগে; উনি নিত্য, উহার নিদ্রা ভাঙ্গে। নিদ্রা ভাঙ্গা আলোর ধর্ম্ম। সচরাচর আমরা নাম করি সত্য, কিন্তু কেলিবিহীন। ব্রহ্মানন্দসিন্ধুর তরঙ্গেই নাম পুষ্পবৎ তাণ্ডব করে এবং তাণ্ডব করিতে করিতে তরঙ্গের ধাক্কায় রসনা-সরিতে আসিয়া পৌঁছে। নাম ও নামী 'অভিন্ন' সুতরাং জ্যোতিই ব্রহ্মপদবাচ্য। কারণ শ্রীমান্ স্বপ্রকাশ, অনন্তশক্তিশালী। নামের নিম্নস্তরের অবস্থাই এই প্রসঙ্গের আলোচ্য। নামযোগে যিনি বলীয়ান্ মহীয়ান্, তাঁহার সম্বন্ধে এসব প্রয়োজ্য নয়। আগেই বলিয়াছি, সাধনার উজান গতি। জ্যোতি দিয়া, যার জ্যোতি, সেই আসলবস্তু ধরিতে হয়; কৃষ্ণ-রাধার ভাবকান্তি অঙ্গে মাখিয়া গৌর হইয়াছেন কেন? না, রাধার ভাবযোগসূত্রে জীব কৃষ্ণ ধরিবে। ইহা সাধনার উজান গতি বা বিপরীত রতি। সদাচার ভিন্ন ব্রহ্মতেজ জন্মে না। নারিকেল ফলের আবরণ মালা কঠিন, কিন্তু উহার ভিতর সুমিষ্ট শস্য ও স্নিগ্ধশীতল জল আছে। ভাঙ্গিয়া আস্বাদন করা কঠিন ভাবিয়া কেহ কেহ বা উহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন। সদাচার কঠোর বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে মধুর শ্রীনাম-শস্য এবং শ্রীনামমাধুরী বারি সাবধানে জড়িত আছে। সদাচারের কেহ উপেক্ষা করিবেন না, উহা অবশ্য-প্রতিপাল্য। সদাচার-ব্রতমণ্ডলীর ব্রহ্মচর্য্য কেন্দ্র বা শিরোমণি। যে চর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন, সেই চর্চ্চা-ব্রজ্যাই ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত। ব্রহ্মচর্য্য কি তাহা সাধারণতঃ একরূপ সকলেই জানেন। সুতরাং যোষিৎ-সঙ্গের চর্চ্চা এস্থলে করা আবশ্যক।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাই, "সাধক, সিদ্ধদেহ বা প্রকৃতি-দেহ ভাবনা কর।"—কোন কোন ব্যক্তি অর্থ করেন "চিন্তা কর।" বস্তুতঃ এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়। কারণ, চিন্তা করিয়া ঠাওরাণ কেবল কল্পনা মাত্র, সুতরাং সাধন পণ্ড। বস্তুতঃ "ভাবনা কর" বাক্যের অর্থ (ভূ ধাতু ণিচ্) জন্মাও বা উদ্ভাসিত কর। কেমন করিয়া

জন্মাইবে বা জাগাইবে তদুপায় এসঙ্গে প্রকটিত হয় নাই। মনে মনে কেবল ঠাওরাইলে সুফল ফলে না আদত মূর্ত্তি ভাসাইতে হইবে,—তা কি জড়ীয় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা হয়?" তা নয়, পাইপের ভিতর দিয়া যেমন গঙ্গা (জল) চলেন, তদ্রূপ জীবের ভিতর দিয়া এক চিজ্জ্যোতির খেলা-মেলা-প্রবাহ না চলিলে, সিদ্ধদেহ প্রকাশ পায় না, তাহার উদ্বোধন হয় না। দেবপূজায় বাতি জ্বালে কেন? এই তাহার মর্ম্ম. ব্রহ্মজ্যোতির প্রদীপ দিয়া দেবতা সেবিতে, পূজিতে হয়।

ধর্ম্মহীনতার দ্বিতীয় মৌলিক হেতু শাস্ত্রান'ভজ্ঞতা। নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা এক ভ্রান্ত সংস্কারের বশ হইয়া পড়িয়াছি, আমরা বেশ মনে করি, আমরা শিক্ষিত, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা আমরা দেখিতে পারি, আমাদের এ সব পথ্য অতি লঘু, আমরা গুরুখাদ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। বিদ্বান্ হইয়াও দেখিতে পাই, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ অপার বিদ্যা-সাগর আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, আমরা কেবল একখানি সরুখাল পার হইয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমান নিয়মে শিক্ষিত হইয়াও আমরা কেহ কেহ দেখিতে পাই আমাদের কার্য্যকলাপ, পদ্ধতি, রীতিনীতি, চরিত্র যাহাদের এত গৌরব করি সে সব কিছুই ঠিক নয় 'কিম্ভূত কিমাকার।' ভাবি কি আমরা কোথায় চলেছি? কোথায় যাইতে হইবে, সে সব কি ঠিক্ করেছি? আমরা ভ্রান্ত পথিক! যে পথে হাটিতেছি সেটি পথ নয়। আমরা কেবল হাওয়া খাওয়ার জন্য বা হয় হয়েছি, বেড়াইতেছি। গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি কৈ? কেবল হাওয়া খাইয়া কি প্রাণ বাঁচে? অমৃত পান করিতে হইবেক, অমৃতধামে যাইতে হইবেক। সে পথ বজ্রময় বজ্রকঠোর বটে, ভীত হইতে নাই। উহাতে বিদ্যুতের ঝিলমিলি আছে, আবার অমৃতপঙ্কের ছাইনি আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাব ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চরিত্র গঠন করা যাউক্ (চর ধাতু ইত্র)—যদ্দ্বারা চরণ করিতে হয়—উহা রথ। চরিত্ররথ গড়গড় গড়গড় চলিয়া যাইবে। স্বয়ং কৃষ্ণকে সারথি করা যাউক্, নিজে একটু সবিয়া বসা যাউক্, সারথি হস্তে বল্গা দেওয়া যাউক্। সুখে বসা যাউক্, নিশ্চিন্ত চলা যাউক্। তখন আমাদের মস্তকে নন্দনের পারিজাত প্রবৃষ্ট হইবে। উহাতে অমৃত চন্দন মাখা থাকে। চলিতে চলিতে পথে পথে অমৃতগন্ধ উপলব্ধ হইবে। যাহাদের এরূপ হইয়াছে, তাঁহারা সত্যই ধর্ম্ম প্রাণ তাঁহারা তৈয়ের হয়েছেন। উপর উপর আল্গা আল্গা একটা শিক্ষা পাইয়া কৃমিবৎ কিলবিল করিতেছি, এমন সুন্দর সৃষ্টিটাকে এই

ভাবে নাশ করা আমাদের অকর্ত্তব্য। নিজমুখ আমরা দেখি না, শাস্ত্রদর্পণে মুখ ধরা যাউক্। দেখিব; তখন দেখিব—কুৎসিৎ, কুৎসিৎ।—সুন্দর বলিয়া নাচিবার থাকিবে না। যে দিন যথার্থ সৌন্দর্য্য কি বুঝিব সেদিন আমাদের নবলালসার উদ্রেক ঘটিবে, তখন আমরা পুনর্জন্মলাভে দ্বিজ হইব। ব্রহ্মতেজের তা পাইয়া ডিম্ব ফুটিবে, জ্ঞানের ডানা লইয়া ছানা বাহির হইবে। এখন অজ্ঞান খোশার ভিতর আছি। আমরা ডিমেই কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি। ফুটিয়া যখন বাহির হইব, উড়িব, তখন দেখিব জগৎ খানা কি, বুঝিব পূর্ব্বসিদ্ধান্ত সব ভ্রান্ত।

এখন যোষিৎসঙ্গ অনুশীলনীয়;—শ্রীভাগবতে যথাঃ—

"ন তথাস্য ভবেন্ মোহো বন্ধাশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

যোষিৎ সঙ্গে এবং তৎসঙ্গি সঙ্গে-পুরুষের যাদৃশ মোহ ও বন্ধন হয়, অন্য কোনও প্রসঙ্গে সেরূপ হয় না।

আধুনিক সময়ে আমরা এই ঘোর বিপজ্জালে জড়িত আছি। যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গী পর্য্যন্ত পরিত্যজ্য! বাবা,—কোথায় আছ! অপত্যার্থে দার পরিগ্রহকে যোষিৎসঙ্গ বলা যায় না। তদ্ব্যভিচার যোষিৎসঙ্গ।

জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ জ্ঞান-ভক্তিপ্রেমের আদর্শে দাঁড়াইয়া পরে সংসারধার গ্রহণ করিয়া জগৎ সম্মুখে উচ্চ উজ্জ্বল সাধুজনানুস্মৃত্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের এই মঙ্গলোত্তম পদবী নিতান্ত অনুসরণীয় আসুন্ সকলে প্রভুর পদানুসরণ করি, দেখি আমরা ধর্ম্মামৃত-পানে মহীয়ান্, আয়ুষ্মান্ ও অমর হইতে পারি কিনা।

জ্ঞানভক্তির উন্মেষ ও উৎকর্ষ দ্বারা চরিত্র সংগঠিত হইলে পর বিবাহের ব্যবস্থা বিহিত। কারণ তাহা হইলে সম্বন্ধযুক্তা স্ত্রীতে মনের অত্যন্ত অভিনিবেশ ঘটে না। অপরিমেয়, অপ্রশমিত অভিনিবেশই বর্ত্তমানযুগের রোগ। স্ত্রী আসক্তি বশে আমরা এতই মোহান্ধ যে, এমন কি আমরা স্নেহময়ী মাতার প্রতিও কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ ও সদ্ব্যবহারে বক্র। হায়, আমাদের কি দুর্দ্দশা! আমরা স্ত্রীবশে এতই ভুলের মধ্যে পড়িয়া থাকি যে, কি করিতে কি করি, কি বলিতে কি বলি, কিছুই ঠিক্ থাকে না। যেন মদের নেশায় একটা কিছু করিয়া বসি। বলিতে কি, সামান্য একটা কথা এখন যাহা মুখে বলি, হয়তো দুই মিনিট পরে পত্নীর চিত্র-চিত্তদর্পণে তাহা উল্টাইয়া ফেলি। যাহাকে যে ভাগ প্রদেয়, তাহাকে

তাহাতে বঞ্চিত করি; মনে করি, আমাদের যাহা লব্ধ করায়ও ধনদ্রব্যাদি সমস্তই স্ত্রীভোগ্য। এই স্ত্রৈণবৃত্তির উৎস কোন্ গুহায় ফুটিয়াছে তল্লাস করিয়া দেখা যাউক্। একটা চাক্‌রী হইলেই, ভাগ্য মানি, সব পরিহরি, কেবল স্ত্রীটিকে মানি-ব্যাগের মত পকেট করি। পত্নী দৈনন্দিন সহচরী থাকেন, পিতামাতা এবং সন্তানেতর বন্ধুবান্ধব জনাত্মীয় দূরে থাকেন। সুতরাং দীর্ঘ অদর্শন দরুণ এবং সেবাদির রাহিত্যে তাহাদের প্রতি স্বতঃই ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহবাৎসল্যটা না দিন দিন শিথিল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে পত্নী এবং পুত্রকন্যার প্রতি সতত সান্নিধ্য সম্ভাষণ, আলাপন সোহাগাদি বশতঃ একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি। এই অভিনিবেশ হইতে ঘোর মোহ আসিয়া আমাদিগকে কবলিত করে। এই পত্ন্যভিনিবেশ নিবন্ধন প্রতিবেশী মধ্যে আমাদের পরস্পর সহানুভূতির লাঘব ঘটিতেছে। আমরা অতি সহজে অজ্ঞাত-সারেই কর্ত্তব্য হইতে অতিদূরে অপসৃত হইয়া ভ্রষ্টমার্গে গতিবিধি করিতেছি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই গেল সম্বন্ধযুক্তা যোষিদ্‌বিষয়িণী আমাদের পারদর্শিতা।

বর্ত্তমান যুগে বহুগ্রন্থগ্রাস লোকের একটা রোগ—ভবরোগের বড় রোগ। বাল্যকালেই বালকগণের অনেকে সদভিভাবকের শাসনদৃষ্টির অভাবে কুৎসিত গ্রন্থের উদ্‌গারিত বিকটরসের প্রবাহে ডুবিয়া যায়। তদ্ভাবাবলীর প্ররোচণায় বাসনাপ্রণোদিত হইয়া লোক অসৎসঙ্গ বিনাও লিপ্সা দ্বারা সতত যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে। অসংযতা রমণীর আলুথালু কেলিকাহিনীর পাঠ, রূপযৌবন-হাবভাবস্পর্দ্ধার আলোচনা, নৃত্যসঙ্গীতোপভোগ এবং চিত্র বা ফটোর নিয়ত সন্দর্শন—এসব দ্বারা বাল্যকালেই আমরা বিলাসী এবং যোষিৎসঙ্গী হইতেছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা শিক্ষিত জ্ঞানী হইয়াও স্ত্রীবশ্যতাবশতঃ অধিকস্থলে স্বাধীনতা হারাই কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতেছি। স্ত্রীসেবাবশে পুরুষের প্রাণ, উৎসাহ, উদ্যম, সব বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অযোগ্য অসাধ্য আবদার-রক্ষণী দুশ্চিন্তায় আমরা তপ্ত ও ক্ষীণ হইতেছি। তাপস্পর্শে চিত্তের কোমলতা মধুরতা বিলুপ্ত হয়, অতঃপর তদবস্থায় চিত্তে ধর্ম্মকুসুম ফুটেনা। কারণ ওসব জঞ্জালবশতঃ চিত্ত নিতান্ত সংকীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম-প্রাণতা ও পরার্থতা এককথা। পত্নীসেবাসন্তোষনে এবং এই আবিলতাপূর্ণ ভাবপ্রণোদনায় আমরা অধিক ঘামাই এবং এইভাবে নিত্যানন্দকৃপায় বঞ্চিত হইয়া নিরানন্দের বিষজলে ডুবিয়া মরি। বিবাহ নিন্দনীয় নয়। অত্যভিনিবেশ

বরণীয়। কৃষ্ণসেবার সাহায্যে বিবাহ এক উত্তম যোগ। তাই বলি আসুন্ আমরা সকলেই আদি ব্রহ্মচারী আদি ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ করি!

শ্রীকালীশ্বর দাস বসু।

কে তুমি?

—ঃ*ঃ—

জিজ্ঞাসি কে তুমি এই শ্মশানশয্যায়?
জ্বলন্ত অনলরাশি, চৌদিকে লয়েছে গ্রাসি'
ভস্মরাশি করিবারে আজিকে তোমায়।
জিজ্ঞাসি কে তুমি এই শ্মশানশয্যায়?
কৈ তব প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন।
পত্নী পুত্র কন্যা নাতি, ভ্রাতা ও ভগিনী জ্ঞাতি
কৈ সে অভিন্ন আত্মা সখা সখিগণ?
ভালবে'সে ছিল যারা প্রাণের মতন।
না তারা সকলে মিলে তোমারে পোড়ায়?
জলন্ত চিতায় তুলি, "হরি হরি হরি" বলি
আজ বুঝি দিয়া যায় অনন্ত বিদায়!
জিজ্ঞাসি কে তুমি এই শ্মশানশয্যায়?
অর্দ্ধদগ্ধ দেহ তব বিকৃত আকার!
নিরখি বিদরে বুক, শুকায়ে উঠিছে মুখ
কি জানি হয়েছে কেন ভয়ের সঞ্চার!
কে ভাবিছে "হেনদশা হইবে আমার"?
ভবকারাগারে ছিলে মায়ার বন্ধনে,
দিন রাত অবিরত—বেগারি খে'টেছ কত
ভাবিয়াছ মুক্তি বুঝি পে'লে এত দিনে?
মরিলেও মুক্তি নাই কৃষ্ণভক্তি বিনে।
একাকী চ'লেছ সঙ্গে কেহ নাহি হায়,
সম্পদের সাথী যারা, নয়ন তুলিয়া তারা

এখন তোমার দিকে ফিরিয়া না চায়!
জিজ্ঞাসি কে তুমি এই শশ্মান শয্যায়?
সসাগরা পৃথিবীর তুমি অধীশ্বর?
মহারাজ চক্রবর্ত্তী, হৃদয়ে কতই স্ফূর্ত্তি
রাজ্য ছাড়ি চলিয়াছ আজি একেশ্বর!
অর্থেও মিলে না বুঝি সঙ্গের দোসর?
বহুদিন হে রাজন! ভাব নাই মনে,
সংসারমায়ার খেলা, কেবল স্বপ্নের মেলা
অবশ্য মরিতে হবে বিধির বিধানে,
এদেহ হইবে ভস্ম চিতার আগুনে।
দু'দিনের তরে স্নধু সেজেছিলে রাজা,
কে রাজসিংহাসন, কৈ রাজ-আভরণ—
কৈ রাণী দাস দাসী অগণন প্রজা?
রাজারো কপালে হায় শেষে এই সাজা!
কৈ তব অতিশুভ্র শয্যা স্নকোমল?
যাহা সাজাইত দাসী, আনিয়া কুস্নমরাশি
সৌরভে হইত কত ভ্রমর পাগল,
পরিণামে অগ্নিশয্যা তাহার বদল!
সংখ্যাহীন সৈন্য তব এখন কোথায়?
দিগ্বিজয়ী মহারথী, কৈ সেই সেনাপতি?
পারিল না মহারাজ রক্ষিতে তোমায়!
তাব সম যোদ্ধা না'ক নাই বসুধায়?
নাকি তুমি রাজা নও কুলীন প্রধান?
হায় রে, কেমন ভুল, এখন কোথায় কুল
এখন কোথায় সেই সমাজে সম্মান?
না বুঝিয়ে ক'রেছিলে কত অভিমান!
কুলের গৌরবে তব স্ফীত ছিল বুক
কারে করি অপমান, কারে করি তুচ্ছ জ্ঞান
মনে মনে পে'তে তুমি কতই না সুখ।
আজি হ'তে ফুরাইল তোমার সেটুক!

নাকি তুমি ধন-মদে গর্ব্বিত কৃপণ?
ভিক্ষুকে না ভিক্ষা দিয়া, নিজে কিছু না খাইয়া
জমা'য়েছ বহু অর্থ যক্ষের মতন
এখন রাখিয়া যাও কোথায় সে ধন?

নাকি তুমি দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রবর?
বহুবিদ্যা শিক্ষা করি, 'বিদ্যারত্ন' খ্যাতি ধরি'
বিদ্বান সমাজে কত পে'য়েছ আদর,
সে বিদ্যার দশা এই হ'ল অতঃপর!

না তুমি সুন্দরী? কৈ সৌন্দর্য্য তোমার?
সে দেহ-লাবণ্য নাই, পুড়িয়া হ'য়েছে ছাই
যে দেহে পরিতে কত স্বর্ণ অলঙ্কার,
দুটা দিন ক'রেছিলে বৃথা অহঙ্কার।

পথের কাঙ্গাল ও [illegible] দান হীন?
গর্ব্বিত ধনীর দ্বারে, মুষ্টি ভিক্ষা বারে বারে
চাহিতে হবে না আর কোন দিন,
সবারি যে দশা [illegible], তার এক দিন।

পোষিবারে নিজ দেহ পুত্র পরিবার
বহু কষ্ট পে'য়েছ বটে, ভাবি নিজ অদৃষ্ট
নিশি দিন করিয়াছ কত হাহাকার,
সেই দুঃখ তাপ এবে জুড়াল তোমার।

সংসারের ছোট বড় মূর্খ গুণবান
ধনী মানী আছে যত, অভিমানে উন্মত্ত
সমানে সবেই হবে তোমার সমান,
সকলেরি শেষশয্যা জ্বলন্ত শ্মশান।

তোমাকে দেখিয়া ভাবি আপন উপায়
এই যদি পরিণাম, তবে কেন হরিনাম
না করিনু সাধু-সঙ্গ হায় হায়,
একদিন শো'ব যদি শ্মশান-শয্যায়!

২

সেই তুমি হও কিন্তু দেখিয়া তোমায়
লভিয়াছি এই সার, শুধু কৃষ্ণ নাম সার
চির দিন কেহ নাহি রবে এধরায়
সকলেরই যে'তে হবে শশ্মান-শয্যায়।

অনিত্য বিষয়বাঞ্ছা নাহি আর মনে
ধন রত্ন পুত্র নারী, যাইতে হইবে ছাড়ি
যদি একদিন, তবে কিসের কারণে—
"আমার আমার" ক'র মরি নিশি দিনে ?

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি।
সহিলপুর ময়মনসিংহ।

গুরু শিষ্য সংবাদ।

—:*:—

(২)

শিষ্য। এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর জপ সম্বন্ধে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কি অন্য সম্প্রদায়ের সাধক মধ্যে জপের বিধান আছে ? সাধারণতঃ বড় দেখা যায় না।

গুরু। এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর সকল সম্প্রদায় মধ্যেই জপের বিধান আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে অনুরূপ ষোলনাম বত্রিশাক্ষর জপও করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থবিচার করিলে উভয় মন্ত্রই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

শিষ্য। প্রভু! কৃপা করিয়া এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন

গুরু। এই মহামন্ত্র ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের অর্থের আমি আর কি ব্যাখ্যা করিব, আমার সে শক্তি কোথায়? শ্রীহরির নামের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। তবু যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ তখন আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যৎটুকু বুঝিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। ষোলনাম বত্রিশাক্ষর যথাঃ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মধ্যে তিনটী নাম আছে। যথা—হরে, কৃষ্ণ, রাম। এক্ষণে ঐ নামত্রয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা যা'ক্। হরে (হৃ×অন) হর। হর অর্থে যিনি জগতের অশুভ অর্থাৎ পাপ হরণ করেন। এই হরশব্দের স্ত্রী লিঙ্গে 'হরা' শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং 'হরা' শব্দ সম্বোধনে 'হরে' হইয়া থাকে। হরি শব্দের সম্বোধনেও হরে পদ নিষ্পন্ন হয়। হরি শব্দও (হৃ×কর্ত্তৃ ই) প্রত্যয়ে সম্পাদিত।

কৃষ্ণ (কৃষ×কর্ত্তৃ ণ) কৃষ্ণশব্দের প্রতিপাদ্য যথাঃ—

"কৃষের্ভূর্বাচকশব্দো নশ্চ নিবৃত্তিকারকঃ।
তয়োরৈক্যং পরম্‌ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

অর্থাৎ যিনি জগৎকে আত্মপক্ষে আকর্ষণ করেন ও সর্ব্বকারণের কারণ পরমব্রহ্ম। রাম (রম×অধি ঘঞ) রাম অর্থে যিনি জগৎকে রমণ অর্থাৎ মোহন করেন, রঞ্জন করেন তিনিই রাম। এক্ষণে সমস্ত বাক্যের সংযোজনে কিরূপ অর্থ হয় দেখা যা'ক্। হে হরে হে হরজায়ে ত্বং কৃষ্ণ। হে হরি ত্বং কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, প্রথম কৃষ্ণ দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিশেষণ, অর্থাৎ যিনি জগৎকে নিয়ত আত্মপক্ষে আকর্ষণ করেন এবম্ভূত কৃষ্ণ তুমি হরজায়া, তুমিই হরি।

হরে রাম হরে রাম, হে হরজায়ে ত্বং রাম। হে হরি ত্বং রাম। রাম রাম হরে হরে, প্রথম রাম দ্বিতীয় রামের বিশেষণ—অর্থাৎ যিনি জগৎকে নিয়ত রমণ করেন এবম্ভূত শ্রীরাম তুমিই হরজায়া, তুমিই হরি। এই অর্থে দেখা যায় পুরুষ প্রকৃতি অভেদ। সাধক সম্প্রদায় মধ্যে কেহ পুরুষ দেবতা, কেহ প্রকৃতি, কেহবা পুরুষপ্রকৃতি উভয় দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন। ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় পুরুষপ্রকৃতি অভেদ, সুতরাং যে পুরুষ সেই প্রকৃতি বা যে প্রকৃতি সেই পুরুষ,—মূলে অভেদ। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। এই জ্ঞানের সাধনই সমন্বয় ধর্ম্মের মূলভিত্তি বলিতে হইবে, এবং এইরূপ সাধনই মুক্তির একমাত্র কারণ।

শিষ্য। গুরুদেব! ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের যে ব্যাখ্যা করিলেন ইহা সমন্বয় পক্ষে উত্তম ব্যাখ্যা, কিন্তু ইহা আপনার পাণ্ডিত্যপ্রসূত না কোনরূপ শাস্ত্রে উপদেশ আছে? জানিতে বাসনা করি।

গুরু। বৎস! ইহা কিছুই স্বকপোল কল্পিত নহে। শাস্ত্রে আছে যথা:—

"যা দুর্গা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণ শিব এব সঃ।
অভেদেন স্মরেৎ যস্তু তস্য মুক্তিরদূরতঃ॥
কৃষ্ণা কৃষ্ণে অভেদোঽস্তি ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ।" (ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র)

যাঁহারা শক্তিমন্ত্র উপাসক তাঁহারা হরে শব্দে হরজায়া দুর্গা অর্থ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ ঐ হরে শব্দে শ্রীরাধা অর্থ করেন। হরি হর অভেদ। "হরি-হরয়োঃ—প্রকৃতিরেকাপ্রত্যয়-ভেদাৎ ভিন্নভাবোঽস্তি।" যখন হরি-হর অভেদ, তখন হরশক্তি এবং হরিশক্তিও অবশ্য অভেদ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার শাস্ত্র-প্রমাণও আছে। যথা:—

"যা দুর্গা সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ॥
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ।" (ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র)

এই পুরুষ-প্রকৃতি মিলনমন্ত্র ও পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত শ্রীবিগ্রহই সমন্বয় ধর্ম্মের প্রকৃত সাধ্য-সাধন বুঝিতে হইবে। এই শ্রীবিগ্রহটি কে, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যা'ক্। শ্রীচরিতামৃতকার বলেন:—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঁই,
রস আস্বাদিতে দোঁহে হেন এক ঠাঁই।

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই এই মহামন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা। সমন্বয়-ধর্ম্ম যেমন সর্ব্বধর্ম্মসার সেইরূপ—

সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।

নিত্য শাশ্বত জগৎগুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শরণাগত হইলে ধর্ম্ম-সমন্বয়-তত্ত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিয়া নিত্য নিত্যানন্দসাগরে ভাসমান হইবে। কলির জীব এই অমৃতময় সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াও হেলায় যে উপেক্ষা করিতেছে ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়তত্ত্ব-স্বরূপ নিত্য নিরঞ্জন জগদেকশরণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাহাদের মঙ্গল বিধান করুন। জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ!! জয় গৌরাঙ্গ!!!

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী, (মাহিগঞ্জ)

বিজয়ের পুত্রোৎসব।

—০:*:০—

সাত নয় পাঁচ নয় একটী তনয়,
সেও এ সংসার হ'তে হইছে বিদায়।
পুত্রমুখ চে'য়ে আছে জনক বিজয়,
সম্বরি রাখিতে শোক পারিলনা মায়।
ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত ছাড়িয়া ডুকার,
আছাড় খাইয়া পড়ে পতিপদতলে!
বিজয় করিছে তারে কত তিরস্কার,
পৌছে কি তা মায়াময়ী মাতৃ-অন্তঃস্থলে?
সে দেখে উহাতে আছে মিশে পঞ্চপ্রাণ,
কেমনে উহার মায়া করে পরিহার?
বহুপুণ্যে পাইয়াছে বিধাতার দান
একটী সোণার কলি শিশু সুকুমার।
হায়রে, কৃতান্ত যদি বুঝিত বেদন
কখনই করিত না এমন ডাকাতি!
এত গো অন্ধের যষ্টি, দরিদ্রের ধন,
হারা'লে দহিবে যে গো প্রাণ দিবারাতি!
কিন্তু কে শুনিবে বল কাতর বিলাপ?
এ পৃথিবী ধ্বংসেরই মহা ক্রীড়াস্থলী!
কি লাগি দুঃখিনী তুমি কর 'বাপ্ বাপ্'
মৃত্যু না রহিবে তাতে স্বকর্ত্তব্য ভুলি।
ঐ যে অন্তিম শ্বাস উঠিল ঘনা'য়ে
বিজয় লইল তারে কোলেতে উঠায়ে।
এ ধৈর্য্য থাকিতে পারে কভু কি সে মায়ে?
অঝুর নয়নে কাঁদে ধরণী লুটা'য়ে।
বিজয় ক'হিছে "প্রিয়ে ধর্ম্ম পত্নী হ'লে
রোদন সম্বরি' চল তুলসীতলায়।
দৈবের লিখনে প্রিয়ে, পুত্র কারো ম'লে
সেকি ইষ্টানিষ্ট কথা সব ভুলে যায়?

হরিবোল হরিবোল কোথারে 'ঈশ্বর',
কোথায় রহিলে 'শশী' নীরবে বসিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতে তোরা সঙ্কীর্ত্তন কর,
লঙ্ঘিবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অনুজ হইয়া ?
আয় আয় ল'য়ে আয় খোল করতাল,
এমন সুখের দিনে শোক কেবা করে ?
তুলসীর মূলে চল সকাল সকাল
দেখিবে সে নামে আজ কি শান্তি-বিতরে।"
যেই কথা সেই কাজ হ'ল আবস্তন
মৃতপুত্র ল'য়ে অই নাচিছে বিজয় !
চালল তুমুল ভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
দেখিয়া মৃত্যুও বুঝি মানিল বিস্ময় !
পৌছিল আনন্দবার্ত্তা প্রতি ঘরে ঘরে
কে আর থাকিতে পারে প্রাকৃত জগতে ?
বিজয় মে'তেছে আজ মহা প্রেম-ভরে,
সবেই আসিয়া যোগ দিল সেই ব্রতে !
কভু কাঁধে কভুঁ পিঠে লইয়া কুমারে
বিজয় কহিছে শুধু "জয় জয় জয়।"
ক্ষণ পরে বাহিরিলা নগর কীর্ত্তনে
জানে না সে পুত্রশোক কারে লোকে কয় !
পূজার নৈবেদ্য যেন পাইয়াছে হাতে,
তাই সে অপূর্ণ সাধ পূর্ণ ক'রে লয়।
কেবল দেখিতে হবে শ্রীগুরু কৃপাতে
মানুষের প্রাণ মন কত উচ্চ হয় !
শ্মশানে শোয়া'য়ে পুত্রে মুছিলা নয়ন,
বুঝিলা জননী, উহা মৃত্যু নহে তার।
প্রভুর চরণ তলে ক'রেছে শয়ন
বহা'তে "সহিলপুরে" অমৃতের ধার !
হে গৌরাঙ্গ, এ তোমারি প্রেমের পল্লব
ভাগ্যবান্ বিজয়ের প্রিয় পুত্রোৎসব ! !

তত্ত্ব-কথালাপ।

—:*:-

১। বিজয়।—কৃষ্ণলীলাপেক্ষা গৌরলীলা আমার অতি মধুর লাগে কেন? ইহাতে আমার কোন অপরাধ হয় কিনা?

কালীবর।—কৃষ্ণলীলাপেক্ষা গৌরলীলা মধুর লাগে; বেশ, লাগুক্। অপরাধের কথা এতে কিছু নাই। কৃষ্ণলীলার এখনও আস্বাদন হয় নাই। আস্বাদিত হইলে মধুর লাগিবে।— প্রকারান্তরে তাহারই আস্বাদন।

কৃষ্ণলীলা মধুর, তাই গৌরলীলা মধুর। তুমি যে গৌরলীলা-মাধুরী চাখিতেছ, উহা কৃষ্ণলীলারই। এই গৌরলীলায় ডুবিতে ডুবিতে দেহভেদস্ফূর্ত্তি পাইবে। মধুসিন্ধুর সবই মধু, মধুর। এখনও মধুর, ডুবিতে ডুবিতে শেষেও যুগল-মধুর!!

কাহারও গৌরলীলার গৌরমূর্ত্তি এতস্ফূর্ত্তি পায় যে সে যুগল রাধাগোবিন্দলীলার ভাবের বিষয় ভুলিয়া যায়। তোমার সে দশা। মূলকথা তুমি সেই ব্রজের ভাবেই আছ।

গৌরমূর্ত্তিতে যখন নীলপীত দুটি স্ফূর্ত্তি পায়, তখন পাকা হইল। রায় রামানন্দকে দিয়া নিদর্শন। তখন সখি-সমাজ খোলে। সখি-সমাজ মধ্যে নিজকে দেখিলেই জানিবে সেটিও তোমার সখিমূর্ত্তি। রস উথলে। খেদ করিবার নাই। এ তত্ত্ব সে তত্ত্ব অভিন্ন।

গৌরলীলা সহজ-মধুর, কৃষ্ণলীলা গাঢ় গূঢ়-মধুর। কৃষ্ণলীলা জীবে চাখাইতে গৌরলীলা প্রকাশলীলা। প্রকাশ বা তরললীলায় মন সহজে বেশী মজে। এলীলা তরল, বড় গম্ভীর!

২। বিজয়।—পুরাণাদির পাঠে কি সাধুসজ্জনের মুখে শুনিয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীধামের যে একটি মনোমুগ্ধকর অপ্রাকৃত প্রতিকৃতি হৃদয়পটে আপনা-আপনি অঙ্কিত হইয়া পড়ে, প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই কল্পিত ধামের তুলনায় যথার্থ ধামটি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। তখন দালান, কোঠা, বাজার, বন্দর দেখিয়া, লোকমুখে বৈষয়িক কথাবার্ত্তা শুনিয়া, মন কেমন হইয়া উঠে। মনে হয়, হায়, কি হইল! না আসিয়া ভাল ছিলাম, আসিয়া আমার

বুকে আঁকা সাধের শ্রীধামটি হারাইয়া গেলাম। এবার শ্রীধাম নবদ্বীপ গিয়া আমার এই দশা হইয়াছে।—ইহার কারণ কি ?

কালীগুর।—যে যে অবস্থা বা পদপ্রাপ্তির জন্য আকুল, তাহা পাইলে আকুলতা থাকেনা। তখন জীব সেই পদের অধিকারী হয়। সুতরাং এটি তাহার উন্নতাবস্থা।

তুমি নবদ্বীপের নিম্নে ছিলে, উঠিবার জন্য আকুল ছিলে। যখন উঠিলে, তখন তুমি নবদ্বীপের একজন। তখন অপর কোন ভাল জিনিষের অনুসন্ধানে ঘুরিবে।

আগে ব্রহ্মজ্যোতিতে কত আনন্দ হ'ত,—এখন সেই জ্যোতির অবস্থা তিক্ত বোধ হয়,—এ যে উন্নতি! সুতরাং আগে যত মিঠে বোধ হয়, সে অবস্থায় পৌঁছিলে তত মিঠে লাগেনা। তখন নব লালসার বিভোরতা আসে। পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ ধামে আগমনটীর মধ্যে তত মধুরতা থাকেনা। অনুরাগের ধর্ম্মে নব নব লালসার স্ফূর্ত্তি।

ধামে ধাম লুকান। প্রত্যক্ষ ভাবে ধামের দালানকোঠা সব চিন্ময় বোধ হয়। অর্থাৎ প্রকৃত ধাম যদি দৃষ্ট হয়, তবে অন্যরূপ দালানকোঠাময় প্রাকৃতধামের মধ্যেই চিন্ময় একটী ধাম অনুভূত হয়।

১। রসিক।—নির্গুণ গুণাতীত ও সগুণ—এ তিনের পার্থক্য কি ?

কালীগুর।—"মহাপ্রভু, নির্গুণ পরমেশ্বর পতিতপাবন।" হরিনামে কৃষ্ণনামে যে নয়নকোণ দিয়া অশ্রুবিন্দুটুকু চুয়ায়, উহাও নির্গুণ অর্থাৎ মায়াতীত। মায়ার রাজ্যের এ বিন্দুটুকু নয়। ভজন কুঠরীর ভাব সবই নির্গুণ দেখি। সুতরাং শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ মহাপ্রভু মানুষ হইয়াও নির্গুণ। পাপী উদ্ধার করা মায়ার কার্য্য নয়, বিশেষতঃ প্রেমদান, মায়াতীত শক্তির লীলা,—উহা নির্গুণ। আমি ভক্ত শ্রীরাধামাধবের (বর্দ্ধমান মানকরের সিদ্ধ ভক্ত) সহিত একমত হই। (নির্গুণ=মায়াতীত=সগুণ)।

নির্গুণ।—ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই,—এই জগৎও ব্রহ্মই। পূর্ণ বা সর্ব্বাংশে ব্যক্ত বলিয়া গৌর নির্গুণ। ব্যক্ত হইলে ব্রহ্মকে ব্রহ্মই বলি। ব্রহ্মের যেটুকু অব্যক্ত তাহাকে ব্রহ্ম না বুঝিয়া মাটি বা অপর কিছু বলি।

গুণাতীত।—যাহাকে গুণদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, নির্ম্মল ভজন-লভ্য মাত্র।

সগুণ।—ব্যক্ত ও অব্যক্তও—এই মিশ্রাবস্থ পৃথিবীকে মাটি বলি, কারণ

উহাতে ব্রহ্ম অব্যক্ত। ব্যক্ত হইলে মাটিও "ব্রহ্ম প্রতীয়তে"। উহাতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি নাই এমনও নয়।

সগুণ ভজন দ্বারা (বা অবস্থা হইতে) গুণাতীতে পৌঁছা যায়। তখন সর্ব্বাংশে ব্যক্ত দেখা যায়। যাহাকে নানা উপাধি দিয়াছিলাম, সে সবও ব্রহ্মই। ইহাই নির্গুণাবস্থা। সর্ব্বময় ব্রহ্ম হইতেই হৃৎকেন্দ্রস্থ অমৃতপুরুষ উদ্ভাসিত হন। জীবও নিজ চিন্ময়ত্ব ভিন্ন আর কিছু উপলব্ধি করে না। এই সম্বন্ধই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই সবই নির্গুণলীলা।

পুণ্যবান্ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, কামুক, স্বার্থপর,—তাহার নামই কি সেবা ত দূরে। অহৈতুকী রতি নয় যে, ঐ যশোলিপ্সামূলে অন্যান্য দুষ্টভাব চিত্তে আসে, সুতরাং অপরাধ হয়। এক যশোলিপ্সা—স্বার্থ গেলেই, সব দূর হয়, কোন অপরাধ ঘটেনা। এই কাম অপরাধসমূহের বীজ। এই বলিলেই হইল।

নির্গুণ যিনি, তিনই গুণাতীত, তিনই সগুণ। সুতরা অভিন্ন। সগুণ ও নির্গুণের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধটির নাম গুণাতীত। অর্থাৎ নির্গুণ। সগুণের অতীত। সগুণ নির্গুণকে পাইতে পারে না অতএব সগুণ পদার্থ গুণাতীত। প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা সগুণ, চরম নির্গুণ। (উপাসনাদি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক ইত্যাদি শ্রুতিঃ) আবার নির্গুণই সগুণ। সগুণ একটা পৃথক্ কিছু নয়। নিত্য গুণাতীত যিনি তিনি কি?—নির্গুণ। তবে বিবাদ কি? মায়া ও ব্রহ্ম। মায়া ও ব্রহ্ম, এই জ্ঞান নির্গুণ। চিত্তে প্রেমানন্দোদয় হইলে দেহটাও অমৃতময় হয় কেন? উহাও আদৌ পরমপদার্থ বটে। তখন দেহকে নির্গুণ বা "ভাগবতী তনু" বলা হয়। পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এখন প্রেমোল্লাসে উহার যথার্থ পরিচয় হইল। ইহাই নির্গুণাবস্থা। নির্গুণ দ্বারা প্রেমলীলা ধরিয়া যায়, এমন বলা ভ্রম।

২। রসিক।—"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" একি?

কালাচাঁদ। কৃষ্ণনাম—সিদ্ধাবস্থার। গৌরনাম—সাধকাবস্থার। আমি অজ্ঞান মূর্খ, গৌরনাম করিয়া শিক্ষালাভ করিব; আমি মূর্খ, আমার অপরাধ কি? পণ্ডিতের সে অপরাধ। খুব নাম কর, নাম গাও, চৈতন্য হও; চৈতন্য হও কিন্তু সাবধান! চৈতন্য না হয়ে কৃষ্ণনাম করিওনা, কৃষ্ণ বা যুগল ভজিওনা। সাবধান! সাবধান! চৈতন্য হও, নচেৎ বিভ্রাট ঘটিবে। সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যুগল-ভজন নিষ্কামের জন্য। গৌরনাম প্রেমনদীয়ার সাধকাবস্থা, কেবল শিক্ষা।

ছাত্রাবস্থা, তখন অপরাধ নাই। কিন্তু পণ্ডিত হইয়া, পাশ করিয়া ব্রজের Arts রসবিদ্যায় প্রবেশ কর, তখন ভুল হইলে বিপত্তি—রসভঙ্গ।

৩। রসিক।—রাঙ্গা পায়ের মহিমা কীদৃশ ?

কালীহর।—শ্রীপাদপদ্মই মাধুর্য্যের উৎস। পাদপদ্মপানে চাহিতেই, যাঁর পাদপদ্ম তাঁর মূর্ত্তি ফুটে, সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন ও কৃষ্ণদর্শন পরিণামসূত্রে এক কথা।

৪। রসিক —"জ্ঞানবিশেষের নাম প্রেম।" (শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১ম সংখ্যা) —ইহাই কি ঠিক্ ?—একটু খুলিয়া লিখিবেন।

কালীহর।—ভাই রসিক, তুমি, দেখিতেছি, তত্ত্বখনি-গহ্বরে বড়ই নামিয়া পড়িলে! তুমি যে সব নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনা করিতেছ, এ সবে তোমার অধিকার ও সূক্ষ্মদর্শিতা ব্যক্ত হইতেছে। এ সবের মীমাংসা সাধারণে প্রচারিত হইলে জগতের কল্যাণ ঘটিবে। তোমার প্রশ্নাবলীর পাঠে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। কিন্তু অধমকে কেন? এরণ্ডমূলে আম্রফলের আশায় তাকাইলে বঞ্চিত হইতে হয়। যিনি কেবল শাস্ত্রবলে সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, এমন পণ্ডিত মূর্খ। যিনি স্বতন্ত্রভাবে মীমাংসা করিতে চাহেন, তিনিও মূর্খ। পণ্ডিত এবং মীমাংসক এক তিনি যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান-তণ্ডুল ফোঁয়ারার জলে সিদ্ধ হইয়াছে। এমন নিরভিমান, বা কাঙ্গাল বা গুপ্তধনের ধনী মিলে কৈ ? তাই তত্ত্বাদি-কোবিদ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদসরোজদলপ্রান্তে বসিয়া কাঁদ কাঁদ। তিনিই সকল মীমাংসার একমাত্র মীমাংসক। সেই ফোঁয়ারার জলে সত্যসুবর্ণরেণু সব অবতীর্ণ হয়। ফোঁয়ারার মূলোৎস জগদ্গুরু শ্রীভগবান্। তবে তিনি নিজ করুণাগুণে কাহার কণ্ঠে কতক্ষণ বসেন সে তত্ত্ব জীবের অনধিগম্য উত্তর দিবার ওরূপ কোনটি আমার নাই ; তবে ভক্তমুখপদ্মনিঃসৃত প্রশ্নমধু শ্রোতার প্রাণচক্ষুতে অমৃতসেক দেয় অর্থাৎ প্রশ্ন নিজেই কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া বদ্যাশক্তি দ্বারা শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করে। এই ভাগ্যবলে বলীয়ান্ ও উৎসাহিত হইয়া উত্তরচ্ছলে দুচারি কথা বলিবার পিপাসা জন্মিয়াছে।—

জ্ঞানবিশেষের নাম প্রেম নয়, জ্ঞানবিশেষের পরিণাম প্রেম। "নাম" স্থলে "পরিণাম" বলিলে যেন ঠিক হইত। "জ্ঞা" ধাতু হইতে "জ্ঞান"—জানা। "জ্ঞানবিশেষ" শব্দে অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্বাবগতি বুঝায়। এই অবগতির পর ভগবৎসম্বন্ধ বর্দ্ধিত প্রেম দাঁড়ায়। সুতরাং প্রেম জ্ঞানবিশেষের নাম নয়, পরিণাম। সেই পরিণামকে জ্ঞান অভিহিত করিলে, ওকথা মানিয়া

নিতে হয়। কিন্তু তাহাতে দোষস্পর্শ দৃষ্ট হয়। কারণ, জ্ঞানের আস্বাদন স্বানু-ভাবানন্দ মাত্র। কিরণামৃতসমুদ্রে হারাইয়া যাওয়ার নাম জ্ঞান। এই অবস্থাকেও প্রেম বলা যাইতে পারে। কারণ, এই মধুময় আত্মস্রোতে পড়িলে মানুষ আর উঠিতে চাহেনা, অতঃপর পারেনা। তথাপি দুটি বিভাগ থাকা আবশ্যক। জ্যোতির সাক্ষাৎকার (as they appear) জ্ঞান। জ্যোতির স্বরূপের (মনু-ষ্যের) সাক্ষাৎকার (as they are) প্রেম। মানুষে মানুষে যে সাক্ষাৎকার তাহা এক বিশেষজ্ঞান বা প্রেম। প্রেমকে জ্ঞান উপাধি দিলে দোষ থাকে কি? "জ্ঞান" সংজ্ঞার অর্থ বাড়াইয়া দাও, বাড়িবে। এতো মানুষের হাতে। তবে যে ভাবে জ্ঞান সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়, তাহাতে জ্ঞানে স্বানুভাবানন্দের অতিরিক্ত উজ্জ্বলরস-সম্ভোগাদি অভিব্যক্ত হয়না।

৫। রসিক।—পতির সেবা ছাড়া পত্নীর অপর কোন সেবার প্রয়োজন আছে কি না? পতি-সেবিকার গতি কতদূর পর্য্যন্ত?

কালীহর।—বহুপূর্ব্বে "নিবেদন" পত্রিকায় এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া-ছিলাম। পতিসেবা করিতে করিতে পত্নীর বুকে এক অপার্থিব ভালবাসা বা প্রেম জন্মে। পরস্পরে সম্মানের ভাব আসে। পত্নীতো পতিকে পূজার চক্ষে দেখেন, পতিরও পত্নীর প্রতি তদনুরূপ হয়। তখন ইতরভাব একেবারে দূর হইয়া যায়। ইতরভাবের কথা মনে করিতেও লজ্জা যেন মজ্জাগত হয়। দাম্পত্য প্রেমফলে মানুষ এইভাবে নিষ্কাম (ব্রহ্মচারী) হইয়া বিশুদ্ধজ্ঞানে পৌছে অর্থাৎ পতিও পত্নী হইয়া দাঁড়ায়, পত্নীতো পত্নী আছেনই। বিবাহের উদ্দেশ্য ইতর প্রেম নয়। অতঃপর উভয়ে সখিভাবে কৃষ্ণসেবায় নিরত হন। এ গেল অতি বড় উচা কথা।—রাধার রাজ্য! পতিকে পতিজ্ঞানে পূজা করিয়া পত্নী পরজন্মেও তাঁহাকে সেই ধ্যানসূত্রে পতি পান! কিন্তু পতিতে জগৎপতি কৃষ্ণবোধ থাকিলে, পতিসেবায় কৃষ্ণসেবা হয়। সুতরাং পত্নী পরজন্মে কৃষ্ণভার্য্যা লক্ষ্মীর গণে প্রবেশ করেন। পতিসেবা কৃষ্ণসেবার দীক্ষাশিক্ষা। পতিকে কৃষ্ণজ্ঞান করিতে গেলেই, পতির অতীত আর একজন উত্তম পুরুষের ধারণা থাকে। এই ধারণা দ্বারা কৃষ্ণরতি জন্মে। পত্নীর প্রাণ তখন উভয়কে এক করিয়া ফেলে। কৃষ্ণ পতিতে, পতি কৃষ্ণে, স্ফূর্ত্তি পায়। বিধবার পক্ষে পতি কৃষ্ণে।—লক্ষ্মীর রাজ্য!

৬। রসিক।—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"—এখানে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে?

কালীহর।—অমুক শিষ্যটিকে প্রহার করা তোমার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য, তখন তুমি যদি হরিদাস হইয়া বস, চলিবে না। হরিদাসের জন্য যে ব্যবস্থা তোমার জন্য তা নয়। শিষ্যটিকে দণ্ড করিলে কালে বা তুমি হরিদাস হইতে পার, কিন্তু ওরূপ অকর্ম্ম দ্বারা হইতে পারিবে না। ফুল-দলে ঠাকুর পূজা করা তোমার ধর্ম্ম কারণ ইতোঽধিক তোমার অধিকার জন্মে নাই। এমতস্থলে এক মহাত্মাকে তুমি দেখিলে তিনি ওরূপ করেন না বরং ফুল-দলে কি হইবে উক্তি করেন। তখনই তুমি সেই দৃষ্টান্তবলে ঠাকুর পূজা বন্ধ করিলে এবং মনে করিলে আমি একজন হইয়াছি, এতে তোমার সর্ব্বনাশ হলো যে। তুমি ঠাকুরপূজা ছাড়িয়া সে মহাত্মার মত উঠিতে পারিবে না। ফুল-দলে ঠাকুরপূজা করিয়াই উনি মহান্ হইয়াছেন, অবসর পাইয়াছেন। দেখ, ফুলে দলে পূজা এখন তোমার স্বধর্ম্ম, কারণ তুমি সেই অবস্থারই চাব, ফুলে দলে পূজা না করা সেই মহাত্মার স্বধর্ম্ম। ফুল-দলে পূজা ছেড়ে দিবে তুমি যা এক টা আরম্ভ করিলে এইটা তোমার পরধর্ম্ম, পরের বা অন্যের ধর্ম্ম (বা পরবর্ত্তী ধর্ম্ম)। উহা তোমার নিজধর্ম্ম নয়। প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন এখন যেটি পরধর্ম্ম কালের গতিতে সেটি স্বধর্ম্মে দাঁড়ায়। আবার সেটি স্বধর্ম্ম কালে সেটি পরধর্ম্ম হয়। তোমার দেশে এখন ভোর, ক্রমে সন্ধ্যা আসিবে। অন্যত্র সন্ধ্যা, ভোর হইবে। তুমি এখন এমনি অধিকারী যে তুমি শ্রীগৌরাঙ্গনামে পাগলপারা, উন্মাদগ্রস্ত আছ, তখন তুমি যদি সেই ভাবের নেশায় থাকিয়াও, প্রাণবল্লভকে প্রাণে পাইয়াও লোকসঙ্গে অন্য দেবতা দেখিয়া প্রণাম কর, তখন সেই প্রণাম তোমার পরধর্ম্ম, ঐ শ্রীমূর্ত্তি, সেই গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি হইলেও অন্য দেবতা গণ্য। এই তোমার অধোগতি, ভাবের ছুট, সুতরাং ভাবান্তর। কারণ ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক শিখেছিলে, তা ভুলিলে আবার তোমাকে যোগ বিয়োগ করিতে হইল। ভয়াবহ নয় কি? স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কোন ধর্ম্মবিশেষের সংজ্ঞা নয়, অধিকার ও অনধিকার সূচক মাত্র।

এই বাড়ীতে যখন "আমার জ্ঞান" আছে, তখন অতিথি আসিলে অভ্যর্থনা আমার স্বধর্ম্ম, না করা পরধর্ম্ম। কারণ মনে কর, এমন ব্যক্তিও আছেন, তাঁহার বাড়ীতে অতিথির আগমন হইল, কিন্তু তাহার "আমার জ্ঞান" নাই। সুতরাং তিনি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন না। সকলেই একটা না একটা স্থানে আসে যায় বা থাকে, অভ্যর্থনা কেন? না, "আমার জ্ঞান"। এ ব্যক্তি অভ্যর্থনা করিলেন না বলিয়া তাঁহার প্রত্যবায় নাই। কারণ, এই বাড়ীতে

তাঁহার "আমার জ্ঞান" নাই। দেখ, অতিথিকে আদর না করা তাঁহার স্বধর্ম্ম: কিন্তু এইটি আমার পরধর্ম্ম। তাহার ধর্ম্ম আমি আচরণ করিলে ভয়াবহ পরধর্ম্মে ডুবিব। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা সব ব্যক্তিগত। ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত যাহা তাহা সর্ব্বগত।*

(ক্রমশঃ)

বিষ্ণুপ্রিয়ার খেদ।

(যখন) নামের কথাটী জাগিয়া উঠে ।
পরাণে সোয়াথ পাইনা মোটে ॥
কি কহিব সখি মরম কথা ।
হৃদয়ে দারুণ বিরহ ব্যথা ॥
অশন বসন না লয় মনে ।
হারায়ে প্রাণের শ্রীপতি ধনে ॥
বিয়ে ডব জব সতত তনু ।
বিরহ আগুনে পুড়িনা অনু ॥
দেহ মন প্রাণ [illegible] ।
আর কি [illegible] ?
ভাবিয়া ছিলাম [illegible] মনে ।
সোনার [illegible] ॥
কাল [illegible] ।
এবে দুঃখিনীর কি হবে গতি ॥
অনলে পশিব নতুবা জলে ।
গরল খাইয়া বাঁচিব ম'লে ॥
রাজচন্দ্র বলে ধরিয়া পদে ।
বুক ফাটে মোর তোমার খেদে ॥

শ্রীরাজচন্দ্র আচার্য্য ।
রামেশ্বরপুর, ময়মনসিংহ ।

---

* শ্রীমান্ রসিকলাল দে রাঙ্গাপানির ভায়ার অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত হইল।

কালীহর।

মাতৃ সেবা।

—:০:—

(২)

পশুপক্ষীর মা-তো আর জলপিণ্ড-প্রাপ্তির কি বার্দ্ধক্যে প্রতিপালিত হওয়ার প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সন্তানের উপর মাতৃস্নেহের অমৃতধারা ঢালিয়া দেয় না?

গরু, ঘোড়া, মেষ, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি পশুদিগের মধ্যে এবং হংস, বক, পারাবত, সারস, ঘুঘু, কাক, চিল প্রভৃতি পাখীদিগের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে মাতৃস্নেহের সুধাসমুদ্র বিরাজমান।

পাঠক! একটুকু অদূর অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন,—'ভেণ্ট নগরে' 'সারসী' মা আগুন হইতে আপন শাবকদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কেমন শাবকগুলির সঙ্গে পুড়িয়া মরিল! আপন প্রাণের মমতা হইতে সন্তানের মমতা কত অধিক এইখানেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ঐ দেখুন 'বানর' মা তপ্ততৈলে নিক্ষিপ্ত সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য কেমন প্রাণের আশা ছাড়িয়া অগ্নিবৎ উত্তপ্ততৈল-কটাহে পুনঃ পুনঃ ঝাপ দিয়া পড়িতেছে!

ঐ দেখুন 'শারিকা' আপন শাবকহারী নির্দ্দয় মানুষটাকে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক চঞ্চুর আঘাত করিতে করিতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

ঐ দেখুন 'কুক্কুটী' সঞ্চানাক্রান্ত শাবকগুলিকে কি সুন্দর সাবধানতার সহিত পক্ষতলে লুকাইয়া রাখিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক শাবকহারক সঞ্চানের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

ঐ দেখুন সন্তানের "মিউ মিউ" শব্দ শুনিয়া 'বিড়ালিনী' কেমন পাগলিনী হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। হা কৃষ্ণ! তোমার মহিমার পার নাই!

আমি আর কত দেখাইব? জীব-জগতের যেদিকে চাহিবেন, সেই দিকেই কেবল মাতৃস্নেহ-মন্দাকিনীর প্রবল স্রোতধারা প্রবাহিত দেখিতে পাইবেন।

পশুপক্ষীর মা কি কখন কোন স্বার্থসিদ্ধির লালসায় সন্তানদিগকে এত

স্নেহ করে? বরং সন্তান বড় হইলে আর মা'র সঙ্গে কোন সম্বন্ধ কি পরিচয় থাকে না। উহা (মাতৃস্নেহ) জীব-জগতের কল্যাণহেতু ঈশ্বরদত্ত মাতৃহৃদয়ের প্রাকৃতিক গুণ।

পাঠক! এখন আবার আপনাকে লইয়া মানবরাজ্যে যাইতে হইল। নতুবা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

আমাদের বাড়ীর নিকট একটী মুসলমান স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় পাগল হইয়া আপন নিষ্ঠুর স্বামী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। পাগলিনী সর্ব্বদা হাসিত কাঁদিত ঝাড়ে জঙ্গলে পথে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সময়ে তাহার দুইটী যমজ সন্তান হয়। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তান দুইটীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসে। আমি কিছু খাইতে দিলাম। ক্ষেপী সন্তান দুইটীকে নিকটে রাখিয়া ইচ্ছামত কিছু খাইল। খাইয়া একটীকে কোলে ও অপরটীকে কাঁধে লইয়া চলিয়া গেল। কেহ তাহার সন্তানকে ছুঁইতে ধরিতে অথবা রাখিয়া দিব বলিলে ক্ষেপী আরও ক্ষেপিয়া তাহাকে কামড়াইতে যাইত। বস্ত্রজ্ঞানহীনা পাগলিনীর ঈদৃশ সন্তানপ্রীতি সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

একটী "কুকরা" (মৎস্যভোজী সাঁচান) তাহার একটী শাবককে আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ তেঁতুল গাছে রাখিয়া জন্মভূমি হইতে আহার্য্য আনিয়া যোগাইত। তখন আমার জ্বর। আমি বসিয়া বসিয়া মাতৃস্নেহের লীলা খেলা দেখিতাম। একদিন দেখিলাম 'সাঁচানী' মা একটী মাঝারি রকমের শকুল মৎস্য ধরিয়া লইয়া তাহার শাবকের নিকট ঐ তেঁতুল গাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাবকটী মাকে দেখিয়া আহ্লাদে ডানা নাড়িয়া চিঁ চিঁ শব্দ করিতে লাগিল। মা মৎস্যটী শাবকের নিকট ধরিয়া দিতেছে, শাবকটী ঠোঁট দিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু 'সাঁচানী' তাহাকে পাকসাট মারিয়া নিবারণ করিতেছে। পশু-পক্ষি-জগতে ত ভাষা নাই, ঐ আকারেই সাঁচানী শাবককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে শকুলটী তখনও জীবিত সুতরাং ঐ অবস্থায় ভক্ষণ করা যায় না। ঐরূপ শাসন তিন চারিবার করিলে পর শাবক পা দিয়া মাছটীকে খুব শক্ত করিয়া ধরিল। সাঁচানী তখন বুঝিতে পারিল শাবক এখন স্বধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, ঐরূপ নখরাঘাতে মৎস্যের প্রাণবিয়োগ হইবে ভোজন-কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, অথচ মাটীতে পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা নাই, তখন সাঁচানী মৎস্যটী ছাড়িয়া দিয়া নির্ভাবনায় উড়িয়া গেল। হা কৃষ্ণ!

তোমার মহিমা বড়ই দুর্ব্বোধ। এইরূপ মানব ও ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতৃস্নেহ ও সন্তান শিক্ষার কোটি কোটি দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মা যখন রাগ করিয়া মারিতেন কি গালি দিতেন তখন শৈশবের সামান্য জ্ঞানে না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি সেই রাগের ভিতর স্নেহ-মমতার ও সন্তান-প্রীতির কতশত ধারা লুক্কায়িত ছিল। সেই প্রহারের ভিতর কত মধুস্রাবিনী শক্তির নিবিড় লীলা বিদ্যমান ছিল। সেই গালির ভিতর কত আশীর্ব্বাদ ছিল।

ভ্রাতৃগণ প্রাণপণ করিয়া মাতৃসেবা কর। জগতে যদি মনের জীবনের কোন কর্ত্তব্য থাকে তবে তাহা মাতৃসেবা। মাতৃসেবা ভিন্ন মানবের মুখ্য কার্য্য আর কি আছে?

যদি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাও, যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা লাভের ইচ্ছা কর তবে ভাই মাতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ কর। মাতৃসেবাই আমাদের কর্ত্তব্যের সার।

"মাতৃ, মাতৃভাষা, মাতৃ জন্মভূমি আর।
এই তিন মাতৃসেবা কর্ত্তব্যের সার॥"

ভাই, আমার বিবেচনায় মানবজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যই মাতৃসেবা। যদি সংসারে আসিয়া মাতৃসেবাই না করিলাম তবে করিলাম কি?

ভাই পাঠক তুমি! তুমি কাশী যাও, গয়া যাও কিংবা তেত্রিশকোটি দেবদেবীরই আরাধনা কর, কিন্তু মাতৃসেবায় উদাসীন থাকিলে সকলি নিষ্ফল। তুমি মালা লও, তিলক পর, গোবিন্দ নামাবলী গায়ে দাও। সারা দিন হরিসংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, মাতৃসেবায় উদাসীন থাকিলে তোমার সকলই বৃথা। তুমি যোগী হও, তপস্বী হও, কি বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়াও? কিন্তু মাতৃসেবায় উদাসীন থাকিলে তোমার তপজপ তন্ত্রমন্ত্র সকলি ভস্মে ঘি ঢালা।

মাতৃসেবা-বিমুখ মানবের প্রতি ভগবান্ সতত অপ্রসন্ন। মাতৃদ্রোহীর নিস্তার নাই। মাতৃদ্রোহীর যাগযজ্ঞ ব্রতপূজা সকলই নিষ্ফল। আপন ইষ্ট-দেবতার কোপে পড়িয়া মাতৃদ্রোহীকে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়।

আর যদি অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া ভক্তিপ্রণত চিত্তে কেবল মাতৃসেবা করা যায়, তবে তাহার মানব-জন্ম সার্থক হয়, সকল সাধনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ মাতৃভক্তের প্রতি ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া, তাহাকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। কেবল এক মাতৃসেবাতেই সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা পায়, সকল সাধনা পূর্ণ হয়।

ভাই মরজগতের মানুষ! এই কাঙ্গাল গলায় কাপড় বাঁধিয়া তোমাদের

চরণতলে পড়িয়া বলিতেছে, সংসারে আর কিছু ধর্ম্ম কব, আব নাই কব কিন্তু মনে প্রাণে যোগ করিয়া পরমেশ্বরী মাতৃদেবীব চরণ সেবা কব।

অনেক মাকে বৃদ্ধাবস্থায পুত্র এবং পুত্রবধূব সঙ্গে অকাবণ কলহ কবিতে দেখা যায, অনেক মা না বুঝিবা মানুষেব সুখেব সংসাবে দুঃখেব প্রলযঙ্কব দাবানল জ্বালাইয়া দেন, কিন্তু তখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, মা'তো আমাব এখন জ্ঞানবুদ্ধি হাবা হইযাছেন, মা'তো আমাব এখন শিশুপ্রকৃতিব অধীন হইয়া পড়িযাছেন, ভাল মন্দ বিচাব তো এখন আব তিনি কবিতে পাবেন না। আমিও তো শিশুকালে মাকে কত যন্ত্রণা দিযাছি। মা'ব ঐরূপ আবদাব উৎপীডন আমি কেন আহ্লাদ সহকাবে সহ্য কবিব না? এই তো আমাব মাতৃভক্তিব পবীক্ষাস্থল। মা আমাব স্নেহময়ী কৃপাময়ী পবমাবাধ্যা, তাঁহাব এই সব জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য কবাইত আমাব পুরুষার্থ। আমিতো এই মা'বই গর্ভজাত সন্তান, ইঁহাবইতো বক্তমাংসে আমি গঠিত। ইঁহাবইতো বুকেব দুধ চুষিযা, খাইযা আমি বাঁচিযা আছি। মা'তো ন্যায বিচাবে আমাকে বকিতে পাবেন। এইরূপ দিব্যজ্ঞানে উপনীত হইযা কলহকাবিণী, পীডাদাযিনী বৃদ্ধা জননীব সেবা কবা পবমপুরুষার্থ ও অতুল আনন্দেব বিষয়। মাতৃনাম অন্বেষকাবী, কি মাতৃদোষ কীর্ত্তনকাবীব কোন কালেও পাবত্রাণ নাই। মা'কে অনাদব কবিলে কি কটু কহিলে বহুজন্ম তপস্যাব ফলেও তাহাব উদ্ধাব হইতে পাবে না।

এই স্বার্থপব সংসাবে অনেক সময অনেক নবাধমকে মা'ব প্রতি বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায। নিজে পবিষ্কাব শয্যায শযন কবে, পবিষ্কাব সুস্বাদু সামগ্রী আহাব কবে, আব আপন গর্ভধাবিণী জননী একখানা সামান্য কুটীবে ছেঁড়া চাটাইব উপব ছেঁডা কাঁথা গায দিযা দিনান্তে সকলেব আহাবেব পব এক মুষ্টি 'ক্ষুধা নিবাবণ' খাইযা কোনমতে পডিযা থাকেন। নবাধম কুলাঙ্গাব সন্তান ভ্রমেও মা'ব দিকে ফিবিযা চায না। মা'ব শযন-ভোজনেব খবব লয না। এই সকল নবপিশাচদিগেব স্থান কোন নবকে হইবে?

আব কতগুলি নবাকাব পশু আছে, তাহাবা স্বার্থান্ধ হইযা জননীব প্রতি পশুবৎ আচবণ কবে। তাহা লিখিযা আব 'আনন্দেব' কলেবব কলঙ্কিত কবিতে ইচ্ছা কবি না। সেই সমস্ত নবাধম মাতৃদ্রোহীদিগেব কথা মনে কবিলে, ক্রোধে আমি মনুষ্যত্ব হাবাইযা ফেলি।

আজকালেব কলিব দিনে মাতৃদ্রোহী প্রেতপিশাচে সংসাব ভবিযা গিযাছে। প্রায সকলদিকেই এইরূপ পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতে পাওযা যাব।

সাধারণ অসভ্য জাতি অপেক্ষা একরকম শিক্ষিতাভিমানী আত্মসুখী লোকের ভিতর এই প্রকার মাতৃবিড়ম্বনা প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।

হা নরাধম! তুমি কি করিতেছ? নিজে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, পঞ্চোপচারে আহার করিয়া, স্ত্রীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া দেবীরূপিণী জননীকে কষ্ট দিতেছ? মা'কে একটুকু ভাল খাবার, একটুকু ভাল বিছানা দিতেছ না, তুমি পশু বাঁচিয়া আছ কেন? তোমার তো মরণই ভাল। ধিক্—তোমার মানব-জীবনে ধিক্! মা যে শিশুকালাবধি বুকের রক্ত দিয়া তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এই বুঝি তার প্রতিশোধ!!

নরাধম চণ্ডাল! মনে করিয়াছিস্ কি এই মহাপাতকের বিচার হইবে না? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তোর এই ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্মের ফল একদিন অবশ্যই প্রদান করিবেন।

মানুষ! পায় ধরিয়া বলি মাতৃসেবা কর, ঘরে ঘরে মাতৃপূজার ঘট স্থাপন কর। মা পরমারাধ্যা, মাতৃসেবাই পরম ধর্ম্ম, মাতৃসেবাই পরম তপস্যা।

যাঁহাদের মা আছেন, তাঁহারা প্রাণপণে মাতৃসেবা করুন। আর যাঁহারা মাতৃহীন তাঁহারা মাতৃ-প্রীতে ভগবানের ভজনা করুন। নয়নজলে মাতৃতর্পণ করিয়া জীব-জীবনের সার্থকতা লাভ করুন।

ভাই! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া কোথাও আর মাতৃস্নেহের গন্ধ বাতাস পাইবে না, তবে আপন কন্যাতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয় মাত্র। ভাইরে! যদি তোমার মা থাকিয়া থাকেন, তবে আর এই সুযোগ ছাড়িওনা। এই মাহেন্দ্রযোগ হারাইলে আর এ জীবনে তাহা লাভ করিতে পারিবে না।

মানুষ! যদি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে চাও তবে মাতৃসেবা কর। যদি ঈশ্বরের কৃপালাভের ইচ্ছা থাকে তবে মাতৃসেবা কর। যদি জীবনে ধন্য হইতে চাও তবে মাতৃসেবা কর। মানুষ! যদি আত্মপ্রসাদ-লাভের উচ্চসীমা লাভ করিতে চাও তবে মাতৃসেবা কর।

মা, তুমি কোথায়? স্নেহময়ী, তুমি কোথায়? তোমার মূর্খ কাঙ্গাল সন্তান তোমারই চরণ চিন্তা করিয়া 'মাতৃসেবা' লিখিল, ভাল মন্দ তুমিই জান মা! এ সন্তান তোমার কুসন্তান। পদে পদে বর্ণে বর্ণে ত্রুটির সম্ভাবনা। জননী, এই অপরাধী অকৃতজ্ঞ পুত্রকে ক্ষমা করিও। আর আশীর্ব্বাদ করিও যেন তোমারই স্নেহস্মৃতি লইয়া তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে হরি বলিয়া মরিতে পারি মা!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি।
সহিলপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীগোরাঙ্গের প্রতি।

—:*:—

(নদীয়া-নাগরীর উক্তি)

১

(তুমি) বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন নদীয়া-নাগর।
নদীয়া-নাগরী জানে তোমার আদর॥
নদীয়া ছাড়িয়া তুমি, কোথা যাবে গুণমণি,
যেতে ত দেব না তোমা গুণের আকর।
নয়নের আড় হ'লে, বিরহে পরাণ জ্বলে,
কোথা তুমি যাবে নাথ ছাড়ি বাড়ী ঘর।
কে তোমা করিবে ওহে যতন আদর॥

২

নদীয়া-নাগরী জানে তোমার মরম।
তোমার নিকটে নাহি তাদের সরম॥
তুমি ভালবাস ব'লে, দেখে তারা কত ছলে,
কুল ত্যজি পদে তব দিয়াছে ধরম।
তোমার দরশ আশে, নিতি তারা ঘাটে আসে,
সুরধুনী তীরে দেখে তোমার করম।
নদীয়া-নাগরী জানে তোমার মরম॥

৩

এ মর সংসারে তব কোন দুখ নাই।
ন'দেবাসী ভালবাসে ন'দের নিমাই॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নব বালা, জানে কত প্রেমকলা,
প্রাণ ভরা ভালবাসা অগাধ অথাই!
কি ক'রে ভুলিবে তুমি, বল বল গুণমণি,
তোমা বিনে তাহার যে আর কেহ নাই।
মনে হ'লে হেন কথা বড় লাজ পাই॥

৪

কে দিল তোমারে বিধি একাজ করিতে।
যে কাজের নাম মুখে না পারি আনিতে॥
হেন কাজ করিওনা, গৃহ ছাড়ি যাইওনা,
প্রাণে মারি কি বা সুখ পাইবে চিতে।
নদীয়ার চাঁদ তুমি, নদীয়া জনম ভূমি,
নদে ছাড়ি কোথা তোমা না দিব যেতে।
কে দিল তোমারে বিধি একাজ করিতে॥

৫

যে কাজ করিতে তুমি করিয়াছ মন।
শুনিলে চমকে প্রাণ ওহে প্রাণ-ধন॥
কি শুনি লোকের মুখে, ভাসালে নদীয়া দুখে,
কাঁদালে নদীয়াবাসী কেন অকারণ।
সোণার সে বিষ্ণুপ্রিয়া অস্থির করিয়া হিয়া,
জনমের মত ওহে লবে ধরাসন।
হেন কাজ করিওনা ওহে প্রাণ ধন॥

৬

মোরা যে অবলা জাতি কি বলিতে জানি।
তোমার গরবে মোরা সদা অভিমানী॥
যাও যদি নদে ছাড়, ত্যজি তব ঘর বাড়ী,
তেয়াগিব গঙ্গানীরে এছার পরাণি।
ওহে বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ, মার মোর শিরে হাথ,
এ হবে দাসির তব একান্ত অধমী।
মুঞি সে অবলা কি জাতি বলিতে জানি॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।
কেশীঘাট বৃন্দাবন।

কীর্ত্তনানন্দ।

—:*:—

"জয়তু জগন্মঙ্গল হরের্নাম।"

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্ট-পদার্থসমূহের মধ্যে মানবজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানবগণ বুদ্ধিপ্রভাবে কতই না অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। এই মানবজন্ম অতীব দুর্ল্লভ জন্ম। পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যপ্রভাবে এই মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি? কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করাই মানব জীবনের সার্থকতা। যে করুণাময় ভগবান্ আমাদের প্রতি দয়া বিতরণে আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও রসনা প্রভৃতি প্রদান করিয়া এই অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার মধুময় নামকীর্ত্তন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? আমরা মূঢ়, তাই তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয়াদির অপপ্রয়োগ করিয়া শান্তিময়ের শান্তিচ্ছায়ায় বঞ্চিত হইতেছি।

তিনি চক্ষু দিয়াছেন, সেই চক্ষু দ্বারা আমরা পার্থিব নশ্বর পদার্থসমূহ অবলোকন করিয়া থাকি, কিন্তু নেত্রদাতা সেই নবীন নীরদকান্তি শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে দর্শনের চেষ্টা করিতেছি না! তিনি দয়া করিয়া রসনা দিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমরা পার্থিব ক্ষণিক-রসদ বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া থাকি, কিন্তু এই রসনাদাতা ভগবানের সেই রসময় নামকীর্ত্তন করিয়া রসনার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছি না! তিনি কর্ণ দিয়াছেন, কর্ণ দ্বারা সংসারের অসার কলরবই শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু এই কর্ণদাতা প্রভুর লীলামাহাত্ম্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি না! ধিক্! আমাদের জীবনে ধিক্!!

আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন না করিয়া বৃথা কাজে পরমায়ু ক্ষয় করিতেছি। সুতরাং আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়!

আজ একটি শুভদিন, কেন না 'কীর্ত্তনানন্দের' বিষয় লিখিতে বসিয়াছি। চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কলির জীবগণের এই দুর্দ্দশাদর্শনে ধরাতলে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে এই গৌড়দেশ প্লাবিত করেন। জগাই মাধাই প্রভৃতি কত মহাপাপী হরিনামে

উদ্ধার পাইয়াছে। পতিত পাষণ্ড আমরা, সংসারের অলীক আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া রহিয়াছি। এই প্রার্থিব আমোদ-প্রমোদ আপাতমধুর পরিণাম বিরস; আমরা তাহা লক্ষ্য করিতে ছ না।

যাই হউক আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য উপস্থিত। জনৈক ছাত্রবন্ধুর নিকট অবগত হইলাম আমাদের প্রধান শিক্ষকের * আলয়ে আজ নামসঙ্কীর্ত্তন। বিদ্যালয় ছুটির পর উক্ত ছাত্রবন্ধুর সহিত শিক্ষক মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তিনি সেই কাঙ্গালঠাকুরের দীনবেশ দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করতঃ জপের মালা বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীনাম স্মরণ করিতেছেন। আমরা তথায় বসিলাম, আমি "শ্রীহরিনামামৃত" নামক একখানি বই লইয়া শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ ক্রমে কিছুক্ষণ পাঠ করিলাম। ইহাতে আমারও একটু দীনভাব জন্মিল। পরে ছাত্রাবাসে আহারাদি সমাপন করিয়া ছাত্রবন্ধুগণ সহ আসিয়া সেই শান্তিনিকেতনে শান্তিময় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলাম।

প্রথম মৃদঙ্গ ও করতালের ঐক্যতান বাদন হইল। তারপর আবাহন ও হরিনাম লীলারসের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। আহা! সেই সঙ্গীত হইতে যেন অমৃতক্ষরিত হইতে লাগিল। মরি মরি কি নৃত্য, কি ভঙ্গী, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি! প্রস্রবণ হইতে যেরূপ স্ফাটিকবৎ স্বচ্ছজলরাশি নির্গত হইয়া প্রশান্ত জলধি সনে সম্মিলিত হয়, সেই নাম প্রস্রবণ হইতেও মধুর প্রেমোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া ভক্তের প্রাণে ভাবসম্মিলনানুভূতি জন্মাইয়া দেয়।

আহা! আজ কেন এমন হইতেছে! আর কখনও ত এরূপ আনন্দলাভ করিতে পারি নাই। কত যাত্রা ও থিয়েটারে বেহালা হারমোনিয়ম প্রভৃতির ঐক্যতান বাদ্য শুনিয়াছি তাহাতে ত মন এত দ্রব হয় নাই। আজ মৃদঙ্গ করতালের "ধিন ধিন, তাথৈ তাথৈ" শব্দ আমাকে যে আত্মহারা করিয়া তুলিল! আহা, নামগানের কি অপরিসীম শক্তি! নামের উচ্ছ্বাস বাহির হইতে হইতে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কুভাব হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, এবং ভক্তের হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। যেমন মুনিতপোবনে "কুরঙ্গ মাতঙ্গগণে, কেশরী শার্দ্দূল সনে সখ্যভাবে খেলিয়া বেড়ায়" তেমনি কীর্ত্তন স্থলেও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, যেন ইচ্ছা হয় পরস্পরে কোলাকোলি করি ও ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া হরিবোল হরিবোল বলি।

---

* শ্রীযুক্ত কালীহর দাসবসু ভক্তিসাগর।

ইহাই প্রকৃত আনন্দ, ইহাই প্রকৃত সুখ। এ'স ভাই, আমরা দ্বেষ, হিংসা ও বৃথা অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া নামরাজ্যে যাই, নাম ছাড়া সংসারসন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইবার আর ঔষধ নাই।

আমরা ভাই কলির জীব। আমাদের অল্পায়ু ও অন্নগত প্রাণ। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মপ্রাণ মুনি-ঋষিগণ সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া যে ধন লাভ করিয়াছেন, এই কলিকালে একমাত্র শ্রীশ্রীহরিনামকীর্ত্তনেই সেই ধনলাভ হইয়া থাকে। ইহা কল্পনা নয় শ্রীমদ্ভাগবত'ই বলিতেছেন :—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।"

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থ যাগযজ্ঞ দ্বারা ও দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিচর্য্যাদি দ্বারা মানবগণ যে ফললাভ করিয়াছেন এই কলিকালে একমাত্র শ্রীশ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে সেই বিমলানন্দরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

তবে আর ভাই, চিন্তা কি? এখনও কেন বসিয়া রহিয়াছ? এ'স একবার সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান কর। আলস্য করিয়া কেন সাধের জীবন নষ্ট করিতেছ?

এস সুরাপায়ী, এস সিদ্ধিভোজী, এ'স পাপীতাপী পতিতপাষণ্ড। একবার এই নামসুধা পান কর, দেখিবে তাহাতে কত রস কত আনন্দ, কত মাধুর্য্য।

ভক্তিতেই ভগবান্ বাধ্য। ভগবান্ বলিয়াছেন "ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি, যেদিক ফিরায় সেদিক ফিরি।" হায় আমরা কি অধম, আমাদের হৃদয় এখনও ভক্তিরসে আপ্লুত হইল না। নামসঙ্কীর্ত্তনে ভগবান্ কতই বাধ্য। তিনি একদিন শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

অর্থাৎ "হে নারদ? আমি পরমরমণীয় বৈকুণ্ঠেও বাস করি না এবং আমার ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের হৃদয়েও অবস্থান করি না, কিন্তু নারদ রে! যেস্থানে আমার ভক্তগণ মিলিত হইয়া ভক্তিভরে আমার নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকে আমি আর সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করি।

অতএব আর বিলম্ব কেন? পাপী তাপী সকলে এ'স! প্রাণ খুলিয়া প্রেমে মাতিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
কোলাপাড়া, নোয়াখালী।

মোক্ষোপায়।

—:০:—

অনিত্য এ দেহ নিত্য ভাবিয়াছ মনে
হারে ও অবোধ জীব, মোহের ছলনে!
যাঁর কার্য্য করিবারে এ'সেছ সংসারে
কিছু কি ক'রেছ তাঁর? দেখ চিন্তা করে।
অপার করুণা তাঁর, তাঁরি কৃপা বলে
দুর্ল্লভমনুষ্য জন্ম ল'ভেছ ভূতলে।
হারে ও মোহান্ধ জীব, বুঝেও বুঝ না,
কি লাগি ভোগিছ এই সংসার যাতনা!
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি চাহ দলিবারে?
একি ভাব? দাঁড়াইয়া সংসার পাথারে!
সামান্য তৃণের ন্যায় আছ ভাসমান,
কেন বৃথা অহঙ্কার, হারে ও অজ্ঞান!
ধন-মান, কুল-শীল, রূপ-গর্ব্ব তোর,
কিছুই রবে না হবে সুখনিশি ভোর!
তাই বলি এখনও ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
অন্তরে ভাবহ সদা প্রভু পরমেশ।
নিদানের বন্ধু তিনি জানিও নিশ্চয়।
মোক্ষোপায় জ্ঞানে লও চরণে আশ্রয়॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।
রূপসী, ময়মনসিংহ।

স্নেহ প্রতিমা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পর্ব্বতপ্রমাণ অরণ্য, পার্শ্বে গৌরীনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহার'ই তীরে অনন্ত অলৌকিক গল্পের আকর হইয়া গোপীনাথপুরের শ্মশান শোভা পাইতেছে। শ্মশানকে স্বভাবতই লোকে ভয়ের চ'ক্ষে দেখে; কারণ কত কত মৃতদেহ ঐ শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইতেছে! জীবন লইয়াই মানুষের যত আস্ফালন, এই জীবনের পরিণাম দেখিয়া সে এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারেনা, তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্তই লোপ পায়। তবু মৃত্যুর পর মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে মানুষ তত সঙ্কোচিত হয় না, কিন্তু সেই দেহপঞ্জরগুলিকে আপন জলন্ত চুল্লীতে গ্রহণ করিয়া শ্মশান যে বীভৎস দৃশ্য দেখাইয়া আসিতেছে, তাহার জন্য শ্মশান ইহলোকবাসীদিগের সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছে। শ্মশানকে কেহ সুনজরে দেখিতে চায় না। গোপীনাথপুরের শ্মশান সম্বন্ধে আরও কতগুলি ভীতিজনক কথা আছে। জনশ্রুতিতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে ঐ শ্মশানটিকে পারলৌকিক আত্মার বিহারক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে। দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, গোপীনাথপুরের শ্মশান সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছে।

মানিক কৈবর্ত্তেরা চার ভাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ মাধু জ্বরবিকারে মারা যায়। তাহাকে ঐ শ্মশানেই সৎকার করে। মাধুর মৃত্যুর একমাস পরে একদিন দুইপ্রহরের সময় মানিক ঐ শ্মশানেরই পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া বাড়ী আসিতেছিল। হঠাৎ সে দেখে যে তাহার পরলোকগত ভ্রাতা মাধু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। আর কাতরকণ্ঠে বার বার বলিতেছে "দাদা, আমাকে নিয়ে যা, দাদা আমাকে নিয়ে যা।" যদিও মাধুকে মানিক প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত কিন্তু সে ত ইহলোকের সম্বন্ধের খাতিরে, আজ পরলোক হইতে আসিয়া সেই ভালবাসা মাধু লাভ করিবে কিরূপে? ভাই মানিক তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য 'রাম রাম' জপিতে জপিতে সে স্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে রমা বাগ্‌দী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল যে, চিরজীবন কুক্রিয়াসক্ত, সন্ধ্যা-গায়ত্রীহীন গেন্দুঠাকুরের প্রেতাত্মাকে সে দেখিয়া আসিয়াছে, ঐ শ্মশানে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছে।

এক দিন তুলু মাঝী আসিয়া রটাইল যে, ঐ শ্মশানেরই দুইরশি তফাতে নৌকা রাখিয়া সে নিদ্রা যাইতেছিল, শেষ রাত্রিতে প্রসিদ্ধ তাম্রকুটসেবী ভুবনঠাকুরের প্রেতাত্মা আসিয়া বারংবার তাহার নিকট তামাক চাহিতে লাগিল।

এইরূপ শত শত কাহিনী প্রচারিত থাকিয়া গোপীনাথপুরের শ্মশানটীকে একটী দুর্জ্জেয় প্রেতভূমিরূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এতদ্দেশে তান্ত্রিক শৈব সন্ন্যাসীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা এক একটী দল প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে অবস্থান করিত। লোকালয়ের সহিত তাহাদের বড় একটা সংস্রব ছিল না। সচরাচর তাহাদের কেহ দর্শনও পাইত না। দৈবাৎ কোন গৃহস্থভবনে তাহাদের আগমন হইলে সেই গৃহস্থকে কেন, গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই কম্পিতকলেবর হইতে হইত। উহাদিগকে অঘটন-সংঘটনক্ষম, দৈববলদৃপ্ত সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিত। উহাদের দলে যে সব স্ত্রীলোক থাকিত তাহারা ভৈরবী নামে পরিচিত হইত। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ভৈরবীদিগকেও লোকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তৎকালে গোপীনাথপুরের শ্মশানের নিকটস্থ অরণ্যে ঐ একদল সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব কল্পনাও সকলে করিত। সুতরাং ঐ জন্যও গোপীনাথপুরের শ্মশানটীর ভীষণতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনিবার্য্য না হইলে ঐ শ্মশানের নিকট দিয়া একা একা কেহ পথ চলিত না।

গোপীনাথপুরের রায়দের গৃহী গুরুই ছিলেন। উমাপ্রসাদের আমলে হটাৎ এক সন্ন্যাসী আসিয়া দুই একটী আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া দেখাইয়া উমাপ্রসাদকে এতই আকৃষ্ট করিলেন যে, উমাপ্রসাদ সেই সন্ন্যাসীর নিকট হইতেই সস্ত্রীক মন্ত্র-গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রগ্রহণ হইয়া গেলে, সন্ন্যাসীও স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, কুলগুরু আসিয়া উমাপ্রসাদকে গুরু পরিত্যাগে অবৈধতা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, এবং ক্রোধের মাত্রা একটু চড়াইয়া ভবিষ্যৎ বংশনাশাদি অশুভ ফল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উমাপ্রসাদ সন্ন্যাসীর মায়ায় অভিভূত হইয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন, নতুবা কুলগুরুর প্রতি তাহার অচলা ভক্তিই ছিল। শেষে আর করিবেন কি, অনেক দৈন্যার্ত্তি জানাইয়া, কনিষ্ঠ শিবপ্রসাদকে গুরুপাদমূলে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করিলেন।—শিব-

প্রসাদও যথাকালে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দাদাকে গুরুকোপানল হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি দান করিলেন। ফল কিন্তু উল্টা ফলিল! সন্ন্যাসি গুরুর মন্ত্রশিষ্য উমাপ্রসাদ গৃহীই রহিলেন, গৃহিগুরুর মন্ত্রশিষ্য শিবপ্রসাদ চিরকুমারব্রত ধারণ করিলেন।

যা'ক সে কথা, রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া শিবপ্রসাদ কি করিলেন, তাহাই এখন দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য শিবপ্রসাদকে আমরা যেরূভাবে পাঠকের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে সেই প্রত্যাদেশ পালনে যে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না ইহা পাঠক পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। বাস্তবিকই কেহকে কিছু না বলিয়া অর্দ্ধরাত্রে শিবপ্রসাদ শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিগন্তবিসারী অন্ধকার, কিন্তু এ অন্ধকার শিবপ্রসাদের ন্যায় মুক্ত পুরুষদিগের গমন পক্ষে বাধাবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। আলো ও আঁধারের বৈষম্য-বোধ বদ্ধজীবের মনেই উপস্থিত হইয়া থাকে, যাঁরা জড়ব্যাপারের অতীত স্থানে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানবর্ত্তিকার সাহায্যেই পথ চলিয়া থাকেন। সুতরাং শিবপ্রসাদ অবিচলিত চিত্তে গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য শিবরতন গোপনে প্রভুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীনাথপুরের শ্মশানকে অন্যান্যের ন্যায় সেও পরলোকের দ্বারস্বরূপ মনে করিত। বিশেষতঃ শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে যে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিল তাহাতে সে একপদও অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সে দেখিল যে শ্মশানের মধ্যস্থলে এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, এবং তাহার মধ্য হইতে 'স্বাহা স্বাহা' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তখন প্রভুর শুভাশুভ চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। শিবরতন ফিরিল, কিন্তু শিবপ্রসাদ ফিরিল না।

ক্রমশঃ—

চৈতন-চন্দ্রালোক।

—০:*:০—

নামকরণ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে "নামকরণ চাপল্য-বিলাসাদি বর্ণন" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই প্রভুচাঁদকে লইয়া পাড়াপরশী আত্মীয়স্বজন সকলেই মহাবিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। একদণ্ডও তাঁহাকে চোখের আড়ালে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। যথা:-

"যত আপ্তবর্গ আগে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সভে থাকি বালক আবরে॥"

তাহাদিগকে এক বিষম বালকেই পাইয়াছে। উহার উপর কত যে দৈত্য-দানার লোভ তা তাহার ঠিকানা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই সকল অপহারক দস্যুদিগের হস্ত হইতে কেবল আত্মবল প্রয়োগে শিশুকে রক্ষা করা কঠিন বিবেচনায় তাঁহারা দৈববলেরও আশ্রয় লইয়াছেন। যথা—

"বিষ্ণু রক্ষা কেহো কেহো দেবী রক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পাড় ঘর কেহো চারিদিকে বেড়ে॥"

প্রভু হে! তুমি কত মায়াই দেখাইতে জান! যুগে যুগে এ জগন্নিবাসে আসিয়া মায়ামুগ্ধ অজ্ঞান জীবদিগকে লইয়া তুমি কত খেলাই খেলিয়া থাক। সেই হরিতোষণী ব্রতপরায়ণা মাতা অদিতিকে বামন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া কত না ভীত বিহ্বল করিলে। সেই দর্ভবটু পুত্রের জন্য পদে পদে বিপদ বিভীষিকার উদয় হইয়া মায়ের প্রাণ কি পরিমান উতলা থাকিত তা যিনি মা হইয়াছিলেন তিনিই বুঝিয়াছিলেন। রামাবতারে তত শৈশবাশুভ সংঘটিত না হইলেও "তাড়কা" ও "পরশুরাম" ঘটিত কুমার-কালের অযোগ্য সেই ভীষণ কর্ম্মানুষ্ঠান একদিন অযোধ্যার অশ্রুদ্বার ভালরূপেই উন্মুক্ত করিয়াছিল। তারপর বনে গমনাদি ব্যাপারেত চতুর্দ্দশ বর্ষই অযোধ্যায় শোকের ঝটিকা বহিয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণাবতারে বিঘ্নের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিটী ধারণ করিয়াই আগমন কর। সৌভাগ্য বশতঃ বসুদেব তৎকালোচিত সত্ত্বস্থতা লাভ করিতে পারিয়া মহামতি নন্দকে নন্দনের সংরক্ষণ ভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু সেইদিন হইতে নন্দগৃহে একদিকে বিষাদ

ও একদিকে আনন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। মাতা যশোমতীর প্রীতির দুলাল হইয়া তুমি এক দিনও তাহাকে অনাবিল আনন্দ দান কর নাই। প্রভু গো! তোমাকে পুত্ররূপে পাওবার প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে দণ্ডে শতবার করিতে হইয়াছে! যশোদা মা'র নয়নজল এক মুহূর্ত্তের জন্যও সম্বরণ হয় নাই। লীলাময়! তোমার লীলারহস্য ভেদ ব্রহ্মা শিবও করিতে পারেন না। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি মানব, আমরা তাহার কি বুঝিব? তুমি কেন হাসাও কেন কাঁদাও, কেন ভয়, কেন অভয় প্রদান কর তাহা তুমিই জান। আমরা স্থূলদৃষ্টিতে কেবল দেখি এই পৃথিবীকে মায়ার কঠিন আবরণে আচ্ছাদন ও ভক্তদিগের প্রাণে ভক্তি বাৎসল্যাদি রস সঞ্চারের জন্যই যেন তোমার এ খেলা। সুতরাং গৌরলীলাতেই তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিবে কেন? কিন্তু এইবার একটু নূতন ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য বার আপ্তবর্গকে যে আনন্দরচনায় কৌতুক উপভোগ করিতে দেও নাই, গৌরলীলায় যেন তাহা সম্ভবের মধ্যে গিয়াছে। যথা:—

তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন।

হায় হায় রে, পৃথিবীর বেদনা প্রশমনের জন্য যে মহৌষধ তিনি প্রয়োগ করিতে আসিয়াছেন, আজ আপনি কান্দিয়া তার পরীক্ষা করিতেছেন। অথবা যে যুগধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছে আজ ইঙ্গিতে আভাষে তাহাই যেন সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু মায়ার আচ্ছাদন না সরাইলে জীব তাহা পরিগ্রহ করিতে পারিবে কি? তাই তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিলেই হরি হরি বলে, অন্য সময় স্বতন্ত্র বিশ্বাসের অধীন হয়। যথা:—

"সর্ব্বলোক আর্বিবণাপাকে সর্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে বর্সিক দেবগণ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সন্ধ্যানে।
ছায়া দেখি বলে সবে এই চোরা যায়ে।
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি॥

নানামন্ত্রে দশদিক কেহো বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বলে 'এই জাত হারিণী পালায়॥'
সভে বলে 'ধর ধর এই চোরা যায়।'
'নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়॥
কোন ওঝা বলে 'আজ এড়াইলে ভাল।'
না জানিয়া নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল॥"

এইরূপে প্রভুর উত্থানপর্ব্ব শেষ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাম লওয়াইবার আগ্রহটী বাড়িয়া উঠিল। সঙ্কেত তো পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু অবোধ জীব অনেক সময় তাহা বিস্মৃত হইয়া প্রভুকে কষ্ট দিয়া থাকে। প্রভুর রোদন-সম্বরণের একমাত্র উপায় নামকীর্ত্তন ছাড়িয়া অন্যান্য ছেলে ভুলান মন্ত্রেও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। তিনি তো যে সে ছেলে নহেন, তাই আপনার মনোমতটী না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও নিষ্কৃতি দেন না। যথা :—

"করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ কর করয়ে ক্রন্দন॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে নারীজনে।
তবে প্রভু হাসি চায় শ্রীচন্দ্রবদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করয়ে সভে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥'

ভক্ত পাঠক দেখিবেন সেই প্রেমের সিন্ধুতে এখনই কিন্তু নামের হিল্লোল উঠিতে শুরু করিয়াছে। একটু একটু করিয়া সেই নামকল্পতরু অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই ব্রহ্মাণ্ডবাসীদিগের সুখপূর্ণিমা নিকট হইতেছে। পাপী, তাপী, পতিত, পাষণ্ডদিগের দুঃখের নিশা ভোর হইয়া আসিতেছে। জীবরে! প্রাণ খুলিয়া একবার হরি হরি বল।

প্রভু কিন্তু এক খেলাই সর্ব্বদাই খেলেন না। যখন সেই ব্রজরসের উদ্ভব হয়, তখন ব্রজগোপালের ন্যায় দুই একটা ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া বসেন। যথা :—

"এই মতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
সে সময়ে যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলয়ে চারিভিতে।
সর্ব্ব-ঘরে ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদন॥
'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সর্ব্ব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্ব ঘরে ধান্য চাউল মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে॥"

বুঝিতে না পারিয়াই সেই অধর চাঁদকে ধরিয়াও কেহ ধরিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারে না। তা যদি পারিত, তবে এই ধরাধামই বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইত। জীবলোকে সেই শিবলোকের আনন্দ বিরাজ করিত। এই ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মাদি দেবগণের বিহারক্ষেত্র হইত। ভগবান এই হতভাগ্য জীবদিগকে সেই স্থায়ী সুখে বঞ্চিত করিবার জন্যই মায়ার অঞ্জন চক্ষে পূরিয়া দিয়াছেন। এই দৃষ্টিদোষ বশতই তাঁহাকে আজ যথার্থই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র মনে করিয়া যত আপ্তবর্গ আসিয়া নাম করণ উৎসবে যোগ দিয়াছেন। আর কে কি নাম রাখিবেন তাহারই কল্পনা-জল্পনা করিতেছেন। যথা :—

"এই মত প্রতি দিন করেন কৌতুক।
নাম করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপাস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায় দীপ্ত সভে সিন্দুর ভূষণ॥

নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বোলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাই।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই॥
বোলেন বিদ্যান সব করিয়ে বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম
কুলদীপ কুষ্টিতেও লিখিল ইহান॥
নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥

ফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পক্ষেরই বাসনা পূর্ণ হইল। বিশ্বম্ভর ও নিমাই দুই নাম রহিল। তিনি ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই আসিয়াছেন. সুতরাং নামকরণ উপলক্ষে কাহারই মনে আক্ষেপ থাকিতে দিলেন না, কৃপা করিয়া বিশ্বম্ভর ও নিমাই দুই নামই ধারণ করিলেন। জীবরে! কখন কখন সেই কৃপানাথকে লাভ করিতে পারিবা জগৎ এমনই ভাবে হাসিয়া কাঁদিয়া লইতেছে। তত্ত্বদর্শিগণ যতই তাঁহাকে নিরুপাধি নিরবয়ব বলিয়া ব্যাখ্যা করুন না তাঁর "সন্তবামি" বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। ভক্তের কাছে তিনি বরাবর ধরা দিয়া আসিতেছেন ভক্তের প্রদত্ত বিবিধ নামে ভূষিত হইয়া পরিত্রানের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এ হিসাবে জীবের সৌভাগ্যের পারাবার নাই! জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ!!
